বাঙ্গলার ইতিহাস

বাঙ্গলার ইতিহাস

(সামাজিক বিবর্তন)

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
এ. এম. (ব্রাউন), ডি. ফিল্ (হামবুর্গ)

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৮৩

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর সাহা, পার্বট প্রেস : ৭৬/২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রকাশ করার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেন। অশিতিপর বৃদ্ধবয়সে অশক্ত শরীরে রচনা শেষ করার পর রক্তচাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাণ্ডুলিপিখানি প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরও পুনরায় দেখে দেওয়া তাঁকে স্থগিত রাখতে হয়।

কিন্তু ডঃ দত্ত যেসব দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন তাহা পুনঃ পরীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এই পুনঃ সমীক্ষণ ও ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নানাবিধ বাধাবিঘ্নের জন্য পুস্তক প্রকাশে কিছু বিলম্ব হ'ল। এইজন্য মুদ্রিত পুস্তকে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই পুস্তক প্রকাশে অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর, শ্রীরাধারমণ মিত্র, শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা বিভা সাহা এবং ডঃ দত্তের সহযোগী ও সহকর্মী শ্রীপ্রতুলকুমার দত্ত আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এ'জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—যাকে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ইংরাজ শাসকেরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে ইতিহাসকে বিকৃত ও কলঙ্কিত করেছে, ব্যর্থ হওয়ার পর সেই স্বাধীনতা-যজ্ঞের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের উপর এসে পড়ে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। শতবৎসর ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলায় দেশ ভরে গিয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় ভাঙ্গন ধরার ফলে নূতন নূতন চিন্তাধারার ও উদারমতের অভ্যুদয় দেখা যেতে থাকে বিশেষ করে বাঙ্গলাদেশে। এই যুগ-পরিবর্তনকালে কলিকাতায় সিমলার খ্যাতনামা দত্তবংশে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার, জন্মাষ্টমীর দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য তিনি প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন—"আমার জীবনটাও শ্রীকৃষ্ণের মতই দুর্যোগপূর্ণ।" ভূপেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণী ও উদারমতাবলম্বী পুরুষ। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ধার্মিক হিন্দুমহিলা হওয়া সত্ত্বেও পিতার প্রভাবে দত্ত-পরিবারে গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও ছুৎমার্গের স্থান ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উদার মনোভাব দত্ত-পরিবারের পরিজনবর্গকে প্রগতিশীল চিন্তায় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে যার ফলে ভাবীকালে বিশ্বনাথ দত্তের তিন পুত্র বাঙ্গালীর নব-জীবনে ত্রি-ধারা প্রবাহিত করেন। জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ হলেন বিশ্ব-বন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ, মধ্যম মহাত্মা মহেন্দ্রনাথ সাধক, দার্শনিক, গ্রন্থকার ও চিন্তানায়ক বলে সাধারণে সুপরিচিত; আর কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ আজীবন বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যাতা, সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত, বাঙ্গলার তথা ভারতের যুব ও কৃষক আন্দোলনের প্রবর্তক ও একনিষ্ঠ সাম্যবাদী। এঁরা সকলেই ছিলেন অকৃতদার।

বর্দ্ধিষ্ণু সচ্ছল পরিবারে জন্ম হলেও ভূপেন্দ্রনাথের জীবনপ্রবাহ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। চার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা যদিও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করতেন কিন্তু ব্যয়ও ছিল তাঁর অপরিমিত। ফলে পিতার মৃত্যুতে সংসারে অচিরেই আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ এখন একমাত্র ভরসা। কিন্তু তিনিও কিছুকাল পর সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন।

পরিবারের পরিজন সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতে ভালবাসতেন। কিন্তু এ দুঃসময়ে আত্মীয়-স্বজনেরা সহায়ক না হয়ে বরং অশান্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়ালেন; সমগ্র সংসারের চাপ এসে পড়ে মাতা ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি রামতনু বোস লেনস্থ পিত্রালয়ে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হলেন।

ভূপেন্দ্রনাথের শিক্ষা শুরু হয় বর্ধমান জেলা নিবাসী এক গৃহশিক্ষকের নিকট। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপোলিটন ইনস্টিটিউসন থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। শোনা যায়, এর পর তিনি বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়ে ওঠেন এবং তজ্জন্য মাতার নিকট পুনঃপুনঃ আবদার করতে থাকেন। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিতও পরিচিত হন। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের জাতিভেদ, সামাজিক অসাম্য, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর মন তখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ঐ ধর্ম সারাদেশে প্রচার করে বেড়াবার কথাই তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু সে সময়ে বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিচালনায় স্বদেশী আন্দোলন চলছে পূর্ণোদ্যমে, আর একদল চরমপন্থী বিপ্লবী ইতঃপূর্বেই দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে গিয়েছেন। আবেদন-নিবেদন করে ইংরেজ তাড়ানো অসম্ভব, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমই এর একমাত্র পথ—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯০১ খৃঃ ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে 'অনুশীলন সমিতি' নামীয় একটি বিধিবদ্ধ নিখিল-বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি এই বৈপ্লবিক সমিতিতে সক্রিয় সদস্যরূপে যোগদান করেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ এই বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগদান করেন ও নিয়মিতভাবে সমিতির আপার সারকুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম চর্চা, অশ্বারোহণ, অসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা করতে থাকেন। অশ্বারোহণ শিক্ষাকালে একবার পড়ে গিয়ে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। এছাড়া তিনি ১৯০৩ খৃঃ স্থাপিত ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাবে পাঁচু খলিফার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেন। এই ক্লাবে তিনি তিনকড়ি গোস্বামী ও ডঃ তারকনাথ

দাসের সহিত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। তাঁরাও অস্ত্র-চালনা শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

ইটালীয় দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার পূজারী ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডীর জীবনী ভূপেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক জীবনের প্রারকালে গভীর রেখাপাত করে। ফলে তাঁর জীবনের আদর্শ ও ধারা "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" সেই তরুণ বয়সেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত দুর্জ্জয় স্বাধীনতার স্পৃহা নিয়ে তিনি এ'সময় তাঁর নৈতিক জীবন ও চরিত্র, ন্যায়-নীতি, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ইস্পাত-ফলকে আবৃত করে গঠন করেছিলেন, যাহা তাঁর সমগ্র জীবনে অক্ষয় ও অটুটভাবে বিদ্যমান ছিল। সুদীর্ঘ বিরাশী বৎসরের জীবনে কোন দিন তাঁর কঠোর নিষ্ঠা ও নৈতিক পবিত্রতার বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটেনি। চরিত্রের এই নৈতিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার প্রতি এক সহজাত প্রবণতা এবং প্রবল ঝোঁক ও আকর্ষণের আভাষ ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে কৈশোর হতে দেখা যায়। এই কৈশোরেই তিনি International Temperance and Purity Association নামীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার বঙ্গীয় শাখার সভ্য ও কর্মীশ্রেণীভুক্ত হন। উক্ত মূলসংঘের সভাপতি ছিলেন মিঃ কেইন্ এম. পি. এবং বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ব্যারিষ্টার শ্রীআনন্দমোহন বসু এবং রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সভ্যদের ধর্মসাক্ষ্য করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। ভূপেন্দ্রনাথও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক সমিতির শপথানুসারে এই দীক্ষার কথা ও দীক্ষাদাতার নাম প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর দীক্ষার কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই। এটুকুমাত্র প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি হিন্দুধর্মশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র স্পর্শ করে দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে সকল ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ভাবীকালের সাম্যবাদী মতবাদের ইঙ্গিতাভাষ এই ঘটনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈপ্লবিক সমিতির কার্যে লিপ্ত থাকা কালে ভূপেন্দ্রনাথ তৎকালীন বঙ্গের নামকরা প্রায় সকল জ্ঞানী, গুণী, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাঁকে সমগ্র বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। সে সময় বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সতর্ক দৃষ্টি এবং নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনে বৈপ্লবিকদের জীবন সর্বদাই বিপদসঙ্কুল থাকত। কারণ দেশদ্রোহী ও গুপ্তচরে

দেশ ছেড়ে গিয়েছিল ! ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পবিগ্রহ করে। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতা শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্মীগণ যখন গ্রামাঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে যেতেন তাঁরা দরিদ্র কৃষক-সমাজের নিকট হতে তেমন সাড়া পেতেন না। এ সময় হতেই তাঁদের মনে গণ-চেতনা ও শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে এবং সামগ্রিক সমাজ সম্বন্ধে আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। তৎকালে এদেশে সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি পাওয়াই যেত না। সমসাময়িক কংগ্রেস আন্দোলন ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে কোথাও কোন তাত্ত্বিক আদর্শবাদ বা চিন্তাধারা ছিল না। ইংরাজ তাড়াও, দেশ স্বাধীন কর—এ ছিল একমাত্র ধ্বনি ও সকল কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও বাণী বিপ্লবী যুবকদের প্রাণে সাম্যবাদীয় সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা যোগায়, কিন্তু সেই চিন্তা এবং দৃষ্টি ধর্ম ও সমাজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে বলে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকে প্রসারিত হয় না। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ এবং ধর্ম সম্বন্ধে উহার উদার মনোভাবের প্রভাবে ভূপেন্দ্রনাথ তখন হতেই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসবান হন।

নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হলেও পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে তিনটি আঞ্চলিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বাধীনে সংগঠনটি পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে মূল-কেন্দ্রীয় সংস্থা (Parent Body) থেকে আত্মোন্নতি সমিতি ও যুগান্তর নামে দুইটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত উপদল (splinter group) সৃষ্ট হয়। এই যুগান্তর সংস্থাটি দল হিসাবে পরিচিত হলেও ইহার কোনও দলীয় নীতি ছিল না। যাঁরা 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও অরবিন্দ প্রবর্তিত 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেন তাঁদেরই যুগান্তর দল বলা হত।

'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা ভূপেন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্তি। বৈপ্লবিক সমিতির কর্মীদের মধ্যে দুইটি চিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল। একদল কর্মী বোমা তৈরী ও রাজনৈতিক ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লব-সাধন করতে তৎপর ছিলেন, আর একদল কর্মী ব্যাপক প্রচার ও সংগঠনে অধিক আস্থাবান ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ শেষোক্ত দলের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সংবাদপত্র দ্বারা ব্যাপক প্রচার এবং তদ্বারা দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কার্যসূচীতে বিশ্বাসী ছিলেন। এ'বিষয়ে নেতাদের আগ্রহের অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধনা প্রেস প্রতিষ্ঠা করে সাপ্তাহিক

যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং নিজে সম্পাদনার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারীন ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য মহোদয়গণ এ'বিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং প্রবীণ নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর লেখক হিসাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ভূপেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী লেখনী ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বল্পকালের মধ্যেই 'যুগান্তর'কে দেশপ্রেমিক জনসাধারণের নিকট প্রিয় করে তোলে। ফলে অনতিকাল মধ্যেই ইংরাজ সরকারের রোষ-বহ্নি ইহার উপর পতিত হয়। যুগান্তর নাম ভূপেন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া। তিনি বলতেন যে এই নাম তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর নামক সামাজিক উপন্যাস হতে গ্রহণ করে-ছিলেন। এত অল্প বয়সেই সাংবাদিকতায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা আর একটি উদাহরণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ভূপেন্দ্রনাথের উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদনা। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন চলাকালে তিনি সোনার বাংলা নামে একখানি বে-আইনী ইস্তাহার মুদ্রিত করে সর্বসাধারণ্যে বিতরণ করেন। উক্ত ইস্তাহার পড়ে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন It is dynamite. এই ইস্তাহার (manifesto) হাজারে হাজারে বিতরিত হয়; এর ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন যে দেশে এমন একদল কর্মী আছেন যাঁরা আবেদন-নিবেদনের থালা বহন করতে রাজী নন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগান্তর'-এ রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ আদালতে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাঁর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে কর্ণেল মূলকাণি নামে এক রোমান ক্যাথলিক আইরিশম্যান তাঁকে ঘানি ঘুরিয়ে তেল নিষ্কাশন করার কাজে লাগাতেন। জেলে থাকাকালীন জনৈক ডেপুটি জেলরক্ষক তাঁকে গোপনে জানান যে তাঁর নামে পুনরায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে; মুক্তির পরই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত করা হবে। এতে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা তাঁকে মুক্তির পর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেল হতে মুক্তি পেয়ে তিনি আত্মগোপন করেন ও অজ্ঞাত-ভাবে আমেরিকায় চলে যান। কার সাহায্যে, কোন পথ দিয়ে এবং কিভাবে আমেরিকায় গিয়েছিলেন সেকথা তিনি কাকেও বলতেন না। শোনা যায়, ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টায় ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর আনুকূল্যে তাঁর ছদ্মবেশে দক্ষিণ ভারতের পথে গোপনে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ইতিপূর্বেই অনেক ভারতীয় বিপ্লবী আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্নদেশে

বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টায় ব্যপৃত ছিলেন এবং তাঁরা ঐ সকল স্থানে অনেক বিদেশীয়কে ভারতের বিপ্লবোদ্যমের সহায়ক বন্ধু হিসাবে লাভ করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় গিয়ে নিউইয়র্ক সহরে ভারতবন্ধু মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌ (Myron Phelps) কর্তৃক স্থাপিত ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি পুনরায় লেখাপড়ার চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক হন; এর দুই বৎসর পরে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট্‌ ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়ন সুরু করেন। কিন্তু আমেরিকা প্রবাসেও তিনি তাঁর স্বদেশের বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে পারেন নাই। সেখানে যে-সকল ভারতীয় বৈপ্লবিক-কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত 'গদর পার্টির' সহিত যোগাযোগ সংস্থাপন ও রক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস্‌পার্ক (Bronxpark) সোসালিষ্ট ক্লাবের সভ্য হয়ে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে ভূপেন্দ্রনাথকে অশেষ অর্থকষ্ট ও দুর্গতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত। তাঁকে একই সঙ্গে জীবিকার্জন ও অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তা'ছাড়া তথাকার ঘোরতর বর্ণ-বিদ্বেষের দরুণ সময়ে সময়ে এই কৃষ্ণকায় ভারতীয়কে নিগ্রো মনে করে শ্বেতকায় আমেরিকানরা নিগৃহীত করতেও ছাড়ে নাই। গুপ্তভাবে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন বলে প্রকাশ্যে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার অসুবিধা ছিল। তখন অবশ্য আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু স্বাধীনচেতা তেজস্বী ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর হওয়া স্বত্ত্বেও জীবনে কোনদিন সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। যদি তাহা করতেন তা'হলে তাঁর আমেরিকা প্রবাস বহুলাংশে অনায়াসসাধ্য হত। সমগ্রজীবনে স্বকীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি চরিত্রের এক সুদুর্ল'ভ ও একান্ত বিরল দৃষ্টান্ত লোকসমাজে রেখে গিয়েছেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ য়ুরোপে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায়। অত্যাচারীর দুর্দিন অত্যাচারিতের সুদিন। সুতরাং ভারতের ভিতরে ও বাইরে বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ভারতের বাইরে যেসব বৈপ্লবিক কর্মী অবস্থান করছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে অস্ত্র পাঠিয়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। জার্মানীর

রাজধানী বার্লিন সহরে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য একটি বিধিবদ্ধ সমিতি স্থাপিত করে জার্মান ও তুর্কি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে জার্মান সরকার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। ইতিহাসে এই কমিটি 'বার্লিন কমিটি' নামে প্রসিদ্ধ। কমিটি পূর্বপ্রাচ্যে ও দূরপ্রাচ্যে ঘাঁটি স্থাপন করে পিকিং, সাইগণ, ব্যাঙ্কক প্রভৃতি স্থানে সদস্যদের প্রেরণ করলেন এবং ওই সকল স্থান হতে জাহাজে ভারতের উপকূল-সমূহে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পশ্চিমদিক হতে আফ্‌গানিস্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনাও গ্রহণ করে।

বার্লিন কমিটির আহ্বানে ভূপেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন ত্যাগ করে গুপ্তভাবে আমেরিকা হতে গ্রীসের উপকূলে এসে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করতে থাকেন। কমিটির অনুরোধে জার্মান গভর্ণমেন্ট তাঁকে গ্রীস হতে উদ্ধার করবার জন্য তুর্কি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করায় তিনি সেখান হতে কন্সটান্টিনোপল হয়ে বার্লিনে এসে উপনীত হন। এখানে এসে তিনি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহকর্মীদের সহিত মিলিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করেন।

১৯১৬ হতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূপেন্দ্রনাথ 'বার্লিন কমিটি'র সম্পাদক পদে কৃত ছিলেন। তাঁর এই সময়কার কার্যাবলী এতই ঘটনাবহুল ও ব্যাপক যে এখানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে এ সময়কার কর্মই তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অধ্যায়। বার্লিন কমিটির কর্মক্ষেত্র সমগ্র এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশ এবং সুদূর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এ'সমস্ত দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নানাভাবে সংযোগ স্থাপন করে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম ও অভূতপূর্ব সংগঠন শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল! যে সকল জাহাজে বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হয়েছিল সে সম্বন্ধে সংবাদ পূর্বাহ্ণে জ্ঞাত হওয়ায় ইংরেজ সরকার ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলে কড়া সতর্ক পাহারা রাখে এবং ঐ সকল জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। জাহাজ হতে অস্ত্রশস্ত্র উড়িষ্যার উপকূলে নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য যাবার পথে বালেশ্বরের বুড়ীবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায় প্রভৃতি

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষে জীবন দিলেন। রাসবিহারী বসু প্রথমে চীনে ও পরে জাপানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। ফলে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাও সাময়িকভাবে ব্যাহত হল। ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বে বার্লিন কমিটি ভারতের বাইরে বিপ্লবোদ্যমের যে কর্মক্ষেত্র রচনা করেছিলেন তারই ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জার্মানী, ইটালী ও জাপানের সহায়তা লাভ ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা যে-ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজ বপন হয়েছিল সুভাষচন্দ্র তার ফল আহরণ করেছিলেন।

যুদ্ধাবসানে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিপ্লবের পরে বার্লিন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং কমিটির কয়েকজন ভূতপূর্ব সভ্য নবাগত ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্যার্থে 'ভারতীয় নিউজ ও ইনফরমেশন ব্যুরো' (Indian News and Information Bureau) স্থাপন করেন। কয়েকজন বৈপ্লবিক একটি নূতন কমিটি স্থাপন করে 'ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' (India Independence) নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। কর্তারাম নামক জনৈক সভ্যের নাম সম্পাদক হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তিনি আপত্তি করায় ভূপেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সমূদয় দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহা ইংলণ্ডে ও ভারতে প্রবেশ করতে দিত না।

ভূপেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে বার্লিনের এনথ্রপলজিকাল সোসাইটির (Anthropological Society) সদস্যপদে বৃত হন। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন ও ১৯৪২ সালে জার্মান এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯২৫ সালে প্যারিসের এনথ্রপলজিকাল সোসাইটির (Anthropological Society) সদস্যপদে বৃত হন। এ'সকল ঘটনা হতেই প্রমাণ হয় যে তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কীরূপ তীব্র ছিল যার ফলে পরবর্তীকালে তিনি অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাহা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছিল।

বিপ্লবোদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় ভূপেন্দ্রনাথ ভগ্নোদ্যম হন নাই। একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করলেন অপরদিকে তেমনই যুদ্ধোত্তরকালে

সুইডেন প্রভৃতি দেশে যে সকল আন্তর্জাতিক সোসালিষ্ট সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তাতে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করবার চেষ্টা করছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একজন পাকা মার্কস্‌পন্থী সোসালিষ্টে পরিণত হয়েছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকদের সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণ করবার জন্য একটি স্মারকলিপি পাঠান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মস্কোতে এসে উপনীত হন এবং তথায় তিনমাস কাল অবস্থান করেন। উক্ত সম্মেলনে এম. এন. রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেক ভারতীয় বিপ্লবী উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লেনিন ও অন্যান্য রুশ নেতৃবৃন্দ বিশ্বের পরাধীন জাতিসমূহের তথা ভারতের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত গঠন করতে না পারায় কোন কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই। এখানে ভূপেন্দ্রনাথ রুশ ও ইউরোপের নানাস্থানের বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতাদের সহিত পরিচিত হন। ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা যখন কোন সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হলনা, তখন ভূপেন্দ্রনাথ সোভিয়েট নেতা মহান লেনিনের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বকীয় মতামত লিপিবদ্ধ করে এক গবেষণাপত্র পেশ করেন। মহাত্মা লেনিন ব্যক্তিগতভাবে ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করে তাঁকে পত্র দ্বারা অনুসরনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সহকর্মীসুলভ নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রবাসী ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। যারা সোসালিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের ম্যাকডোনাল্ড গভর্ণমেন্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতে রাজী হন; কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। বন্ধুবান্ধবদের তাগিদে ভূপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জার্মাণীতে অবস্থিত বৃটিশ কনস্যুল্যাটে দরখাস্ত করেন ও মার্চ মাসে তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হলে বার্লিন পরিত্যাগ করে প্যারিস হয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্যারিসে তিনি মাদাম কামার নিকট বিদায় নিয়ে আসেন।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ ষোল বৎসর রাজনৈতিক অজ্ঞাত-বাসের পর স্বদেশভূমিতে ফিরে আসেন নৃ-তাত্ত্বিক ও সাম্যবাদী বিপ্লবী নেতা

হয়ে; আর সঙ্গে আনলেন অগাধ পাণ্ডিত্য, বহু পাশ্চাত্য ভাষাজ্ঞান ও বিপ্লব দেখবার এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রবাসজীবনেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়।

স্বদেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের সহিত পুনরায় মিলিত হলেন। কিন্তু তখন দেশের রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন এসে গিয়েছে। পূর্বতন সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে মৃত, আবার অনেকে রাজনীতি একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরাও আবার সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিতে শতধা-বিভক্ত। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে তাঁর স্বদেশত্যাগের আগেই বৈপ্লবিকগণ দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সকল দলের ঊর্ধে এবং সকল দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী। এক্ষণে তাঁর রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বের শুধু সশস্ত্র পন্থায় তাঁর আর আস্থা ছিল না। তিনি এখন নিপীড়িত জনগণের সমষ্টিগত আন্দোলনে দৃঢ়-বিশ্বাসী। তাই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কিন্তু তিনি যে ধনতন্ত্র-বিরোধী সাম্যবাদী তা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অজানা ছিল না। সেজন্য তাঁরা তাঁকে প্রথমে কংগ্রেসে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও জনমতের চাপে নেতৃবৃন্দ তাঁকে কংগ্রেসে স্থান দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার বিকাশ লাভের সুযোগ-সুবিধা ঘটে নাই। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকের মৌলিক অধিকারের দাবীতে তাঁর এক প্রস্তাব পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মাধ্যমে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। কিন্তু মূল প্রস্তাবটির রচয়িতা ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং, যিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হতে এ বিষয়ের প্রতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পুনঃ-পুনঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে চলছিলেন। এদেশে ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের তিনিই প্রথম প্রবর্তক ও চিন্তানায়ক। এ'ছাড়াও তিনি যাবজ্জীবন শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের পরমবন্ধু হিসাবে সর্বদা দেশের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি ভারতের কৃষক আন্দোলনে বঙ্গীয় কৃষকসভার অন্যতম সভাপতি ছিলেন। বহু শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি এবং দু'বার অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেন।

সুভাষচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বহু বিপ্লবী নেতা সর্বদা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে দু'বার কারাবরণও করতে হয়েছিল তাঁকে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতালাভের দিন পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামে একদিনের জন্যও তাঁর বিরাম ছিল না। তাঁরই নিজের নিম্নোক্ত কয়েক পংক্তির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ : "নবীন তারুণ্যের প্রত্যুষে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার রক্তিম অরুণোদয়ের স্বপ্নে আত্মহারা হইয়া দুর্জয় সঙ্কল্পে একনিষ্ঠ থাকিয়া * * * যৌবনের প্রারম্ভে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিলক, অরবিন্দ, প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করিয়া লেখক দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে ধর্মসাক্ষী করিয়া যে-শপথ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন। আজ স্বাধীন ডেমোক্রেটিক ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠায় সেই শপথ উৎযাপিত হইয়াছে।"

স্বাধীনতার সংগ্রামে ভূপেন্দ্রনাথের ভূমিকাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ্বস্ত যোদ্ধা এবং বর্তমান সমাজ এবং সাহিত্যে প্রগতিবাদেরও অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর কর্মময় দীর্ঘজীবন বাঙলার তথা ভারতের নব-মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার স্রোতধারা বহন করে এনেছে। কিন্তু কর্মবীর ভূপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা জ্ঞানতপস্বী ভূপেন্দ্রনাথ সবিশেষ স্মরণীয়। অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার অধিকারী ছিলেন মনীষী ভূপেন্দ্রনাথ। সমাজবিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, হিন্দু আইনশাস্ত্র, অর্থনীতি, মার্ক্সীয় দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুভাষায় তাঁর সুগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী, জার্মান, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত এবং এখনও অপ্রকাশিত তাঁর বহু মূল্যবান গবেষণা পুস্তক বর্তমান। অসংখ্য সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদমূলক বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার তিনিই পথিকৃৎ। এদেশে তাঁর পূর্বে আর কেহই উক্ত নূতন-পদ্ধতির প্রয়োগ করেন নাই; ভারতে সমাজবাদের তিনিই প্রথম প্রবক্তা। তাঁর মত তেজস্বী, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরায়ণ, দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী, নিরভিমান, নিরহঙ্কার ও সাম্যবাদে সুপণ্ডিত এবং আবাল্য ব্রহ্মচারী, নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান পুরুষ বর্তমান শতাব্দীতে অতীব বিরল। তাঁর অনন্যসাধারণ চরিত্র ও সহৃদয় আচরণ নিমেষে পরকে আপন করে নিত। সমগ্র দেশের

সকল মানুষের তিনি ছিলেন একাগ্র আপনার জন। সেজন্য অসংখ্য গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগার, প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি তাঁর সাহচর্যের স্মৃতি বহন করে আজ নিজেদের ধন্য মনে করছে। গণ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সোভিয়েট সুহৃদয় সমিতি প্রভৃতি বহু প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সভাপতি কিম্বা সহ-সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাপনে, অমায়িক আলোচনায় ও আচার আচরণে এবং মনেপ্রাণে সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল জাতি-বিহীন, শ্রেণী-বিহীন সাম্যবাদী ভারত যার আদর্শ হবে মহাপ্রাণ গৌতম বুদ্ধের আদর্শ বহুজন হিতায় চ, বহুজন সুখায় চ।

বিগত ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ভোর ৬টায় তাঁর দেহাবসান হয়েছে। কিন্তু তিনি যে বাণী দেশবাসীকে দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যে চিন্তাধারার উৎসমুখ উন্মোচন করে গিয়েছেন, দেশবাসী যে অমূল্য জ্ঞানৈশ্বর্যের উত্তরাধিকার লাভ করল, ভবিষ্যৎ ভারতের যে-চিত্র তিনি অঙ্কণ করে গিয়েছেন, ভাবীকালে তা যখন বাস্তবে রূপায়িত হবে তখন দেশবাসী উপলব্ধি করতে পারবে ভূপেন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি এবং কি বিরাট ও মহান তাঁর অবদান।

বাঙ্গলার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। আর্য্যযুগ ।।

"মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশংগা বসতে মলা।

*　　　*　　　*

উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥"

(ঋগ্বেদ ১০'১৩৬।২০৫)

বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস কবে, কখন, কি ভাবে আরম্ভ হয়েছে এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন 'মূল-জাতীয়' অধিবাসীরা কোন্ সময়ে এক সভ্যতা গ্রহণ ক'রে একজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে তা বর্তমানে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ নদীমাতৃক সমুদ্র বেলাভূমিজাত এই বাঙ্গলাদেশের অভ্যন্তরে প্রস্তর যুগের সভ্যতাপ্রসূত কোন প্রস্তর নির্মিত যন্ত্রপাতি (Celts প্রভৃতি) আজও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত পুস্তকাবলীর উপরই বহুলাংশে আমাদের নির্ভর করতে হবে।

ঋক্‌বেদে 'বাতরশন' মুনির দুই সমুদ্রে ভ্রমণ করার উল্লেখ আছে।[১] আবার এ'রূপ শুনা যায় যে স্বাধীনচেতা কপিল মুনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্য্যাতিত হ'য়ে মিথিলা থেকে বাঙ্গলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান আজও কপিল মুনির আশ্রম বলে সম্মানিত হয়। তা' থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এই সব মুনিঋষিরা প্রায়ই বাঙ্গলায় আসা যাওয়া করতেন।

বৈদিক-সাহিত্যে বাঙ্গলাদেশের নামোল্লেখ আছে। যেমন অথর্ববেদে পাওয়া যায় অঙ্গ ও মগধের নাম[২], বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৩] 'পুন্ড্র' জাতির উল্লেখ আর ঐতরেয় আরণ্যকে[৪] 'বঙ্গ-বগধচের জনপদ' অধিবাসীদের প্রতি গালাগাল্লির প্রয়োগ। ঐতরেয় আরণ্যকের উক্ত শ্লোকটি অধ্যাপক কিথ আর মেক্‌ডোনেল-এর কাছে অবোধ্য বলে মনে হয়।[৫]

তাঁরা এই শ্লোকটিকে 'বঙ্গ-বগধ' নামের amendment বা সংশোধিতরূপ হিসেবে বলতে চান। আবার অথর্ববেদের পরিশিষ্টতে 'মগধ-বঙ্গ-মৎস্য'

১। ১০।১৩৬।৫　　২। ৫।২২।১৪　　৩। ৭।৬　　৪। ২।১।১

৫। Vedic Index, Vol. II, p. 237.

শব্দের উল্লেখ আছে।[১] এ' প্রসঙ্গে উক্ত লেখকদ্বয় বলেন যে, ইহা অনেক পরবর্তীকালের লেখা। তবে কিন্তু ভারতীয়দের কাছে উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ অতি প্রাঞ্জল। 'বঙ্গ' অর্থে বাঙ্গলার লোক; 'বগধ' অর্থে মগধ। কিন্তু বাঙ্গলায় 'বাগদী' নামেও একটি জাতির বাস আছে। এই জাতিটিও বৈদিক 'বগধ' হতে পারে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন।[২] কেহ কেহ ব-দ্বীপ, 'বাগড়ী' থেকে 'বাগদী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গলার ব-দ্বীপ সমূহে বাগদী বলে কোন জাতি বাস করে না। হয়ত বৈদিকযুগে উক্ত জাতিটি পশ্চিমবাঙ্গলা ও বিহারে বাস করতো। 'চের' শব্দটি ছোটনাগপুরের পাহাড়িয়া 'ওঁরাও', 'চের' প্রভৃতি জাতিদের নামবাচক। তারা নিজেদের এখনও 'চের মাহতো' বলে অভিহিত করে থাকে। তাদের সম্পর্কে নরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এ'রা বিহার ও ছোটনাগপুরের কৃষিজীবী জাতি।

ডাল্‌টন বলেন যে, এ'রা এক সময়ে বাস করত গাঙ্গেয় উপত্যকায়, এখন এদের অনেকে হয়েছে রাজপুত।[৩] বেদোক্ত এই তিনটি কৌমই পাশাপাশি বাস করতো। ৺শাস্ত্রী বলেন যে, এ'দের নিজস্ব গভর্ণমেণ্টও ছিল এবং নিজস্ব একটি ভাষাও ছিল বলে অনুমান হয়। জৈন শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় যে 'অঙ্গ' তাদের একটি পবিত্র দেশ। 'ভাগবতী'তে মগধের আগে ষোলটি কৌমের নামের তালিকার পূর্বেই 'অঙ্গ' ও 'বঙ্গে'র নামোল্লেখ রয়েছে।[৪] 'প্রজ্ঞাপন' নামীয় একটি উপাঙ্গে আর্য্য কৌমদের প্রথম দলের মধ্যে অঙ্গ ও বঙ্গকে ধরা হয়েছে এবং এদের বলা হয়েছে 'ক্ষেত্তারিয়'। এদের তালিকা এখানে দেওয়া গেলঃ রায়গিহ মগহ, চম্পা অম্‌গালাহ, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গায়।[৫] পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যে অঙ্গও বঙ্গের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিত লেভির মতে 'অঙ্গ' হল বর্তমান ভাগলপুর জেলা, আর 'বঙ্গ' বাঙ্গলার বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা।[৬] অন্যদিকে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে আছেঃ

'ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈবচ।
এতান্ জনপদানার্থান্ গঙ্গাভাবয়তে শুভাম্।' ৫১-৫২ ॥

১। ১।৭।৭ ২। H. P. Sastri : Magadhan Literature, p. 3.
৩। Vide Risley : The Tribes and Castes of Bengal, pp. 199-201.
৪। Weber : Ind. Stud. XIV : p. 304. ৫। Weber . Ind. Stud, p. 397.
৬। S. Levi : Prê-Aryan and Pre-Dravidian in India Translated by Dr. P. Bagchi.

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ দু'টি ধর্মের বিভিন্নতা-সূচক দলাদলির সংজ্ঞামাত্র। বেদে 'আর্য' ও 'দস্যু' এবং 'দাস'-এর মধ্যে ধর্মের পার্থক্যমূলক বিভিন্ন নাম যে ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক এক্ষেত্রেও তদ্রূপ।[১] বৈদিক সাহিত্যে বলবান ও দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট পঞ্জাব ও পাঞ্চাল-বাসীরা, শীর্ণকায় ও কৃষ্ণবর্ণ বঙ্গ ও মগধবাসীদের প্রতি 'পক্ষির ন্যায় প্রবৃত্তি' বলে কটাক্ষপাত করেছে ঐতরেয় আরণ্যক, আর বৈদিক ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদের মধ্যে তারা 'অনার্য্য' বলে নিন্দাভাজন হয়েছে। অন্যদিকে আবার বৌদ্ধ ও জৈন সাধুরা তাদের 'আর্য্য' আর 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে পরিগণিত করেছেন। অর্বাচীন পুরাণও তাই বলেছে। এ' থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ধর্মোপদেশকারীরা আপন শিষ্যদের 'আর্য্য' অর্থাৎ শিষ্ট আখ্যা দিতেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ (শ্রেণী) মধ্যে গণ্য করতেন। এ'ভাবেই বৈদিক যুগ থেকে সামাজিক কলহ ও বিবাদের সূচনা হয়েছে। কথিত হয়, বিশ্বামিত্র আপন কৌমের বাইরের লোকদেরও অর্থাৎ অ-বৈদিক লোকদেরও স্বীয় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করতে লাগলেন; পক্ষান্তরে বশিষ্ঠ উগ্র জাতীয়তাবাদী সেজে গোঁড়ামীর বশে আপন কৌম বহির্ভূত লোকদের দস্যু বা 'দাস' বলে ঘৃণা করতে লাগলেন! তাঁর দল বিশ্বামিত্রদের 'দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা' (দস্যুদের শ্রেষ্ঠ) এবং 'ব্রহ্ম-রাক্ষস' (বৈশ্বামিত্রগণ, পুলোহ, পুলস্ত, পুলোমা) বলে গালি দিতে লাগলেন। এ' থেকে আমরা এই তথ্যই জানতে পারি যে 'বর্ণ' মূলজাতি (Race বা Biotype) সূচক বিভেদ নয়। ইহা সামাজিক শ্রেণীবিভেদ মাত্র। বিভিন্ন যুগে বর্ণ বা শ্রেণী পুনঃপুনঃ গঠিত হয়েছে এবং এখনও তা' চলছে।

বৈদিকযুগের পর, বোধ হয় মৌর্য্যযুগের আগে বা সেই সময়ে বৌধায়ন স্মৃতিতে[২] উপরোক্ত দেশসমূহে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ আছে। অথচ আমরা দেখি যে, বুদ্ধের সময়ে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিরোধী নেতারা বঙ্গ ও মগধে প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। কপিলমুনি বাঙ্গলায় আশ্রম স্থাপন করেছেন, জিনাচার্য্যগণও এদেশে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের এসব দেশের উপর যে এত রাগ ও দ্বেষ তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, বৈদিক ধর্মের বিপক্ষবাদী বৌদ্ধ, আজীবক ও জৈন প্রচারকেরা পূর্বভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন।[৩] আবার পুরাণে একস্থলে দীর্ঘতমা ঋষির এক পুত্রের নাম 'বঙ্গ' বলে উল্লেখ আছে। আর একস্থলে

১। Vedic index. ২। বৌধায়ন, ১।২।১৪

৩। B. N. Datta; Dialectics of Hindu Ritualism.

আছে তাঁহার পুত্র কক্ষিবন বা কক্ষিবন্ত ঋষির পুত্রদের নাম —অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, কলিঙ্গ, ওড্র ইত্যাদি। পুরাণে বর্ণিত ভারতের বিভিন্ন জনপদ বা প্রদেশের নামকরণ তাদের রাজাদের নামানুসারে হয়েছে বলে কথিত আছে। বোধ হয় প্রাচীনকালের কতকগুলি জাতির রাজা বা Hero Eponym অর্থাৎ জাতির কল্পিত প্রতিভূরূপীবীর থেকে এই সব নামের সৃষ্টি হয়েছে।

ঋক্‌বেদে বিশ্বামিত্রের "কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাভী" সূক্তে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "কীকট দেশের গরুগুলো কি করে? তারা যজ্ঞের জন্যে দুধও দেয় না, অগ্নিও প্রজ্বলিত করে না"।[১] আর ঐ দেশের রাজা প্রমগন্ধের ওপর এই ঋষির বিশেষ আক্রোশ। বৈদিকযুগের পরে যাস্ক তাঁর নিরুক্তে এই শ্লোকের অর্থ প্রয়োগের ব্যাখ্যা কালে বলেছেন: "কীকটা নাম দেশো অনার্য নিবাস"।[২] কিন্তু সংস্কৃত স্মৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে 'আর্য' শব্দের 'শিষ্ট', 'ভদ্র' অর্থ বোঝানো হয়েছে।[৩] আধুনিক প্যান-জার্মাণীয় অর্থে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এটা প্রয়োগ করেন নি। এ' জন্যে যাস্কের এ অর্থ অবলম্বনে কেহ কেহ কীকট অর্থে মগধ মনে করেন। কারণ যাস্কের সময়েই বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমান মগধে জোর প্রচার কার্য চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু 'কীকট' যে মগধ—ইহা এখনও কেহই সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নি।[৪] যদিও মধ্যযুগীয় ভারতীয় অভিধান লেখকেরা তাহাই বলতে চেয়েছেন। এক্ষণে কথা উঠে যে, বর্তমানের বাঙ্গলায় আর্য্য সভ্যতা কবে প্রবেশ করে? শতপথ ব্রাহ্মণে একটি রূপক কাহিনী আছে: ব্রহ্মাবর্ত (পূর্ব-পঞ্জাব) থেকে রাজা বিদেহ মাধব, তাঁর পুরোহিত রহুগণ (এঁর নাম ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়) এবং একদল ব্রাহ্মণকে নিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করবার কালে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং তাদের মুখ থেকে আগুন বেরুতে লাগলো। এই প্রকার বৈশ্বানর তাদের পথপ্রদর্শক হলেন। কিন্তু "সদানীরা" তীরে উপস্থিত হলেই বৈশ্বানর অন্তর্হিত হ'লেন, সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হলো—"তুমি এখানেই অবস্থান কর"। গ্রন্থকার বলেছেন যে, সদানীরার পূর্বে ব্রাহ্মণের বসবাস নেই। এই বিদেহ মাধবের নাম থেকেই দেশের নাম হলো বিদেহ। বর্তমানের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গণ্ডকী নদীকে সদানীরা বলে সনাক্ত করেন। কিন্তু গণ্ডকী যদি সদানীরা হয় তা হলে মিথিলা কি প্রকারে তার পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত হ'তে

১। ৩।৫৩।১৪ ২। ৬।৩২

৩। বৌধায়নস্মৃতি, বাৎসায়ন কামসূত্রম্, রামায়ণ ও মহাভারত দ্রষ্টব্য।

৪। Vedic Index, Vol. I. p. 159.

পারে, আর তা হলে মিথিলায় কি প্রকারেই বা আর্য্য উপনিবেশ হলো ? তার বাইরে কি আর্য্য উপনিবেসিকরা আসতেন না ? এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে ; সদানীরা কোথায় প্রবাহিত হতো ? স্কন্ধ-পুরাণ, অমরকোষ ও সায়নাচার্য্য উত্তর বঙ্গের পবিত্র করতোয়া নদীকে সদানীরা বলে সনাক্ত করেন। স্কন্ধ পুরাণের "পৌণ্ড্র-খণ্ডে" করতোয়া-মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। বোধ হয় আর্য্য কৃষ্টি মিথিলা হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। বাঙ্গলার এই স্থানই প্রথম আর্য্য কৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন মৈথিলী ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। আর সদানীরা যদি গণ্ডকী নদীই হয় তবে বলতে হবে যে মিথিলা ছিল ব্রাহ্মণ শূন্য। আবার প্রশ্ন উঠে শতপথ ব্রাহ্মণের তারিখ কত ? এই ব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের টীকা ; ইহাতে লোহার ব্যবহারের কথা আছে। ঋক্‌বেদে লোহার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্র বৎসর পূর্বে লৌহ ভারতে গলান হয়। কিন্তু এই বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তা হ'লে সে সময়ের পরে এবং বুদ্ধের জন্মের পূর্বে এই ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে বিদেহ গণতন্ত্র এবং অধিবাসীরা "বৈদেহক" বলে অভিহিত হতো ; তারা সামভজ্জীয় সংঘ সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আবার শুক্ল যজুর্বেদে ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎ ও তার পুত্র জনমেজয়ের নামোল্লেখ আছে।

আর্য্যশব্দ কৃষ্টিবাচক। বিদেহ মাধব পরের যুগের রামচন্দ্রের ন্যায় আর্য্য কৃষ্টির Hero eponym অর্থাৎ তার প্রতীক। আবার এ প্রশ্নও উঠা স্বাভাবিক যে আমাদের প্রাচীন অভিধানকারীদের উক্তি সত্য কিনা ?

বর্তমানে কোন আধুনিক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, বিজয়সিংহ বাঙ্গলা-দেশ থেকে সিংহল জয়ার্থে গিয়েছিলেন কিনা ? এ বিষয়ে সিংহলের 'মহাবংশ' নামক পালী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আছে ঃ বঙ্গদের দেশে বঙ্গনগরে একজন রাজা ছিল। তাঁর কন্যার পুত্র ছিল বিজয়[১]। 'দ্বীপবংশ' নামক সিংহলী পুস্তকে আছে ঃ বঙ্গের রাজার কন্যার সঙ্গে একটি বন্য সিংহের সঙ্গমের ফলে, সিংহবাহু এবং সিবালী নামে দু'টি সুন্দর সন্তান হয়। সিংহের বত্রিশটি পুত্র সন্তান হয়। এদের মধ্যে বিজয় ও সুমিত জ্যেষ্ঠ ছিল ; যুবক, লোকের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করায় লোকেরা এবং ব্যবসায়ীরা রাজার কাছে নালিশ করে। রাজা বিজয়কে দেশ হইতে নির্বাসিত করেন। বিজয়, গোলাম, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, দাস ও দাসী প্রভৃতি নিয়ে সাতশত লোক সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করেন।

১। Indian Antiquary, Vol. XIII. (1884).

.........তাঁরা লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তীরে অবতরণ করেন।.........বিজয় এবং বিজিত দেশ দখল করেন[১]। সিংহলবাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের শরীরগত নরতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে[২]।

এ'স্থলে বক্তব্য যে, পশুরাজ সিংহ সিংহবাহুর উৎপত্তিকে জাতিতাত্ত্বিক রূপক বলিয়া গ্রহণ করতে হবে[৩]। বেদের 'কুকুর' ও 'মৎস' জাতি যেমন কুকুর ও মৎস্যজাতীয় জীব ছিল না, এখানেও তাহাই। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে টটেম্‌বাদ (Totemism) বিদ্যমান ছিল। একটি জন্তু, গাছ, বা পাথরকে পূর্ব-পুরুষের প্রতীক বলে মেনে নিয়ে পরে তাকেই পূজা করা ও তাকে কেন্দ্র করে সমাজ সংঘবদ্ধ করাকে 'টটেম্‌বাদ' বলে। সেমিটিক ও ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলোও এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে গেছে। বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুরের মধ্যে 'গো-বংশীয়' এবং 'নাগ-বংশীয়' রাজপুত কৌমগুলো এরূপ টটেম্ উদ্ভূত ধরতে হবে। নচেৎ গরু ও সাপ হতে জন্ম গ্রহণের কোন অর্থই হয় না।

মেসিডনীয় বীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে প্রাচ্য-ভারতের যে পরাক্রান্ত নরপতি চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন, গ্রীক লেখকগণ তাঁর নাম দিয়েছেন নন্‌ড্রুস (Nandrus)। আমরা জানি ইঁহার নাম ধননন্দ। ইনি নন্দবংশের শেষ নরপতি। গ্রীক লেখকগণ বলেছেন, প্রাচ্য (Prasii) এবং গঙ্গরীগণ (Gangaridae) রাজা। তাঁর রাজ্য পূর্ব-পঞ্জাব থেকে দক্ষিণে গোদাবরী তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধের সময়ের মগধ পরে যে এত বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা আমরা এই তথ্য থেকেই বুঝতে পারি।

গ্রীক ভৌগলিক টলেমি তাঁর ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তকে গঙ্গরীদের দেশের বর্ণনাকালে বলেছেন যে, তারা অতি পরাক্রান্ত জাতি। 'গাঙ্গে' বা 'গঙ্গে' নামীয় সমুদ্রতীরবর্তী নগর তাদের রাজধানী ছিল ; বিপুল সৈন্য সংখ্যাও ছিল ; এমন কি তিনি এসবের তালিকাও দিয়েছেন। টলেমির এই মানচিত্রানুযায়ী 'গঙ্গে' নগরী বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি ২৪

১। Indian Antiquary, pages 35-36 (1884) হ'তে অনুদিত।

২। P. Sarasin and F. Sarasin : *Ergebnisse, Naturwissenschaflicher Forschungen auf Ceylon* (1887-1893) p. 128 ; A. N. Ferguson *Ceylon*, p. 34.

৩ E. W. Hopkin ; The Religions of India. p. 537.

পরগণার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার 'দেগঙ্গা' নামক স্থানের নিকটে ঐতিহ্যের রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মের প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননের দ্বারা একটি প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্থানের মৃত্তিকা মধ্যে মৌর্য্যযুগ থেকে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির মূর্তি, হাঁড়ি এবং পাঞ্চ মার্কা টাকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার যক্ষ মূর্তির বড় টানা চোখ, নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া বড় নাক, দেখা যায় (পূর্ব-ভারতীয় লক্ষণ)। তমলুকের যক্ষমূর্তির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। আবার হাঁড়িগুলি রোমান হাঁড়ির ন্যায়। এই সব লক্ষণে এ একটি বন্দরস্থল বলে মনে করা হচ্ছে এবং টলেমি বর্ণিত উক্ত 'গঙ্গে' নগরীর সঙ্গে সনাক্ত করার জন্যেও কেহ কেহ প্রস্তুত। অবশ্য ইহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষ।

যদি এই নবাবিষ্কৃত নগরী মৌর্য্যযুগ থেকে সমৃদ্ধশালীরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহলে নন্দদের রাজত্বকালে নিশ্চয়ই ইহার সভ্যতা সুপরিস্ফুট ছিল। পুনঃ ২৪ পরগণার দক্ষিণে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাহলে এই স্থল খৃষ্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দী এবং তারও পূর্বকাল থেকে গঙ্গরীদের সভ্যতা দৃঢ় ভাবেই ঘোষণা করছিল; কারণ এই সভ্যতা আকাশ থেকে পড়েনি। তার বিবর্তনও ছিল। এইসব ক্রমাগত আবিষ্কৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা আমরা বাঙ্গলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব আন্দাজ করতে পারছি। গ্রীক এবং রোমাণ লেখকেরা মিথ্যা সংবাদ লিপিবদ্ধ করে যাননি। আবার খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পোড়ামাটির যে স্ত্রীলোকমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে হয়ত উপরোক্ত যক্ষমূর্তি বলে কেহ কেহ অভিহিত করেছেন। এই মূর্তির পরিচ্ছদ এবং কেশবিন্যাস আজকালের হিসাবে অদ্ভুত বলে গণ্য হলেও ইহার মুখচ্ছবি স্থানীয় বর্তমানের স্ত্রীলোকের সঙ্গে সৌসাদৃশ্যপূর্ণ।[১] তা হলে বর্তমান সময়ে যাদের "বাঙ্গালী" বলা হয় সেই লোকদের সভ্যতা কত প্রাচীন তাহা বিস্ময়ের বস্তু।

ভূমধ্যসাগরীয় লোকদের বাণিজ্যার্থে বাঙ্গলায় আগমনের প্রমাণ যেমন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও ঐ দেশীয় লোকদের বঙ্গোপসাগরে যাতায়াতের উল্লেখ আছে। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' পুস্তকের ষষ্ঠ উল্লাসে আছে: "মিত্রগুপ্ত নামে একজন কুমার দেশ পর্যটনকালে দাম্রলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) নগরে উপনীত হন। সেখানকার

১। Stella Kramarisch: *The Art of India.*

শিবমন্দিরে রাজকুমারীর নৃত্য দর্শনে মোহিত হয়ে যান ও তাঁর পূর্বরাগের উদয় হয়। পরে তিনি ঐ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু দাম্রলিপ্তের রাজকুমার ভীমবর্মা তাঁর ভগ্নিপতির অধীন থাকবে, শিবের এরূপ বর ছিল। সেজন্য রাজকুমার ভগ্নিপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। অকূল সমুদ্রের মধ্য হতে যবনদের এক জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে। ঐ জাহাজের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর নাম ছিল "রামেষু"। রামেষু শব্দটি মিসরের ফ্যারো রামসিয়ুস নামের ন্যায়। এতে মনে হয়, এই জাহাজটি ভূমধ্যসাগরীয় রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন দেশ হতে এসেছিল এবং ভারতীয়েরাও ঐ সমস্ত দেশের লোকদের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বিপন্ন রাজকুমার যবনদের দ্বারা জীবন রক্ষা পাবার পর, তাদের সেই জাহাজটি এক ভারতীয় পোত (বহিত্র) দ্বারা আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে যবনেরা হারতে লাগলো, তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজ-কুমারকে বিমুক্ত করে দিলে তিনি আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য দেশীয় পোতে লম্ফ প্রদান করে উঠে পড়েন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়! তিনি দেখেন, দাম্রলিপ্তের সেই রাজকুমার এই পোতের অধ্যক্ষ! দাম্রলিপ্ত সুহ্মের (রাঢ়ের) তখন রাজধানী ছিল।

এতে আমাদের মনে হয়, পরবর্তীকালের বিদেশীয় জলদস্যুদের ন্যায় বঙ্গোপসাগরে রোমান সাম্রাজ্য হতে বোম্বেটেরা এসে পণ্যবাহী জাহাজ মারিত। তার প্রতিরোধার্থে স্বাধীন সুহ্ম রাষ্ট্রের রণতরী সমুদ্রে টহল দিত।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান কেন ভারতের পূর্বদিকে বিশেষ অগ্রসর না হয়ে স্বদেশমুখী হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে গ্রীক লেখকরা গ্রীষ্মের প্রাচুর্য ও প্রাখর্যকেই উল্লেখ করেছেন; কিন্তু বহুপরে একজন রোমান লেখক বলেছেন আসল কথা যে, মহারাজ নন্দের প্রভূত ও পরাক্রান্ত সৈন্যবলের ভয়ে ভীত হয়ে তারা আর অগ্রসর হয়নি। এই সময় থেকেই গঙ্গরীদের কাহিনী লাটিন সাহিত্যে উল্লিখিত হচ্ছে। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন, 'মহাপদ্ম (মহাপৌম) নন্দের রাজধানী ছিল পুণ্ড্র নগর। আর তাঁর দেশের নাম ছিল পুণ্ড্র'। বগুড়ার পূর্ব থেকে বর্তমানের বিহারান্তর্গত পালামৌ পর্যন্ত প্রাচ্যীয় ভূ-ভাগ 'পুণ্ড্র' দেশ নামে অভিহিত হ'ত। ইহা পণ্ডিত উইলসনের সিদ্ধান্ত। মহাপদ্মের মণিভদ্র ও পুণ্যভদ্র নামে দুই সেনাপতি ছিল। পুণ্ড নগরের ফটকের দুই পার্শ্বে এই দুই যোদ্ধার প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত ছিল। ইহারা যক্ষ বলে আগে পূজিত হ'তেন।[১]

১। কুল্লনিদ্দেশ। Vide B. M. Barua: History of the Ajivakas.

বর্তমান কালে 'গঙ্গরী' আখ্যাধারী কোন জাতির অস্তিত্ব আমরা বাঙ্গলা ও বিহারে দেখিতে পাই না, যদিও কোন কোন ইউরোপীয় লেখক তার চেষ্টা করেছেন। এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গঙ্গার তীরবর্তী লোকেরা 'গঙ্গরী', গ্রীকভাষায় তার বহুবচনে হয় গঙ্গরী (Gangaridae)। 'গঙ্গারাঢ়ী' বলে গ্রীক লেখকেরা কোন জাতির উল্লেখ করে যাননি। এই শব্দটি কয়েকজন বঙ্গভাষী লোকের স্বকপোলকল্পিত শব্দ।

মগধের উত্তরে মিথিলায় ঋষিদের আগমনের উল্লেখ আমরা উপনিষদে দেখতে পাই। যেমন উল্লেখ আছে: জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে তর্কে পরাজিত করেন। ফলে শেষোক্তের মস্তক শরীর থেকে বিচ্যুত হয়। কতক উপনিষদে ক্ষত্রিয়াধিপত্য ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মের উল্লেখ হেতু এই অনুমান করা হয় যে এগুলি হিমালয়ের সানুদেশে 'রাজশব্দোপজীবিন' সংঘাধীন ক্ষত্রিয় জনপদগুলিতে লেখা হয়। প্রাচীন মিথিলাবাসীদেরও এ প্রকারের একটি জন বা কৌম ছিল। বর্তমানকালের ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'জনক' একটি উপাধি মাত্র। হালে মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষের মধ্যে মৌর্য্যযুগের একটি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। পরলোকগত জয়সয়াল মহাশয় তার পাঠোদ্ধার করে বলেছেন, এ'তে উত্তর বাঙ্গলার 'সাম-বঙ্গীয়' ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের বিষয় উল্লেখ আছে।[১] লিচ্ছবীদের ন্যায় ইঁহাদেরও একটি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কৌম ছিল। তা'হলে এই বোঝা যায় যে, যে সকল লোকের মধ্যে বেদোক্ত তেত্রিশটি দেবতা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, পূর্বজন্ম এবং কর্মফল দ্বারা মানবের ভাগ্যফল নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিতর্ক উপস্থাপিত করা হত, তাদের বংশধরদের মধ্যেই বুদ্ধ ও মহাবীর গৃহীত হ'ন। এ' থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্য ভারতের জনগণ বৈদিক পৌরহিত্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং বেদ-বিরুদ্ধ মতসমূহ এ অঞ্চলে প্রচারিত হওয়ায় প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা বঙ্গ ও মগধের প্রতি এত বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতেন।

পুরাণে বঙ্গকে 'ঐল' সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। পার্জিটার মহোদয় এই 'ঐল' শব্দকে 'আর্য্য' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। উত্তর বঙ্গ ও কামরূপে রাজা নরক ও তদ্বংশজাত ভগদত্ত বিষয়ে জনশ্রুতি আছে। এই ভগদত্তের নাম মহাভারতেও আছে। পাণিনি, (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক)

১। Vide P. K. Jayaswal : Presidential Address in Indore Oriental Conference.

যিনি বুদ্ধের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিও ভারতের জনপদ গৌড় পুরের নাম উল্লেখ করেছেন।[১] সোমপুরী বিহারে আবিষ্কৃত প্রস্তরফলক থেকে জানা যায় যে, বাঙ্গলা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন কি কৌটিল্যও গৌড়ের নাম করেছেন। অশোকের এক ভ্রাতা জৈন মতাবলম্বী হ'য়ে গৌড়ে বাস করতেন। আবার চন্দ্রগুপ্তের সময় গৌড়ে জৈন সংঘারামের উল্লেখও পাওয়া যায়। তার গুরু ভদ্রবাহু বাঙ্গলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২] বাৎস্যায়ন (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক) তাঁর 'কামসূত্রে' ভারতের প্রাচ্য বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ করেছেন এবং এ সব দেশের রাজাদের অবরোধের মধ্যে রাণীদের সঙ্গে পুরোহিতদের গুপ্ত প্রণয় কাহিনীর কথাও লিখেছেন। তিনি কয়েকবারই গৌড় দেশের নাম, গৌড়ীয়দের রীতিনীতির কথা উল্লেখ করে পূর্ব ভারতের শিষ্টাচারের প্রসিদ্ধি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অন্যান্যদের সঙ্গে গৌড়ীয় সৌন্দর্য বোধের তুলনা করে বলেছেন যে গৌড়ীয়েরা (গৌড়ানাম্) বড় বড় নখ রাখে, স্ত্রীলোকেরা নম্র, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণা ও কোমল শরীর বিশিষ্টা।[৩]

তারপর নবাবিষ্কৃত "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" পুস্তকে বর্দ্ধমানের 'লোক' রাজবংশের উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিত জয়সয়াল এ'র সময় নির্ধারণ করেছেন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী, এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এই বংশ নিশ্চয়ই গুপ্তযুগের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল। ঐ পুস্তকে উল্লেখ আছেঃ "পূর্বে, অনেক মহৎ রাজা উল্লিখিত আছে।...লোক (যিনি বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন) থেকে যশস্বীন পর্য্যন্ত ইহারা গৌড়ের উন্নতির কারণ হ'ল। জয়সয়ালের মতে তৃতীয় শতকের প্রায় সমসাময়িক সময়ে সম্ভবতঃ বাঙ্গলায় "বর্ধন" নামে এক রাজবংশ ছিল, এবং সে সময়ে (খৃঃ ২৪০-৩২০) নাগবংশীয়েরা বাঙ্গলায় রাজত্ব করছিল। নাগেরা বাঙ্গলায় সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরাভ্যুদয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান হয়। সেই সময় থেকে গৌড়ীয়দের রাজধানী বিধর্মী (heretical) ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠে। নাগদের সম্পর্কে এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছেঃ "নাগরাজ বলিয়া একজন রাজা গৌড়ের অধিপতি হবেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হবেন। ইঁহারা নিজেরাও বৈশ্য হবেন।...বৈশ্যেরা নিজেরা পূর্বকৃত পাপের জন্য পরস্পরকে অবিশ্বাস

১। ৯।২।১০০

২। দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ১০১, ক্ষিতিমোহন সেন : চিন্ময় বঙ্গ

৩। বাৎস্যায়ন কামসূত্রম্।

করবেন। তৎপর প্রভাবিষ্ণু তাদের রাজা হবেন—ইনি ক্ষত্রিয়পদ (Status) গ্রহণ করবেন।" পুনঃ বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে যে, কোন এক অতীতকালের সুহ্মের (রাঢ়) রাজা দেবসেনকে তাঁর রাণী দেবরের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হত্যা করেছিলেন। আবার শিশুনীয়া পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ আছে পুষ্করণার রাজা চন্দ্রের নাম।

এরপর বাঙ্গলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্‌টেকার বলেন যে, পশ্চিম বাঙ্গলা সম্ভবতঃ গুপ্তদের পৈতৃক রাজত্ব ছিল। কিন্তু এই সব সংবাদ পরস্পর বিরোধী। উপরোক্ত বিবরণে পশ্চিম বাঙ্গলায় আমরা স্বাধীন নরপতিদের নামোল্লেখ পাই। অপরদিকে দিল্লীস্থিত মেহরলী স্তম্ভে উৎকর্ণ লিপিতে আমরা এই সংবাদ পাই যে, রাজা চন্দ্র বঙ্গদেশ জয় করেন এবং সিন্ধুনদের সপ্ত শাখার উৎপত্তিস্থল পার হ'য়ে বহ্লীক দেশ জয় করেন। এর দ্বারা ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই রাজাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বলে ধার্য করেন। আবার কালিদাসের রঘুবংশের রাজা রঘুর দিগ্‌বিজয় কালে, সুহ্মের রাজারা বেতের ন্যায় রঘুর সম্মুখে নুয়ে পড়ল আর বঙ্গদেশের (পূর্ববঙ্গ) রাজারা নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হ'ল বলে বর্ণনা আছে। যদি রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Percept) বিষয় হয় সমুদ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়, তাহলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ তাদের জয় করতে হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গলা দেশ গুপ্তদের অধীনে ছিল কিনা তাহা সন্দেহের স্থল। পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি থেকে গুপ্তদের তাম্রলিপি পাওয়া যাচ্ছে।

গুপ্তযুগের পর পঞ্চম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের স্বাধীন রাজা জয়নাগের নাম এবং তার সামন্ত নারায়ণভদ্রের সংবাদ আমরা বাপ্পাঘোষবাট তাম্রলিপিতে পাই। ইনি মঞ্জুশ্রী উক্ত নাগবংশীয় হতে পারেন। আবার ষষ্ঠ শতাব্দীর 'ঘুঘরাহাটি লিপিতে' আমরা সমাচারদেবের সংবাদ পাই। ইনি ছিলেন ঘোর শৈব। পুনরায় ফরিদপুর তাম্রলিপিসমূহে আমরা ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের রাজত্বের সংবাদ পাই। ইহারা গুপ্তযুগের শেষকালের এবং পরের লোক হতেও পারেন। অপরদিকে এইযুগের (খৃঃ ৯৫০) ত্রিপুরার সামন্তরাজা লোকনাথ, তার সামন্ত প্রদোষশর্মা এবং চারিবেদপাঠী ব্রাহ্মণদের সংবাদ এক তাম্রলিপিতে পাই। এঁরা গুপ্তযুগের পরে, পূর্বভারতে একাধিপত্য করেছেন। এদের টাকা গুপ্তরাজাদের ন্যায়। সমাচারদেব, গুপ্তসম্রাটদের ন্যায় পোষাক পরিহিত। শেষে পালবংশের অব্যবহিত পূর্বে লামা তারানাথ 'চন্দ্র' রাজাদের নামোল্লেখ করেছেন।

এইস্থলে দ্রষ্টব্য যে শেষের গুপ্তদের সময়ে আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে বঙ্গ, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গকে 'গৌড়চক্র' বলা হয়েছে। মূলতঃ উত্তর-পূর্বভারত একজাতি-তাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক গণ্ডীব অন্তর্গত।

অতঃপর বাঙ্গলায় শশাঙ্কের কাল উদয় হয় (মৃত্যু ৬৩৭ খৃঃ)। শশাঙ্ক সম্পর্কে "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ তারপর সোম—যিনি একজন অদ্বিতীয় বীর তিনি বারাণসী এবং তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরবর্তী দেশসমূহের রাজা হইবেন। তিনি দুষ্ট বুদ্ধির লোক, সুন্দর বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করিবেন··তৎপর মঠ, বাগান, চৈত্যসমূহ এবং জৈনদের (নিগ্র্ন্থ) বিশ্রামাগারগুলি বিধ্বংস করিবেন।···বৈশ্য জাতীয় রাজ্যবর্ধন নিহত হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সুবিখ্যাত সোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই শক্তিশালী বৈশ্য রাজা একটি বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের সেই অসৎ চরিত্রের লোকের সুন্দর রাজধানী পুণ্ড্রের বিপক্ষে যাত্রা করেন। তিনি সোমকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে স্ব-দেশের বাহিরে বহির্গত হতে নিষেধ করে দেন। তিনি ম্লেচ্ছদের সেই দেশে সম্মান পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।···ব্রাহ্মণ রাজা সোম উন্নতি লাভ করেন। তিনি ব্রাহ্মণদের অনেক দান করেন। সতের বৎসর এক মাস সাত কি আট দিন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মুখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কীটদষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন (নরকে যান)। দৈব দ্বারা তাঁর রাজধানী ধ্বংস হয় (১২৮)।

এই সোমই যে শশাঙ্ক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শশাঙ্ক সম্পর্কে জয়সয়াল বলেন ঃ Sasanka was an orthodox revivalist as against the weakening cult of Mahayana Buddhism, patronised and fostered by the later Guptas...Sasanka's death brought about the end of the national monarchy of Bengal.[১] কিন্তু পরে দেখা যায় গোপালদেবের অভিষেকে বাঙ্গলায় আবার জাতীয় শাসন প্রবর্তিত হয়।

এই পুস্তক হইতে জানা যায় যে, শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ বংশীয় এবং সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ছিলেন। তিনি আদৌ গুপ্তবংশীয় ছিলেন না। সেজন্য বোধ হয় অজানিত রাজনীতিক কারণবশতঃ তিনি বৌদ্ধ ও জৈন দলনে বৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের সীমা কাশী থেকে আরও বহুদূর অ- স্তৃত ছিল। সুতরাং শাহাবাদ জেলা বা বিহারের অন্য কোন স্থানে তাঁর মুদ্রা

১। K. P. Jayaswal : An Imperial History of India, pp. 50-51.

পাওয়া গেলেও তাঁকে 'বাঙ্গলার লোক নয়' বলা সমীচীন নহে। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা যশোহর জেলাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমানের অনেক লেখকেরা বলে থাকেন—শশাঙ্কের সময় থেকেই বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। অনেকে আবার এও বলেন যে, বাঙ্গলা এই যুগ অর্থাৎ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করেছে। এই উক্তি বিচারসম্মত কিনা তা' দেখা প্রয়োজন। উপরোক্ত পুস্তকগুলো থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্য-বাদীয়রাজারা আবির্ভূত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ্য, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণের লোকেরাও এই প্রদেশে বাস করছেন। আবার এখানে সনাতনী, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর কলহ দ্বন্দ্বও হয়েছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহুপূর্বেই বাঙ্গলা ভারতীয় আর্য্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু কবে এবং কখন আর্য্যভাষা আমদানী হলো তা' কে বলতে পারে? অশোকের যে লিপি পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাহা মাগধী প্রাকৃতে লেখা। আর গুপ্ত-যুগ থেকে সেন-যুগ পর্যন্ত তাম্রলিপি সংস্কৃতে লেখা। বাঙ্গলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত প্রসূত। কাজেই ধরে নিতে হবে মগধ থেকে লোক এসে এখানে আর্য্যভাষা ও আর্য্যকৃষ্ঠি বিস্তার করেছে।[১] কিন্তু এর সময় ও তারিখ কে নির্ণয় করতে পারে? সিংহলের দ্বীপবংশানুযায়ী বিজয় সিংহের পিতা সিংহবাহুর রাজত্ব-কাল আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বহু পূর্বে ছিল। যদি সিংহবাহু যথার্থ রাঢ়ের রাজা বলে স্থিরীকৃত হ'ন, তা' হলে এত প্রাচীনকালে সংস্কৃত নামযুক্ত রাজার নাম পেয়ে আমরা এরূপ অনুমান করতে পারি যে বাঙ্গলা তখন আর্যীভূত হচ্ছে বা হয়েছে। যা হোক শশাঙ্কের বহুপূর্বে এবং সম্ভবতঃ মিথিলা, মগধ আর্যীভূত হবার সঙ্গে বা পরে গৌড়বঙ্গ আর্য্য সভ্যতা পেয়েছে বলা যেতে পারে।

বাঙ্গলার আর্য্য সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং বাঙ্গলার ইতিহাস শশাঙ্ক থেকেই শুধু আরম্ভ হয় নি। 'আকবরনামাতে' (আইন আকবরী যাহার একাংশ) প্রাচীন নরক রাজা, ভগদত্ত প্রভৃতি থেকে লক্ষণ সেনের পৌত্র 'লক্ষমনিয়া' পর্যন্ত অনেকগুলো রাজবংশের তালিকা দেওয়া হয়েছে। হয়ত সেগুলো জনশ্রুতি হিসেবে দেখান হয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস প্রথমে জনশ্রুতি অবলম্বনেই লিখিত হয়, এবং জনশ্রুতির মধ্যেও কথঞ্চিৎ

১। S. C. Das : *Indian Pandits in the Land of Snow.*

ঐতিহাসিক সভ্যতা অন্তর্নিহিত থাকে।[১] গ্রীসের ও রোমের প্রথম যুগের ইতিহাস এই উপায়েই লেখা হয়েছে। ইউরোপের সেদিনকার ইতিহাসেও আজগুবি খবর ও অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এদেশে আজকাল যাঁরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বাঙ্গলার ইতিহাস ও জনশ্রুতি সম্পর্কে ছুঁৎমার্গী হয়ে চরমপন্থীয় মনস্তত্ত্ব-পোষণ করছেন, তাঁরা ভুলে যান যে চরমপন্থীয় মনোভাব শেষে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়ে থাকে। পূর্বে পুরাণসমূহকে আজগুবি গল্প বলে বর্জন করা হোত, কিন্তু এখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বলেছেন এগুলোতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে।

"আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" শশাঙ্ক সম্বন্ধে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, শশাঙ্ক ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গ ও মগধে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটে। তিনি হর্ষবর্ধন কর্তৃক পরাজিত হন; অথচ পূর্ব-ভারতে তিনি ছিলেন এক পরাক্রান্ত সম্রাট। এ সমস্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শশাঙ্কের বৌদ্ধ দলনের পশ্চাতে শ্রেণী-লক্ষণ (class character) নিশ্চয়ই লুক্কায়িত ছিল। শশাঙ্ক হঠাৎ ধর্মান্ধ হয়ে বৌদ্ধ নির্যাতন সুরু করেন নি। শশাঙ্ক একটি শ্রেণীর মুখপাত্রই ছিলেন। ইহা আজ নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে শশাঙ্ক স্বাধীনভাবেই জীবন-যাপন করে গেছেন। মহাসামন্ত থেকে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' অর্থাৎ সম্রাট উপাধি অর্জন করেছিলেন। গঞ্জাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত তাম্রফলকে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব" নাম ও স্থানীয় "সৈন্যভীত" সামন্তের নাম পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব-ভারতের সম্রাট ছিলেন।

শশাঙ্ককে (৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু) নিয়ে বাঙ্গলায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শশাঙ্ক সম্ভবতঃ মগধের গুপ্ত বংশজাত ছিলেন। বাণভট্টের 'শশী' শশাঙ্কের আলঙ্কারিক নাম হতে পারে না। বরং আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে সোম শশাঙ্কের নামের প্রতিশব্দ ও আলঙ্কারিক নাম হওয়া সম্ভব।

উত্তর ভারতের সমসাময়িক সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ের পূর্বের রাজা শশাঙ্কের নামের সঙ্গে দু'টি অপবাদ বিজড়িত হয়ে আছে। শশাঙ্কের প্রথম অপবাদ এই যে তিনি অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনদের দলন করেছিলেন।[২] এই

১। Bertrand Russell: *History of Western Philosophy*, Fustel de Coulanges: *Ancient City*.

২। আর্যমঞ্জুশ্রীকল্পের অনুবাদ—কে, পি, জয়সয়াল—An Imperial History of India, pp. 495.

বিষয়ে আর্য্যমঞ্জুশ্রী বলেছেন ঃ "সোম সুন্দর বুদ্ধমূর্তি বিনষ্ট করিবেন··· সংঘারাম, বাগান এবং চৈত্যসমূহ ধ্বংস করিবেন, আর জৈনদের (নিগ্রন্থদের) বিশ্রামাগার নষ্ট করিবেন।"[১]

আবার হিউয়েন স্যাং বলেছেন ঃ "বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম একবার বাঙ্গলার দুষ্ট রাজা শশাঙ্কের দ্বারা কর্তিক হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অশোকের শেষ বংশধর মগধের রাজা পূর্ণবর্মার (হিউয়েন প্রদত্ত নাম 'পূর্ণগুপ্ত') দ্বারা পুনঃ সঞ্জীবিত করা হয়।"[২]

অপরদিকে বর্তমানকালের অনুসন্ধানকারী ৺বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন ঃ "বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্মাণকর্ম সম্ভবতঃ শশাঙ্কের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট শৈব ধর্মাবলম্বী একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর দ্বারা সংগঠিত হয়। এই কর্মের জন্য ইমারতের কতকাংশ হয়ত ভাঙ্গিতে হয়। হয়ত কোন কারণবশতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, মন্দিরের চারিদিকের রেলিং এবং বোধিবৃক্ষের পুনঃ রোপণ পূর্ণবর্মার দ্বারা সম্পাদিত হয়।"[৩] আবার তিনি বলেছেন—ইহা যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়ে, বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্মাণ কল্পে পুরাতন ইমারৎ ভাঙ্গবার এবং পুরাতন রেলীং সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল, তা হলে এই প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ মন্দির একজন শৈব রাজার আনুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল।"

হিউয়েন স্যাং-এর মতে বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্মাতা ছিলেন একজন শিব-মহেশ্বরের ব্রাহ্মণ ভক্ত যিনি স্বীয় উপাস্য দেবতার আদেশ পেয়ে বুদ্ধদেবের গৌরবার্থ এই মন্দির নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি রাজা শশাঙ্কের সভার এক মন্ত্রী ছিলেন।

আবার এই মন্ত্রীর ছোট ভাই শিব মহেশ্বরের আদেশ পেয়ে একটি সরোবর খোদিত করেন। ইহা আজকাল 'বুদ্ধপক্ষ' নামে অভিহিত হয়। এই মন্দিরের বুদ্ধদেব মূর্তি নির্মাণ করেন একজন ব্রাহ্মণ শিল্পী। আবার কানিংহাম বলেছেন ঃ গোপাল এবং ধর্মপাল নামে দুইজন শিল্পী যাঁরা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের নাম বাঙ্গলা অক্ষরে খোদিত বলে দৃষ্ট হয়। ইহাই হলো বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজা কর্তৃক বৌদ্ধ দলন বিষয়ে শেষ

১। আর্য্যমঞ্জুশ্রীকল্পের অনুবাদ—কে, পি, জয় সয়াল—An Imperial History of India, pp. 459.

২। Beals : Buddhist Records. Vol. II, p. 148.

৩। B. M. Barua : Gaya and Bodh Gaya, pp. 31-56.

সংবাদ। এতদ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, বাঙ্গলার এক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজার আনুকূল্যে ব্রাহ্মণমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালী ভাস্কর ও শিল্পীদের দ্বারা বুদ্ধগয়ায় জগৎবিখ্যাত মহাবোধি মন্দির নির্মিত হয়। আর শশাঙ্কই সেই শৈব রাজা বলে অনুমান হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ শশাঙ্কের নামের সঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার অপরাধ বিজড়িত আছে। ইহা বৌদ্ধদের প্রদত্ত অপবাদ। এই বিষয়ে হর্ষের স্তুতিগায়ক বাণভট্ট বলেন ঃ "রাঢ়াধীপেন মিথ্যোপচারোপিত বিশ্বাসং মুক্ত শস্ত্রমেকাকানাং বিশ্রব্ধং স্বভবন এত ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্ শ্রৌষিত।" (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস) এর অনুবাদ হলো—তার পরে হর্ষদেব শুনিলেন ঃ কেমন করে গৌড়াধিপ মিথ্যা সৌজন্যে ভুলিয়ে, রাজ্যবর্দ্ধনের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছিলেন, কেমন করে যখন একাকী স্বভবনে প্রগাঢ় বিশ্রামে মগ্ন, তখন মুক্ত শস্ত্র গৌড়াধীপ সেখানে প্রবেশ করেছিল, এবং হর্ষদেবের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনকে ক্রুর হত্যা করে। আবার অন্যস্থলে সেনাপতির মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে—"দেব দেবভূয়ে নরেন্দ্রে দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ জগ্ধ জীবিতে চ রাজ্যবর্দ্ধনে"। (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)। এর অর্থ—হে দেব! নরেন্দ্র দেবভূমিতে প্রয়াণ করেছেন, তাঁর পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন দুষ্ট এক গৌড়ভুজঙ্গের গরল দংশনে ইহলোকে আর নাই।

এতদ্বারা আমরা হত্যাকারী বলে শশাঙ্ক বা নরেন্দ্রগুপ্ত নামক কোন লোকের নাম পাই না। পুনঃ হর্ষের মাতুলপুত্র ভণ্ডী এসে বলেছেন—"দেব-ভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধন গুপ্ত নাম্না গৃহীত কুশস্থলে..." (সপ্তম উচ্ছ্বাস) এর অর্থ—দেবলোকে রাজ্যবর্দ্ধন প্রয়াণ করলে গুপ্তনামে একজন লোক কান্যকুব্জ দখল করে।" এস্থলেও আমরা শশাঙ্কের নাম পাই না। এই গুপ্ত অন্য কোন লোক হতে পারেন। শেষে উল্লিখিত আছে যে রাজ্যশ্রী ভ্রাতা হর্ষকে বলেছেন ঃ "কান্যকুব্জ গৌড় সংভ্রমং গুপ্ততো গুপ্তিনাম্না কুলপুত্রেণ নিষ্কাসমং নির্গতাশ্য রাজ্যবর্দ্ধন মরণ শরণং শ্রুত্যা..." (অষ্টম উচ্ছ্বাস) এর অর্থ—কেমন করে এল গৌড় সম্ভ্রম, কেমন করে কান্যকুব্জের কারাগৃহের থেকে মুক্তিলাভ করলেন রাজ্যশ্রী। কেমন করে গুপ্তিকরণ দ্বারা গুপ্তনামা এক কুলপুত্র তাকে নিষ্কাষণ করে, কেমন করে শ্রুতিগোচর হয় রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু।[১] এই উক্তির দ্বারা আমরা এই তথ্য পাই যে, মৌখরী গ্রহবর্মার যুদ্ধে মৃত্যুর পর, গৌড়াধীশ কান্যকুব্জে আসেন; আর রাজ্যশ্রী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হলে, গুপ্তনামক এই কুল পত্র (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) তাকে লুকিয়ে খালাস করে দেয়।

১। শ্রীপ্রবোধেন্দ্র ঠাকুরের অনুবাদ।

এখানে প্রশ্ন উঠে, 'প্রাপ্তে গুপ্তে কুশস্থলে' শ্লোকের গুপ্ত কে? এ নিয়েই অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। আজকালকার ঐতিহাসিকগণ বলছেন: তিনি মালবরাজ দেবগুপ্ত।[১] ইহাই সম্ভব যে মালবরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থানীশ্বর রাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের আন্তরিক অপ্রীতি ছিল। বাণভট্ট বলছেন: কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামে দুই মালব রাজপুত্রকে প্রভাকরবর্দ্ধন তাহার পুত্রদের বয়স্য করে দেন (চতুর্থ উচ্ছ্বাস)। সুতরাং অনুমান হয় আসলে এই দুই রাজপুত্র মালবরাজের জামিনস্বরূপ স্থানীশ্বর রাজসভায় থাকতো। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত এবং গৌড়েশ্বর (তিনি যেই হউন) সম্মিলিত হয়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মা নিহত হন এবং রাণী রাজ্যশ্রী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু গুপ্তনামে এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি রাণীকে গুপ্তভাবে খালাস করে দেয় আর তিনি পরিচারিকাদের সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যপর্বতের জঙ্গলে পলায়ন করেন। ইহাই হলো আসল ইতিহাস। এ'স্থলে কিন্তু শশাঙ্ক বা নরেন্দ্রগুপ্ত নামধারী কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ নাই। এই আসল সত্যের উপর এত অপ্রাকৃত গল্প রচিত হয়েছে। বোধ হয় চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন স্যাং এর জন্য দায়ী। বৌদ্ধেরা শশাঙ্ককে দেখিতে পারিত না। তাঁহার উপর বৌদ্ধ দলন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" নামক বৌদ্ধ পুস্তকে অন্য তথ্য পাওয়া যায়। এই পুস্তকে বাঙ্গলার রাজা গোপালদেবের অভিষেকের পর লিখিত বলে অনুমিত হয়। কারণ ইহার পর বাঙ্গলার বিষয়ে আর কোন সংবাদ এই পুস্তকে নাই। অবশ্য প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই এই ঘটনা শোনা কথা।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' পুস্তকে শশাঙ্ককে (সোম) গালাগালি দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে রাজ্যবর্দ্ধনকে বৈশ্যজাতীয় বলা হয়েছে এবং তিনি "নগ্ন" (Nagna) জাতীয় এক রাজার হস্তে প্রাণদান করেন বলে উল্লিখিত আছে।[২] "তাহার ছোট ভাই 'হ' (হর্ষ) বিখ্যাত সোমের বিপক্ষতাচরণ করেন। বিপুল সৈন্যদল নিয়ে সেই চরিত্রহীন লোকের উত্তম রাজধানী পুণ্ড্রের বিপক্ষে যাত্রা করেন ও সোমকে পরাজিত করেন।"

এই সংবাদ দ্বারা নূতন তথ্য আমরা আবিষ্কার করিলাম। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর সঠিক ঘটনা বিষয়ে আরও গোল বাধিল।

১। যতীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও অমূল্যনাথ লাহিড়ী: আমাদের দেশ।

২। শ্লোক (৭১০—১১)

এ'স্থলে আমাদের দ্রষ্টব্য এই যে সুপ্রাচীন শৈশুনাগ বংশের রাজত্বকাল থেকে পূর্ব-ভারতের রাষ্ট্রদের যে লক্ষ্য—পশ্চিমদিকে সম্প্রসারণ গতি, তাহাই গৌড়েশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল। এ'জন্যই মালবরাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ এবং হর্ষবর্দ্ধনের বিপক্ষতাচরণ করা।[১]

আর্য্যমঞ্জুশ্রী পুস্তক অনুসারে শশাঙ্কের পর বাঙ্গলায় একটা সাধারণতন্ত্র কিছুদিনের জন্যে স্থাপিত হয়। এরপর পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের অভিষেকের পূর্বে একজন জনপ্রিয় শূদ্রজাতীয় বাঙ্গালী নেতা—'ভ' বা 'স্ব'-রাজরূপে নির্বাচিত হ'ন (খৃঃ ৭০৫—৭৪০)। সতের বছর তিনি রাজত্ব করেন এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ—উভয়কেই তিনি অপ্রিয় 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ভূ-স্বামী, সৎচরিত্র সাধু ও অন্যান্যদের তিনি ধ্বংস করেন আর ধর্মভণ্ডের শাসন করতেন। তিনি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং তাঁর শাসন-পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। পুনঃ উক্ত পুস্তক অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর (খালিমপুর অনুশাসন উক্ত) "মাৎস্য ন্যায়" আরম্ভ হয়; এবং জনসাধারণ নীচ শূদ্র বংশীয় ("দাসজীবিন") গোপালকে রাজপদে নির্বাচন করে (৭৪০-৭৫৭)। আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে দেখা যায়—গোপাল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা তখনকার দিনে লোকেরা নানাভাবে প্রপীড়িত হ'তো। তার সময়ে বৌদ্ধধর্মও বিনষ্ট হ'তে থাকে। আবার তিনি বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণকেই বেশী দান করতেন। কিন্তু তার বংশধরেরা পরে বৌদ্ধ হয়ে যায়। জয়সয়াল বলেন, এই রাজা ও গোপালের নির্বাচনে এ' কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাতিভেদের বিধান ও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বরূপ বৈদিকমত থেকে বাঙ্গলা অষ্টম শতাব্দীতেই বিমুক্ত হয়েছে। জয়সয়াল আরও বলেন যে, শেষ গুপ্ত রাজাদের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলেই গৌড়ে অরাজকতা উপস্থিত হয়; এবং তখন প্রজারাই (প্রকৃতিপুঞ্জ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপালকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত ক'রে। আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে এ' সময়ে গৌড়, সমুদ্রতীর পর্যন্ত 'তীর্থিক' অর্থাৎ অ-বৌদ্ধগণ কর্তৃক (heretic) পরিপূর্ণ ছিল।[২] গোপালের সময় থেকেই বাঙ্গলার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। এই শূদ্রবংশের প্রভাবে বাঙ্গলা এক সময়ে উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব ভোগ করেছে। এই বংশের দেবপাল দেবের শাসনকালে ভারতমহাসাগরের সুমাত্রা দ্বীপের শৈলেন্দ্র

১। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের অনুবাদ—কে, পি, জয়সয়াল : An Imperial History of India, p. 150.

২। K.P. Jayaswal : An Imperial History of India.

সম্রাটের সহিত একটি সন্ধি হয়েছিল—এরূপ সংবাদ নালন্দায় আবিষ্কৃত তাম্রলিপি থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগে অব্রাহ্মণ্য ও সাম্যবাদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই বাঙ্গলার লোকেরা শূদ্রদের দ্বারা শাসিত হ'য়ে এক বিরাট মহিমান্বিত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই বিষয়ে জয়সয়াল বলেছেনঃ "এবম্প্রকারে ভারতের ইতিহাসে শূদ্র একটি গৌরবান্বীত অধ্যায় সংযোগ করে"। বাঙ্গলায় বরাবর অব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর বর্ধমান রাঢ় দেশে ধর্মপ্রচার করেছেন; তাছাড়া এ' প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের বিবিধ সম্প্রদায়, নাথধর্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। তবে ব্রাহ্মণ ও তাদের শিষ্যবর্গ যে বাঙ্গলায় ছিল না তা' অস্বীকার করা যায় না, বরং পূর্বোক্ত বৌদ্ধ পুস্তক আর্য্যমঞ্জুশ্রীর মতে শশাঙ্ক ও গোপালের সময় বাঙ্গলা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোকজনের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, সেনরাজগণের শাসন সময়ে মোট দু'হাজার ব্রাহ্মণবংশ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রাহ্মণবংশের এই তালিকা বল্লালের কুলীন গোষ্ঠীর তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ শ্রেণী ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণও বিস্তর ছিল বলে প্রমাণ আছে। আবার পাল রাজারা ব্রাহ্মণদের গ্রাম দান করেন। এ সব কাহিনী যে সব তাম্রফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো থেকে 'লাট' ব্রাহ্মণ নামে এক শ্রেণীর নাম প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বের করেছেন। তবে এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ যে অব্রাহ্মণ্যবাদীর দেশ ছিল তাহা বহুপ্রাচীন স্মৃতিকারদের বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গে 'ভ্রমণনিষেধ' বিধি থেকে স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয়ে থাকে। আবার এ'টাও বলা হয় যে শশাঙ্কই সরযুপারী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বাঙ্গলায় আমদানী করেন।[১]

শশাঙ্কের পরে এবং পাল রাজাদের উত্থানের মধ্যবর্তীকালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকারেরা ত্যাগ করেন। অথচ তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি। এখানে সেই ঘটনাটির উল্লেখ করা হচ্ছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গলায় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে গৌড়ের সহিত কাশ্মীরের ইতিহাস বিশিষ্টভাবে জড়িত আছে। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ নরপতি এবং দিক্‌বিজয়ী যোদ্ধা রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য (৭২৩-৭৬০ খৃঃ) তার দিক্‌বিজয়কালে পূর্বদিকে কান্যকুব্জ ও গৌড় দেশ জয় করেন বলে কথিত হয়। তিনি পরিহাসপুরে পরিহাস কেশবের মন্দির নির্মাণ করেন এবং

১। নগেন্দ্রনাথ বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; রাজন্যকাণ্ড; পৃঃ ৭১।

তারই পাশে একটি পৃথক রৌপ্যমন্দির নির্মাণ করার পর 'রামস্বামী' নামে একটি বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। এ বিষয়ে "রাজতরঙ্গিনী" নামক কাশ্মীরের ইতিহাস প্রণেতা কহ্লণ পণ্ডিত বলেছেন: "রাজা ললিতাদিত্য মহত্ত্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছেন। তথাপি তাহারও সাধারণ রাজাদের ন্যায় আর একটি দোষ ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তিনি পরিহাস কেশব নামক বিষ্ণুবিগ্রহটিকে মধ্যস্থরূপে রাখিয়াও ত্রিগাম্য দেশে উগ্র সৈনিকের সাহায্যে গৌড়াধীপকে বধ করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌড়েশ্বরের অনুচর-দিগের অতি অদ্ভুত বিক্রম দেখা গিয়াছিল। স্বর্গগত প্রভুর গুণ ভুলিতে না পারিয়া তাহার হত্যার শোধ লইবার জন্য কাশ্মীর সৈন্যদলের সহিত তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন বিক্রমশালী গৌড়ীয়েরা রজতময় রামস্বামী বিগ্রহকে পরিহাস কেশব ভ্রমে আক্রমণ করিল। তাহাকে উৎপাটন করিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। এ সময় কাশ্মীর সৈন্যেরা নগর হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে নানাবিধ কঠিন প্রহারে হত্যা করিতে থাকিলেও উহারা রামস্বামীর তিল তিল পরিমাণে চূর্ণ চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল"।[১] সুতরাং তৎকালে গৌড়বাসীরা যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতার অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"ক্ব দীর্ঘকাললঙ্ঘ্যোঽধ্বা শাস্তে ভক্তিঃ ক চ প্রভৌ।
বিধাতুরপ্য সাধ্যং তদ্‌যদ্গৌড়ৈর্বিহিং তদা॥

*　　*　　*

অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামী পুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ"।[২]

"সেই রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ গৌড়বাসীদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করে কাশ্মীর নাথের অতি প্রিয় ভগবান পরিহাস কেশব রামস্বামী বিগ্রহের বিনিময়ে রক্ষিত হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামী মন্দিরটি যেমন একদিকে দেবতাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। তেমনি সেই গৌড়ীয় বীরদিগের অদ্ভুতযশ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে"।[৩] এই ঘটনাটি আধুনিক বাঙ্গলার ইতিহাসে স্থান পায় নাই। কারণ ইহার কোন 'পাথুরে প্রমাণ' বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা পান নাই। কেহ এই ঘটনাটিকে পাহাড়ী লোকদের দ্বারা সংগঠিত বলে থাকেন। কেহ ইতিহাস গ্রাহ্য নয় বলে মনে করেন। অবশ্য ঘটনাটি পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ঘটেছিল। আর্য্যমঞ্জুশ্রী গ্রন্থেও এই ঘটনা স্থান পায়নি, কারণ

১। রাজতরঙ্গিণী, শ্লোক, ৪।৩৩২।　　২। রাজতরঙ্গিণী, (৪।৩৩০-৩৩৩)

৩। রাজতরঙ্গিণী, (৪।৩৩৫)

আর্যামঞ্জুশ্রী মহাযান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস মাত্র! কহ্লণ লিখেছেন, "ললিতাদিত্য যশোবর্মাকে বশীভূত করে কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন গৌড়মণ্ডল হতে অসংখ্য হস্তী এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে গৌড়েশ্বর ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তারপর, কোন কারণবশতঃ কাশ্মীরে আহ্বান করে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই তথ্য অবিশ্বাস করার হেতু কি?

কহ্লণ স্বদেশের শ্রেষ্ঠ নরপতির বিপক্ষে মিথ্যা গল্প রচনা করেন নি। ঘটনাটি পূর্বেই ঘটেছিল বটে, কিন্তু তিনি রামস্বামীর শূন্য মন্দির দেখেই তার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বাঙ্গলায় এই ঘটনার কোন প্রতিধ্বনি কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কতটা 'পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া যায়?

আসলকথা, বিদেশী শাসনের বশীভূত হয়ে অতীতের গৌরব কথার ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। তজ্জন্য এক শ্রেণীর লেখকেরা বর্তমানকে অতীতে নিয়ে গিয়ে বর্তমান অবস্থার মাপকাঠি দ্বারা তার পরিমাণ ঠিক করেন! এ'জন্যেই বিদেশীর লেখা বর্ণনা বা তাম্রফলক অথবা প্রস্তর শাসনোক্ত ঘটনাকে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু এ সবের ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু? তাম্রশাসন বা প্রস্তরলিপির মধ্যে রাজার পাদপদ্মসেবীদের চাটুকারবাদই বেশী। পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন বাঙ্গলার ইতিহাসের কোন ঘটনা যাঁরা মানতে চান না, তাঁদের উপলক্ষ্য করে প্রত্নতাত্ত্বিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন: "আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকারগণ কুল গ্রন্থের উপর খড়্গ হস্ত। কিন্তু কুলগ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সমসাময়িক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।"

গৌড় বীরদের বীরত্বের কথা অস্বীকার করতে গেলে কহ্লণের পুস্তকটাকেই অস্বীকার করতে হয়। এই পুস্তক আমাদের 'সবে ধন নীলমণি'।[১] যে দুই তিনখানা সংস্কৃত পুস্তক ভারতীয়দের লেখা ইতিহাস বলে আদৃত, রাজতরঙ্গিণী তন্মধ্যে অন্যতম। ললিতাদিত্যের দিগ্‌বিজয়ের কথা ভারতের হিন্দু যুগের একটি গৌরবময় অধ্যায়, কারণ তিনি ভারতের বাইরের কতিপয় দেশ জয় করেছিলেন। অথচ তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ স্বরূপ গৌড়বীরদের অসীম সাহসিকতাতে অবিশ্বাস করতে হবে—এটা কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তি?

১। নলিনীকান্ত ভট্টশালী: দনুজ মাধব শ্রীদশরথ দেবের তাম্রশাসন, ভারতবর্ষ ১৩০২ পৌষ।

শশাঙ্কের নামে যে বিশ্বাসঘাতকতার কথা আরোপিত হয়েছে তাহা তার শত্রু-পক্ষীয়েরা দিয়েছে, কিন্তু ললিতাদিত্যের বেলায় তার স্বপক্ষীয় ইতিহাসকার তার বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষ্য প্রদান করছেন।

কহ্লণ এই ঘটনা ছাড়াও পরের একটা ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সময় কাশ্মীর ও গৌড়ের পুনরায় আকস্মিক সহযোগ হয়। জয়াপীড় দিগ্‌বিজয়কালে গৌড়ের রাজা জয়ন্তের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে ছদ্মবেশে আসেন। তথায় কার্তিকেয় মন্দিরের দেবদাসীর গৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু রাত্রে এক সিংহ (অবশ্য বাঙ্গলায় ব্যাঘ্র) বধ করায় তার আত্মপ্রকাশ হয়। রাজা জয়ন্ত তার কন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের বিবাহ দেন। জয়াপীড় স্বীয় শ্বশুরের শত্রুসমূহ পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তাদের অধীশ্বর করলেন। শেষে কমলা নর্তকী, রাণী কল্যাণ-দেবীকে সঙ্গে করে জয়াপীড় কাশ্মীর প্রত্যাবর্তন করেন।[১] কহ্লণ বর্ণিত গৌড় কাশ্মীরের সম্বন্ধ বিষয়ে শেষকথা এই: গৌড় রাজকুমারী কল্যাণদেবীর গর্ভজাত পুত্র পৃথিব্যাপীড় পিতৃসিংহাসন আরোহণ করিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব করেন (৭৬৬(?)—৭৭২ খৃঃ)।

প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করা যায় যে গোপাল ও বঙ্গের পাল বংশের উৎপত্তি নিয়ে এদেশে অনেক বিতর্ক বিদ্যমান। পালরাজগণ আপন জাতি ও আসল উৎপত্তিস্থলের কোন সংবাদ বা বর্ণনা দিয়ে যাননি। 'আকবরনামায়' তাদের কায়স্থ বলা হয়েছে। কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কৌমলি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে পালরাজগণ সূর্যবংশ সম্ভূত।[২] অবশ্য পাল রাজগণ কয়েক শতাব্দী ধরে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাদের তাঁবেদারগণের দ্বারা এইসব প্রশস্তি লিখিত হয়েছে। তাঁদের একজন তাঁবেদার সন্ধ্যাকর নন্দী বলেছেন: তাঁরা 'সমুদ্রকূলে' উৎপন্ন হয়েছেন (সমুদ্রকূল দীপো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মনামা ধর্ম্মপাল ইতি যাবৎ নৃপতিরভূৎ)।[৩] ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিতে সমুদ্রকূলে ধর্ম্মপালের উৎপত্তি কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল'-এর উপর বিশ্বাস করিয়া পালবংশের উৎপত্তি বর্ণনা বিজ্ঞান সম্মত হইত না"।[৪] কিন্তু 'সমুদ্রকুল'টি কি, ইহা কি যদুকুল, বৃষ্ণিকুল প্রভৃতির ন্যায় একটি অভিজাত বংশ? অথচ এই কুলের নাম ভারতীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না বলে এ' পরিচয়

১। রাজতরঙ্গিণী, (৪।৪১৯—৪৭০)

২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৮।

৩। রামচরিত: প্রথম পরিচ্ছেদ।

৪। বাঙ্গলার ইতিহাস: ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭১।

বর্ণনায় কেহ কেহ সন্দিহান। আবার পালগণ প্রবল প্রতাপশালী হয়েছিলেন বলে অনেকে তাদের বাঙ্গালী বলতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পালরা যে 'বাঙ্গালী' বর্তমানে তাহা নিঃসন্দেহরূপে স্বীকৃত হয়েছে। পাল রাজগণের আভিজাত্য কয়েক শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী হওয়ার পর তাদের 'কুলের' প্রকাশ পায়। পালদের ধ্বংসকারী সেন রাজগণের রাজত্বের বহুপরে আনন্দভট্টের 'বল্লাল-চরিতে' পালদের "নিকৃষ্টক্ষত্রিয়" বলা হয়েছে।[১] নুলো পঞ্চানন পালদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

"ভূপাল অনঙ্গপাল, আর মহীপাল
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল
তারাও বিবাহ করিত তিন জাতির মেয়ে।"[২]

তা'হলে, পালদের তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পর বাঙ্গলায় বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণদের দ্বারা তারা "রাজন্য" বলে পরিগণিত হতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় বা রাজন্য কি প্রকারে হয় তাতেও নুলো এই পালদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

"বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ জাতি।
ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র রাজন্য বলিয়া বলায় যত্রতত্র।"

ভারতে ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভবের এটাই হচ্ছে "চাবিকাঠি"। এর দ্বারাই ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নুলো আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

"রাজায় রাজায় বিবাহ, সবাই ক্ষত্রিয়
পিতৃমাতৃ একপক্ষ, রাজন্য গোত্রীয়।"[৩]

ভারতের পণ্ডিতেরা এটা বরাবর জানেন যে হিন্দু রাজাদের কোন জাতি নেই। হয়ত মুসলমান প্রাধান্যের সময়ে দেশের ভিতর গমনাগমনের অসুবিধার জন্যে নিজের দেশের মধ্যেই রাজার 'জাতি' সৃষ্টি হয়েছিল। আর এর প্রমাণও আছে যে, মানসিংহ বাঙ্গলায় এসে কুচবিহার রাজবংশে বিয়ে করেছিলেন।[৪] তাঁর আরও একটি বাঙ্গালী স্ত্রী ছিল। তাঁর পৌত্র (জগৎসিংহের পুত্র) কুচবিহারের রাজার কন্যাকে বিয়ে করেছিল।[৫] রাজারা

১। বল্লালচরিত : ১৮শ অধ্যায়। ২। সম্বন্ধ নির্ণয়ের উদ্ধৃত, পৃঃ ৭০৩।
৩। গোষ্ঠীকথা : সম্বন্ধ নির্ণয়ে উদ্ধৃত, ৭৩৮-৭২৮।
৪। আকবরনামা দ্রষ্টব্য। ৫। যদুনাথ সরকার : দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাস—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৪৬ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

নিজেরাই একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। তাদের আবার জাত কি? তারা রাজাশ্রেণী—অতএব ক্ষত্রিয় (ঋক্‌বেদে ক্ষত্রিয় শব্দের স্থলে "রাজন্য" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। এ'টা খুব বিস্ময়ের কথা যে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা অতীতের রাজাদের কুল খুঁজিয়া যাদের জাতি নিরূপণ করতে চান। বাঙ্গলায় 'সমুদ্র কুল' বলে কোনো কূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব পালগণ বাঙ্গালী নন বলা কোন মতে সমীচীন বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' উল্লেখ আছে—গোপাল 'দাসজীবিন' জাতীয় ছিলেন; অর্থাৎ যে জাতি দাস্যবৃত্তি করে। পূর্ববঙ্গে এখনও দাস বলে একটি জাতির বাস আছে। প্রাচীন সমতটের সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে বরাবর দাস, কৈবর্ত, জেলে, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিগুলি বাস করছেন। এদের পেশা হলো দাস্যবৃত্তি, মাছধরা বা চাষাবাদ করা। হয়ত প্রাচীনকালে এরা বিভিন্ন কৌমরূপে ছিল যারা পরে রিসলীর ব্যাখ্যানুসারে নৃ-কুলতাত্ত্বিক জাতি (Ethnic Caste) রূপে পরিণত হয়।[১] বাঙ্গলার প্রাচীন অধিবাসীদের কুল থেকেই এই গোপালদেব উদ্ভূত হয়েছিলেন তা' স্বীকার করতে আপত্তি কি? ইহাতে কি হিন্দুর আভিজাত্যে আঘাত লাগে?

আবার ঘনরামে দেখা যায় যে, ধর্ম্মপালের নির্বাসিতা পত্নী বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র হয়, এবং সে গৌড়েশ্বর হয়:

"বনবাসে তখন আছিল সেই সতী
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি।"[২]

এই শ্লোক সম্পর্কে ৺রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেছেন যে, "ঘনরাম কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গল রচনাকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল"।[৩] হয়ত সমুদ্রকুলবর্তী কোন জাতি (tribe) থেকে পাল রাজাদের উদ্ভব রূপ সত্যটি 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা'র ন্যায় সমুদ্রকূলে জন্ম বলে স্তুতিগায়কদের মুখে রূপক হিসেবে অলঙ্কার দিয়ে প্রচলন হতে লাগলো। এ' প্রকারেই ছোটনাগপুরের "গোবংশীয়", "নাগবংশীয়", রাজপুতেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হয়েছে। আজ তারা বিষ্ণুপুরাণোক্ত 'নবনাগ' রাজাদের (তাম্রলিপি বর্ণিত ভারশিব সম্রাটদের) সহিত সম্পর্ক যোগসূত্র টানছে। ৺শরৎচন্দ্র রায় এই নাগ সম্রাটদের আদিম জাতীয় 'হিল ভূঁইয়া' জাতির

২। Risley: Peoples of India.
২। ধর্মমঙ্গল: কাঙুর যাত্রাপালা।
৩। বাঙ্গলার ইতিহাস: প্রথম ভাগ, পৃ: ১৭০।

সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন।[১] পালরাজবংশীয়েরা নীচ শূদ্র বংশীয় ছিল —এ সংবাদই ঠিক। লামা তারানাথের পুস্তকে, গোপাল এক ক্ষত্রিয়া-কুমারীর গর্ভে বৃক্ষ দেবতার পুত্ররূপ বর্ণনা আরও হাস্যাস্পদ। তদ্দ্বারা তাকে আদিবাসী জাতীয় বলে ধার্য করতে হয়; এ' জন্যই তারা কোন স্থানে নিজেদের বর্ণোৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে যায়নি। গুপ্তসম্রাটেরাও এভাবে নিজেদের জাতি গোপন করেছিল। জয়সয়াল অনুমান করেন নবাবিষ্কৃত "কৌমুদিনী মহোৎসব" নাটকে (৩৪০ খৃঃ লিখিত) গুপ্তদের "কারস্কার" (কথং কার রাজ্য সিরি)' বলা হয়েছে। বৌধায়ন (১।১।৩২) কারস্কারদের ব্রাহ্মণ-বর্জিত অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে এদের ব্রাত্য ও ব্রাহ্মণবর্জিত বলা হয়েছে। অপরদিকে আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে গুপ্তদের "মধুরায়াং জাত বংশাঢ্যঃ বণিক" [পাঠান্তর মথুরাজাত বৈশ্যখ্যাঃ পূর্ব্বো] বলে অভিহিত করা হয়েছে। জয়সয়াল শেষোক্ত বিবরণটির অনুবাদ করেছেন যে, গুপ্তেরা মথুরায় জাঠ (Jat) জাতীয় লোক ছিল। তাদের গোত্র ছিল 'ধরণা'।[২] ঐ সূত্র অবলম্বন করে জয়সয়াল মহাশয় বলেছেন যে, গুপ্তরা বর্তমান কাক্কর জাঠ জাতীয় ছিল; কিন্তু দু'জায়গায় প্রাপ্ত 'আর্য্যমঞ্জুশ্রী'র দু'খানা পুস্তকেই 'জাত' শব্দটি আছে; ইহা 'জাঠ' বা 'জাট' হ'তে পারে না! সেজন্যে জাঠ কি প্রকারে বৈশ্য হ'তে পারে—ঐ ভাবনায় লেখক বড় মুস্কিলে পড়েছিলেন। তাঁর মতে গুপ্তদের পদবী দেখিয়া লোকে এ ভ্রমে পড়েছিলেন ও ভুল করেছিলেন; এমনকি ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও তাদের বৈশ্য বলেছেন। কিন্তু 'জাত' শব্দ 'জাঠ' শব্দে পরিণত হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণ বর্জিত কারস্কার কি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে না? 'মৃচ্ছকটীক' নাটকে সাগরদত্ত বণিকের পুত্র চারুদত্তকে বণিক্ বলা হয়েছে অথচ তারা ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয়। এই লেখক নিজেই বলেছেন যে, ভাকাটাকা সম্রাটের ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় পদমর্যাদা (Status) পেয়েছিল।[৩] এখানে আরও বলা হচ্ছে যে, "কৌমুদিনী মহোৎসব" পুস্তকে বর্ণিত রাজার সঙ্গে গুপ্তদের কোন সম্পর্ক নেই বলে সমালোচনা করাও হয়েছে।

জয়সয়ালের শেষের মত গ্রহণ করলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে জাঠেরা এক সময় জাতিতে শূদ্র ছিল।[৪] তারা এখনও তাদের দেশে শূদ্র বলে গণ্য

১। Hill Bhuiya of Orissa in 'Man in India' Vol. 14. pp. 384.

২। Ep. Ind. No. IX. Poona plates of Prabhavatidevi.

৩। জয়সয়াল: History of India: J. B. and O. R. S. 1933.

৪। Kanongo; History of the Jats.

হয়ে থাকে। গুপ্তরা পালদের ন্যায় নিকৃষ্ট শূদ্র বংশজাত ছিল বলে নিজেদের বংশ পরিচয় দেয়নি।

সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে লোক উত্থিত হয়ে সাধারণ লোকের উপরে প্রভুত্ব করেছে, আর নিজের কৌম বা জাতিকে বড় করেছে—ইহাই ভারতের ইতিহাসের অভিব্যক্তি। আর জৈমিনীর "পূর্বমীমাংসা" গ্রন্থে এবং টীকায় কুমারিলভট্টও বলেছেন ঃ "রাজশব্দ ক্ষত্রিয়বাচা"। এর অর্থ রাজা হলেই সে "ক্ষত্রিয়" পদ পায়। বৈদিকযুগের পর থেকেই ইহা সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা। মহাপদ্মনন্দ থেকে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত এই অভিব্যক্তির ধারা চলেছিল। ইবটসন বলেছেন, বর্তমানকালে এ' ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।[১] ভারতের অনেক হিন্দু রাজবংশ অতি নিম্নস্তর থেকে উঠেছে। সেদিনকার মাধোজী সিন্ধিয়া পর্যন্ত অতীত ভারতের অনেক ভাগ্য-বিধাতা জারজ ছিলেন। প্রাচীন ভারত কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এবং হিন্দু বাঙ্গলা কেবল কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির ইতিহাস নয়। ভারতীয় পণ্ডিতেরা যত শীঘ্র এ সত্য উপলব্ধি করবেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। রামচরিতে পালরাজাদের আদি বাসভূমি, (জনকভূ) 'বরেন্দ্রভূমি' বলে নির্দেশ করা হয়েছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে গোপালকে গৌড়ের লোক বলা হয়েছে; এবং জয়সয়ালও তাকে বাঙ্গলার লোক বলেই নির্দেশ করেছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে গোপাল খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।

গুপ্তযুগের পরে এবং পালযুগের উদয়ের পূর্বে বাঙ্গলার যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা' থেকে আমরা একটা সামন্ততন্ত্রীয় রাষ্ট্র ও সমাজের অভিব্যক্তি হ'তে দেখি।

আমরা দেখেছি যে বাঙ্গলা বহু পূর্বেই কৌমগত সভ্যতার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে বাণিজ্য ও শিল্পগত সভ্যতায় পৌঁছে একজাতিত্ব গঠনে প্রয়াসী হয়েছে। বাঙ্গলা এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রধান। বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির স্থাপনার কাজ চলছে। সামাজিক এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একটা সামন্ত-তন্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য বর্তমান। পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিল রাজপ্রদত্ত ব্রহ্মসত্ব ভোগকারী; চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও ছিল। সেকালে আমলাতন্ত্র ছিল, গিল্ড বা ব্যবসায়ী শ্রেণী সংঘ ছিল, কৃষিজীবী কুটুম্বী ছিল, আজকালের লোকের নামের পদবীর ন্যায় পালিত, দত্ত, কুণ্ডু, দাস, ঘোষ, প্রভৃতি পদবীরও ব্যবহার ছিল।

১। A Glossary of the Tribes and Castes of the Panjab, N. W. F. Province.

গ্রামের মাতব্বর (মহত্তরা), সাধারণের প্রতিনিধি কুলাভারনেরা ছিল, তাছাড়া অসবর্ণ বিবাহও ছিল আর ছিল অস্পৃশ্য লোকসকল। পাললিপিতে এ সবের দৃষ্টান্ত মেলে।

এইভাবে গৌরবময় অভ্যুদয়ের জন্য ধীরে ধীরে সমিধ সঞ্চিত হতে লাগলো। পালযুগের গৌরব আকস্মিকভাবে উদিত হয়নি।

ললিতাদিত্য দ্বারা বঙ্গাধিপতি নিহত হবার আগে বাক্‌পানির 'গউড়বহ' বা 'গৌড়-বধ' নামক প্রাকৃত ভাষায় লেখা এক কাব্যে আবার একটি অভিনব সংবাদ পাওয়া যায়। বাকপানি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার সভাপতি ছিলেন। গৌড়ের রাজাকে বাকপানি 'মগহনাহ' বা মগধনাথ বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১]

এখন এস্থলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি ললিতাদিত্য বঙ্গাধিপতিকে কাশ্মীরেই হত্যা করে থাকে তা'হলে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণ দ্বারা কি প্রকার ৭২৮ হইতে ৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গৌড়, মগধ বিজয় ও 'গৌড় বধ' সম্পন্ন হয়েছিল? আর তা হলে বলতে হয় যে এঁরা দুজন পৃথক রাজ্যের রাজা ছিলেন।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যার্ণব বলেছেন[২]ঃ "রাজা যশোবর্মার 'গৌড় বিজয়যাত্রা' পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে অজ-রাজের (রঘু?) দিগ্বিজয় যাত্রা মনে পড়ে। রাজা গজাশ্বরথ বাহিনী সমাকুল হইয়া গমন করিতেছেন। গ্রীষ্মের প্রখর কিরণজালে দাবাদগ্ধ বন-রাজির ন্যায় তাহার তাপ ক্লিষ্ট সেনামণ্ডলী বর্ষার শীতল বারিধারা অঙ্গে মাখিয়া গৌড়রাজ্যে উপনীত হইল। তাহার আগমনে ভীত হইয়া গৌড় সামন্ত ও সেনানীবর্গ পলায়ন করিলেন, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিতান্ত হেয় বলিয়া তাহারা পুনরায় কনোজাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছিল। পালায়নপর গৌড় মগধাধিপ বিজেতা যশোবর্মা কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। অতঃপর কনোজাধিপ সমুদ্রকুলের বনশোভা সন্দর্শন পূর্বক বঙ্গেশ্বরকে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া মলয় পর্বতের (সহ্যাদ্রির দক্ষিণ) সন্নিধানে দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাজিত করেন।" কিন্তু বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষার মাঝে গৌড়েশ্বরের নাম নেই এর কারণ যশোবর্মা স্বয়ং পরে

১। Pandit S. Pandurang : Gauda-Vaho. Intd. P. 26।

২। নগেন্দ্র বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১০১—৩।

ললিতাদিত্য দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। রাজতরঙ্গিণী বলেছে: "এই সময় মতিবান কান্যকুব্জাধিপতি উদ্দীপ্ত ললিতাদিত্যকে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক আপ্যায়িত করেছিলেন, তাতে তিনি নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণের নিকট বিশেষ প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজা যশোবর্মার যারা সহায় ছিলেন তারা এই কার্যে বড়ই অভিমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।... বাকপতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত বিজিতরাজা যশোবর্মা ললিতাদিত্যের গুণ ও স্তুতি করবার জন্যই যেন বন্দিত স্থানে গমন করিলেন" উক্ত পুস্তকে তুলনামূলক পাঠে আমরা দেখতে পাই বাকপাণীর কথা কতখানি সত্য! তিনি রঘুর দিগ্‌বিজয়ের ভাষার নকল করেই গৌড় বধ করলেন, কিন্তু কল্‌হণ উল্টোভাবে কান্যকুব্জ বধ করেছেন। বাক্‌পানির শ্লেষ যদি গৌড়বাসীকে স্পর্শ করে, কল্‌হণের শ্লেষ তদ্রূপ কান্য-কুব্জবাসীর গাত্রদাহ উদ্রেক করে। এ'র দ্বারা আমরা গৌড়বাসীদের শৌর্য ও দৃঢ়চিত্ততারই পরিচয় পাই।

এরপর বাঙ্গলার মধ্যযুগের গৌরব রবি বাঙ্গলার পালবংশের-অভ্যুত্থানের মধ্যাহ্নকাশে উদিত হয়। অষ্টম শতাব্দী থেকে বাঙ্গলায় ছিল শূদ্র-শাসিত গৌরবময় যুগ। তখন দেশে বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলে অনুমিত হয়। এবং তার ফলেই তখনকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে আমাদের স্বভাবতঃই আগ্রহ জন্মে। তখনকার আইন প্রভৃতি জানার জন্যে সেকালের কোন স্মৃতি বা অর্থশাস্ত্র আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। যা' কিছু পাওয়া গেছে তা জনশ্রুতি ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য থেকেই পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ-সভ্যতার সকল স্মৃতি ব্রাহ্মণেরা লুপ্ত করেছেন। পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন: বৌদ্ধ-সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্তিত করে নিজেদের করে নিয়েছেন।[১] আজ কেউই "ধানভানতে মহীপালের গীত" গায় না; আজ আর "ভোগি পাল, যোগী পালের গীত" গায় না।[২] আর ইহা "শুনিতে লোক আনন্দিত হয় না"। সীমান্তদেশে গোপালদের দ্বারা, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকদের দ্বারা আর বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণের[৩] দ্বারা কোন শূদ্র রাজার প্রশংসা গীত আর গাওয়া হয় না। শূদ্র ও পণ্ডিতদের অভ্যুত্থানের সমস্ত চিহ্ন বাঙ্গলার স্মৃতি এবং বর্তমান সাহিত্য

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: অভিভাষণ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৩।
২। চৈতন্য ভাগবত। ৩। গৌড়লেখমালা: ধর্মপালের প্রস্তরলিপি।

ও ইতিহাসের মাঝ থেকে চিরতরে লুপ্ত করা হয়েছে। এই সব বস্তু এখন প্রত্নতত্ত্ববিৎদের ও বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণী-সংগ্রাম এত প্রবলভাবে বাঙ্গলায় তার চিহ্ন রেখে গেছে যে হিন্দু বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা কর্ণাটক থেকে আগত সেন-বংশীয়গণের সময় থেকে গণনা করতাম। তাদের দ্বারা বাঙ্গালীদলন ও বাইরের হিন্দুদের এদেশে স্থাপন এবং তা' থেকে একটা অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি করাকে আমরা হিন্দু বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা গৌরবময় অধ্যায় মনে করতাম। কিন্তু এই বিস্মৃতির গহনতল থেকে যে কিঞ্চিৎ রত্নরাজ্য উদ্ধার হতে আরম্ভ হয়েছে, আমরা তা থেকে প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরবময় অধ্যায় কোনটি এবং তার ভেতরে কিইবা ছিল সে সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ পাচ্ছি।

এই শূদ্রযুগের একটা গল্প নিয়েই বাঙ্গলা ভাষার মহাকাব্য "ধর্মমঙ্গল"[১] লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এই কাব্য 'ধর্মঠাকুর' পূজা প্রতিষ্ঠার জন্যে। এর প্রধান নায়ক লাউসেনের যুদ্ধ ব্যাপার অবলম্বন করেই এটা লেখা হয়। লাউসেন গৌড়ের সম্রাটের শ্যালকের পুত্র এবং মন্ত্রী মহামদের ভাগিনেয়। লাউসেন সম্রাটের আদেশে কামরূপও জয় করেছিলেন; ইছাই ঘোষ নামে এক গোয়ালা জাতীয় সামন্ত নৃপতিকে পরাজিত করেছে —ইত্যাদি এ কাব্যে লেখা আছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর 'ঈশ্বর ঘোষ' বলে এক বৌদ্ধ সামন্তের তাম্রলিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কাব্যে লাউসেনের জাতির উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তার সেনাপতি কালু ডোম, গৌড়ের চণ্ডাল জাতীয় সহর কোটাল, ঢেকুরেল ইছাই ঘোষের চণ্ডাল কোটাল, বাগদি, ডোম প্রভৃতি সৈন্যের কথা আছে; তাছাড়া বর্তমানকালের এই সব তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতির পূর্বপুরুষদের বীরত্ব কাহিনীও তাতে লেখা আছে। বঙ্গীয় মহিলারাও তৎকালে ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের পোড়ামাটিতে জাঙ্গিয়া পরা, ঢাল ও তরবারী হস্তে স্ত্রীলোকের মূর্তি পাওয়া গেছে।

তখন বাঙ্গলায় আজকালকার তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরা হয় জড়োপাসনার (টটেমবাদ) বা বৌদ্ধ ধর্মের একটা না একটা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। আবার অনেক জায়গায় জড়োপাসনাকে বৌদ্ধধর্ম লৌকিক ধর্মরূপে স্বীয় পদ্ধতির ভেতরে গ্রাস করে নিয়েছে। ধর্মপূজা নামে একটা পূজানুষ্ঠান

১। ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল।

এখনও অনেক নিম্নজাতীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তাকে মহাযান সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করেন।

বাঙ্গলাদেশের বহুসংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে ধর্মপূজা হয় বা গাজন চড়ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎপন্ন না হয়ে আদিম জাতীয় ধর্ম যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ান' তা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। বৌদ্ধেরা আদিমজাতিগুলোর ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি 'লৌকিক-ধর্ম' বলে স্বীয় পদ্ধতির মধ্যে জীর্ণীভূত করে নিয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে তাদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও লৌকিক ধর্মের প্রতি উদারতা দেখিয়েছে। এই ধর্মের পুরোহিতেরাও নিম্নশ্রেণীর[১] কিন্তু এই ধর্ম আদিম অধিবাসীদের ধর্মের সঙ্গে মিশ্রণ বলে অনুমিত হয়। ডঃ শহীদুল্লার ন্যায় কেহ কেহ ধর্মপূজাকে নিরাকার একেশ্বরবাদ বলে অভিহিত করেন। ধর্মমঙ্গল পুস্তকের ভূমিকায় তিনি তার উল্লেখ করেছেন।

এই সময় বাঙ্গলার পতিতেরা যেমন 'টটেম্‌বাদ' বা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাতে আশ্রয় অবলম্বন করে থাকত, তেমনি নাথধর্ম নামে আর একটা ধর্মেরও তারা আশ্রয় গ্রহণ করতো। এই সকল ধর্মগুলো পতিত জাতিদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল বলে এগুলি কিছুটা ডেমোক্রেটিক বা সাম্য ভাবাপন্ন ছিল। সেজন্যে আমরা মীননাথ, হাড়িপ্পা, কানফা প্রভৃতি অতি নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও গুরুরূপে দেখতে পাই এবং সেই একই কারণে ডোম পণ্ডিতগণকেও ধর্মঠাকুরের পূজা করতে দেখতে পাওয়া যায়।

এ'স্থলে বক্তব্য এই, আমরা যে যুগে প্রবেশ করেছি সেই যুগে শ্রেণীসংগ্রাম ধর্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছে। এই যুগে বাঙ্গলার পতিতেরা এবং গরীব সাধারণেরা বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বী ছিল বলে তাদের সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সংগ্রাম দশম শতাব্দীতে ধর্ম-সংগ্রামের আকার ধারণ করে। যেটুকু ঐতিহাসিক নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করে তার একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এ ধর্মযুদ্ধের পিছনে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রেণী স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে। এই যুগের ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের ও বৌদ্ধদের কলহের পশ্চাতে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, শূদ্র এবং পতিতদের স্থানচ্যুত করে তাদের অবনমিত করার একটা চেষ্টা আছে। একটা প্রাচীন জনশ্রুতি ঃ

১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৫।

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডাল মৃদঙ্গ ঘাগর বাজে ॥
বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া।
সাড়া গেল বামন পাড়া ॥"

ইহা এই যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বরূপ নির্ধারণ করে দেয়। প্রাচীনকাল থেকে পূর্ব ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক ধর্ম মগধ ও বঙ্গে বিশেষভাবে স্থান পায়নি। এই অংশে জৈন তীর্থঙ্করেরা ও বৌদ্ধ প্রচারকেরা ধর্ম প্রচার করে তাঁদের ধর্মের কেন্দ্রস্থলরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এই স্থানের অবৈদিক কৌমের লোকেরা নিজেদের নরতাত্ত্বিক-ধর্ম (Anthropological Religion)[১] অর্থাৎ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আদিম অবস্থা থেকে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতি বিবর্তিত হয়ে থাকে, তাকে ভিত্তি করে একটা লৌকিক ধর্ম ও আচার উদ্ভাবন করেছিল। তাদের এই নরতাত্ত্বিক অর্থাৎ জাতিগত ধর্মে আদিম অবস্থাসুলভ অর্থাৎ জন্তু, গাছকে পূর্বপুরুষ বলে বিশ্বাস, যাদু ও ডাইনীতে বিশ্বাস, গাছ বা সর্প পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও তদানুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির অভিব্যক্তি ঘটেছিল। বৌদ্ধপুস্তক "কুল্লনিদ্দেশ" যাহা বুদ্ধের সমকালীন বলে কথিত হয়, তাতে সর্প, গরু পূজার রীতির উল্লেখ আছে। এই লৌকিক ধর্মক্ষেত্রে আর্য্য সভ্যতা কতখানি কার্যকরী হয়েছিল তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা দুরূহ। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, যে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আর্য্য জাতির বাস ছিল না...প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণ কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।"[২] তিনি অনুমান করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধ ও বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বে বলা হয়েছে যে আমাদের অনুমান, এর অনেক আগেই তা সংশোধিত হয়েছে।

বাঙ্গলার ভাষা আর্য্যজাতীয় সংস্কৃত ভাষা প্রসূত অর্থাৎ এ' সংস্কৃতের মাগধী প্রাকৃত প্রসূত। এর জন্যে স্বীকার করতেই হবে যে এ' ভাষা আর্য্য-

১। Anthropological Religion কাহাকে বলে উহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে Max Mueller-এর Gifford Lectures দ্রষ্টব্য।

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮-২৪।

ভাষী লোকদের দ্বারা বঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় এসে ঔপনিবেশিকেরা যে উদীচ্য বা পশ্চিমের সামাজিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলে কোন চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। বরং আমরা মৌর্য্যযুগে অব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাত্যক্ষত্রিয় সামবঙ্গীয়দের সংবাদ পাই। মৌর্য্যযুগের পর 'মানবধর্ম শাস্ত্রে' ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদের (১৯, ৪৩-৪৪) উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এরূপ অনুমান করা চলে যে বাঙ্গলাদেশে বৈদিকধর্ম অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সার্বজনীনভাবে স্থান পায়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণই এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। কারণ 'গৌড়-ব্রাহ্মণ' বলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে বরাবর ছিল।

এ' ক্ষেত্রে মহাযান বৌদ্ধ এসে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে একটা আপোষরফা করে দৃঢ়মূল হয়ে উঠে। যখন বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম আসে তখন এ প্রদেশের পতিতেরা এই সাম্যবাদী ধর্ম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিল। মহাযান সম্প্রদায় বাঙ্গলায় বদ্ধমূল হয়ে নানা শাখা ও প্রশাখায় বিস্তারিত হয়। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মাঝে বাঙ্গলার নীচু শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের আত্মার স্ফূর্তি সাধন করতে পারত, নিজেদের জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারত। এ' জন্যেই আমরা একজন বাখরগঞ্জ' নিবাসী মৎস্যজীবী জাতির লোক মীননাথকে নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখতে পাই। আবার হাড়িজাতীয় হাড়িপ্পাকে এই ধর্মের একজন বড় গুরুরূপে ময়নামতীর গানে বর্ণিত হতে দেখি। লামা তারানাথের মতে গোরক্ষনাথের গুরু বিখ্যাত মহাসিদ্ধ জলন্ধরী[১] হাড়ীর রূপে বাঙ্গলায় এসে চট্টগ্রাম সহরে রাস্তার ঝাড়ুওয়ালার কাজ করতেন। মায়ের কথায় রাজা গোপ চাঁদ তাঁর সম্মান করেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে রাজাকে শিষ্য করেন।[২] যা হোক এই হাড়িপ্পাকে যখন রাণী ময়না-মতীর পুত্র গোপীচাঁদকে[৩] গুরুরূপে বরণ করতে বলে, তখন রাজকুমারের হাড়ীকে গুরুপদে বরণ করতে ঘৃণা করায় ময়নামতী বলে—

১। লামা তারানাথের মতে তিনি কামরূপের লোক ছিলেন। তাঁহার Edelsteinmine (মণিক্যের খনি) পৃঃ ১১১। (Translated by the Author—Mystic Tales of Lama Taranatha)।

২। Mystic Tales of Lama Taranatha. p. 69.

৩। গোপীচাঁদ মালবের রাজা ভর্তৃহরির ভাগিনেয়—এ'রূপ তিব্বতীয় পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ, পৃঃ ৬৯।

"হাড়ি নহে হাড়ি নহে জ্ঞান পবিতর
লেখায় ডাঙ্গর হাড়ি ষোলশত নফর ।।"[১]

এই হাড়িপ্পার উপদেশগুলির ভেতর অনেকগুলি মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের নীতিসূত্র।[২] 'ধর্মপূজা' পদ্ধতিতে আমরা ডোম পণ্ডিতদের পৌরোহিত্য করতে দেখতে পাই। বাঙ্গলা বৈদিকক্রিয়াকাণ্ড বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম ধর্মকে গ্রহণ করে নি বলেই আমরা বাঙ্গলায় শূদ্র, ব্রাত্য এবং আজকাল যাদের পতিত বলা হয় তাদের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন দেখতে পাই। এই যুগে বাঙ্গলার লোকসমূহের কার্যের সকল দিকেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই সময় শূদ্রেরা সম্রাট ও সামন্তরাজার পদাভিষিক্ত হয়েছে। আজকালকার অন্ত্যজদের পূর্বপুরুষেরা তখন সামন্ত রাজা,[৩] সেনাপতি, সহব কোটাল, প্রভৃতি হয়েছে। বাঙ্গলার নাবিকেরা দেশ বিদেশে জাহাজে চড়ে গিয়েছে, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠীরা তখন সমুদ্র বয়ে বানিজ্য ক'রে "শুক্তার বদলে মুক্তা, জীরার বদলে হীরা" নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সকল লোকই কি সমাজে পতিত ছিল? কিন্তু তাদের বংশধরেরা আজ হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে নয় তো হিন্দু সমাজে পতিত হয়ে রয়েছে। এর প্রকৃত কারণ কি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন। ইংরেজ গভর্ণমেন্টের আদমসুমারীর তালিকায় দেখা যায় যে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের প্রায় অর্ধেক লোক উচ্চ জাতিগুলির কাছে পতিত রয়ে গিয়েছে। তাদের জল পর্যন্ত অস্পৃশ্য। সমাজের এই যে অর্ধাঙ্গ কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে এর কারণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এটা কি গোঁড়া লোকদের খেয়াল মাফিক হয়েছে? যারা বিশ্বাস করেন যে মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের শ্লোক উদ্ধৃত করে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা বর্ণাশ্রমধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজের অর্ধেক লোকদের পঙ্গু করে রেখেছে, তারা ইতিহাসের যথার্থ অর্থ বোঝেন নি। আমরা ইতিহাসের তুলনামূলক পাঠের ফলে এই তথ্যই পাই যে রাজশক্তি ব্যতীত কোন শ্রেণী উত্থিত বা পতিত হ'তে পারে না। একটা পুরোহিত শ্রেণীর হাতে এমন শক্তি নেই যে সমাজের অর্ধেক লোক

১। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী : মীনচেতন। পৃঃ ১০।

২। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৬১।

৩। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, প্রাচীনকালে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় একটি চণ্ডাল বংশীয় রাজগোষ্ঠী ছিল। এই বিষয়ে 'ঢাকার ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। হাড়ি রাজার কথাও বাঙ্গলার জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু : উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড —১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪।

তাদের হুকুম বা ফতোয়া অনুযায়ী নীচের স্তরে নেবে যাবে। আবার অব্রাহ্মণ্যবাদী দেশে ব্রাহ্মণদের ফতোয়া মানবেই বা কে? এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে একটা ভীষণ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস লুকানো রয়েছে—এ আমরা তৎকালের ইতিহাস পাঠ করলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। এই সামাজিক দ্বন্দ্ব কালে রাজনীতিক দ্বন্দ্বে পরিসমাপ্ত হয়।

প্রাচীন সাহিত্যে এই যুগের অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে ইহা উল্লিখিত হ'তে দেখা যায় যে রাজারা সোনার পালঙ্কে বসিয়া রূপার খাটে পা রাখিত (মানিক চাঁদের গান)। সোনার থালায় পঞ্চাশ প্রকারের ব্যঞ্জন দ্বারা অন্নাহার (৪৬৭ শ্লোক) করতো। তখন 'ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক), 'দণ্ডপাখা' (২৫৪ শ্লোক) ও পাটের সাড়ী (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের সামগ্রী ছিল। লোকে 'ইন্দ্রপিঠা' (২২৫ শ্লোক) খেত। 'বংশহরির' গুয়া (২৫৭ শ্লোক) দিয়ে মুখশুদ্ধি করতো। আর 'একতন যে কতন করি খাইচত দুয়ারত ঘোড়া' (মাণিকচাঁদের গান); অর্থাৎ যেমন তেমন করে খায় অথচ তার দ্বারেও ঘোড়া বাঁধা থাকে। ঘোড়া বাঁধার কথাটা কবির অতিশয়োক্তি বোধহয়, কারণ বাঙ্গলা দেশে কখনও ঘোড়া উৎপাদন (Stock Breeding) হতো না, কাজেই ঘোড়ার প্রাচুর্য থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে "ধনী লোকেরা 'বাঙ্গলা' ঘরে বাস করিত ও শিতলপাটি বিছাইত।"

উপরোক্ত বচনগুলি থেকে ধনীদের ভোগবিলাসের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু গরীব জনসাধারণের অবস্থা তখন কি প্রকারের ছিল? গরীবদের সংবাদ কে রাখে? খনা ও ডাকের বচনে দেখা যায় যে কৃষকেরা রোদ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পুড়ে পুড়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে কৃষিবিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করেছিল; এর দ্বারা কৃষকগণ আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য থেকে কঠোর শ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন করতো। অত্যাচার, শোষণ ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা কি করতো—সে সম্পর্কে ইতিহাসে কোন খবর পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম, কর্ম ও পুনর্জন্ম মতবাদ দ্বারা তার ভক্তদের ঠাণ্ডা করে রাখত। তারপর "টিকটিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে আপন কুটীতে থাকিয়া জড়সড় হইয়া থাকিত। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্তা শুনিয়া কার্যের ফলাফল নিরূপণ করিত"।[১]

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৮৫

ক্লিষ্ট বাঙ্গালী পক্ষীচরিত্র ও ভবিষ্যৎ কথন বিশ্বাস ক'রে দৈবের উপর নিজের জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতো।

ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে বৌদ্ধ মত ধর্মে সাম্য আনলেও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ও সমাজে সাম্য আনতে পারেনি। এ'জন্যে বৌদ্ধদের মাঝেও সামাজিক বৈষম্য ছিল। পাল রাজাদের রাজত্বকালে সামন্ততন্ত্র বাঙ্গলায় ছিল! "বারভূঁইয়া বসে আছে বুকে দিয়ে ঢাল"[১] এই উক্তি দ্বারা ধর্মমঙ্গলে বারভূঁইয়ার উল্লেখ আছে; পুনঃ পাল রাজবংশের অধীনে সামন্তগণের উল্লেখ ইতিহাসে আছে।[২] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' পুস্তকে রাজা রামপালের "সামন্ত চক্র" সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যখন রামপাল কৈবর্তবিদ্রোহ দমনের জন্যে বরেন্দ্রভূমিতে অভিযান করেন, সে সময় তার সামন্তদের তালিকাও দেওয়া হয়েছে।[৩]

পালবংশের তৃতীয় বিগ্রহপালের জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর ঠিক পরে কৈবর্তগণ উত্তর বঙ্গে বিদ্রোহী হয় এবং স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কথিত আছে যে, জেলে কৈবর্তগণ মৎস্যজীবী ছিল বলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারত না, কারণ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে জীবহত্যাকারীদের ধর্মে স্থান প্রদান নিষিদ্ধ আছে। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্যকাণ্ডে লেখা আছে যে এই সময় আদি কর্মবিধি' (ততাকর গুপ্ত রচিত) নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এই প্রকার ব্যবস্থা হয় (১৯৩ পৃঃ)। এই আইন তদানীন্তন পালরাজা কৈবর্তদের উপর প্রয়োগ করে, ফলে উত্তর বঙ্গের কৈবর্তরা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে। এই কারণটি পর্যাপ্ত হেতু বলে মনে হয় না, এর যথার্থ কারণ নিশ্চয়ই আরও ছিল যার ইতিহাসে উল্লেখ নাই। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, "কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক সম্ভবতঃ প্রথমে পালরাজাগণের ভৃত্য ছিলেন।"[৪] আজকালকার কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে এ' "কৈবর্তবিদ্রোহ" নয়—প্রজাসাধারণেরই বিদ্রোহ! কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে যে কেন বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বনে ইচ্ছুক প্রজাগণ

১। মাণিক গাঙ্গুলি: "ধর্মমঙ্গল" কাব্য। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে "গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বারভূঁঞা"।

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৪-২৫৫।

৩। সন্ধ্যাকর নন্দীর: রামচরিত, ১।৪৪, ২।৪৩।

৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩।

বৌদ্ধ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো? কৈবর্ত বিদ্রোহকালে অথবা তার পূর্বে পীঠীপতি অর্থাৎ গয়ার জনৈক সামন্ত রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন[১]। এই কারণের জন্যে অনুমান করা যায় যে, রাজশক্তি এমন কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করছিল যার বিরুদ্ধে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বরেন্দ্র তথাকথিত কৈবর্তবিদ্রোহের অধিনায়ক দিব্বোক। "দিব্বোকের পরে বোধহয় তার ভ্রাতা রুদোক গৌড় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তর বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন"।[২] "অবশেষে রাষ্ট্রকূট সামন্ত মথনদেবের সহায়তায় রামপাল ভীমকে পরাজিত করে। পরাজিত কৈবর্তসেনা হরি নামক জনৈক নায়ক কর্তৃক একত্রিত হয়েছিল"।[৩] কিন্তু হরিও পরাজিত হয়। অথচ রামচরিতে উল্লিখিত আছে, রামপাল হরিকে স্থানীয় সহকারী রাজা বলে বরণ করে স্বদলে এনেছিলেন। "রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করেছিলেন[৪] শ্রেণীবিদ্বেষ আর কত নৃশংস হবে। এরপর এই ধর্মভীরু বুদ্ধদেবের রাজশিষ্য রামাবতী নামক একটি নূতন নগর নির্মাণ করে তার ভেতর জগদ্দল মহাবিহার স্থাপন করেছিলেন"।[৫]

বাঙ্গলার পীড়িতগণের স্বাধীনতার সশস্ত্র উত্থান এবং দুই পুরুষ ধরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পালবংশের স্তুতিগায়ক সন্ধ্যাকর নন্দী রাজার বিরুদ্ধে কৈবর্ত প্রজাগণের বিদ্রোহ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আজ-কালকার ঐতিহাসিকেরা এর চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হন না। জেলে বা চাষীর দল রাজাকে বিতাড়িত করে গৌড় এবং বরেন্দ্রভূমি অধিকার করে বহুদিন অবধি রাজত্ব করলো; তারপর দেশের সমস্ত অভিজাতশ্রেণী মগধস্থিত রাষ্ট্রকূটের সহায়তায় পতিগণের এই রাষ্ট্র ভেঙ্গে তার রাজধানী পর্যন্ত ধ্বংস করার ব্যাপার সাধারণ "কৈবর্তবিদ্রোহ" নয়। এর পেছনে ইতিহাসের কি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ছিল, তা আজ আর জানবার উপায় নেই। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে এই পতিত বিদ্রোহীগণ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভিজাতদের কাছে কোন প্রকার সাহায্য পায়নি। অভিজাতশ্রেণী শ্রেণী-

১। বাঙ্গালার ইতিহাস; পৃঃ ২৫৮।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস; পৃঃ ২৫৩।

৩। Memories of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 14.

৪। সন্ধ্যাকর নন্দী: রামচরিত, ১।২৭।

৫। Memories of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 14.

স্বার্থে পরিচালিত হ'য়ে অত্যাচারী রাজাকেই সাহায্য করেছিল। তারা কি এই প্রজাবিদ্রোহকে এজন্যে ভয় করেছিল যে এই বিদ্রোহ পাছে সমগ্র বঙ্গ ও মগধব্যাপী হয়? তথাকথিত এই বিদ্রোহ বাঙ্গলার শ্রেণী-সংগ্রামের একটি প্রকৃষ্ট নজীর। আধুনিক মত এই যে বরেন্দ্রের "অনন্তসামন্তচক্র" দিব্বোকের অধিনায়কত্বে বিদ্রোহ করেছিল। রাঢ়ভূমি এতে যোগদান করেনি। বরেন্দ্রে ইহা জনসাধারণেরই বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। আজকাল জনসাধারণ (Peoples) বলতে যা বোঝায় তৎকালে বাঙ্গলায় এরূপ ছিল না। একজন মাতব্বর বা সর্দার, গ্রামকর্তা বা স্থানীয় সামন্তের অধীনে তাঁবেদার লোক থাকিত। এই মাতব্বরেরাই সকল কাজে অগ্রসর হ'ত। তারাই বরেন্দ্রের "অনন্তসামন্তচক্রের" লোক ছিল। (দিব্বোকের বিদ্রোহ সম্পর্কে দিব্বোক স্মৃতি উৎসবে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অভিভাষণ)।

এরপর বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় প্রতিক্রিয়া আসে। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে পাল শাসনে ভাঙ্গন ধরে। বাঙ্গলায় বর্মবংশ ও চন্দ্রবংশের অধীনে আরও দু'টি রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। বর্মবংশ সুদূর পঞ্জাব বা কলিঙ্গ থেকে এসে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয়দের অধিকার ছিল। বোধহয় এরা পালবংশের অধীনে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা ছিল। পরে পাল রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চন্দ্রবংশ পূর্বোক্ত রাজা মানিকচাঁদ ও তৎপুত্র গোপাচাঁদের বংশের সঙ্গে বংশ এক কিনা তা' সন্দেহের বিষয়। এঁরা খাঁটি বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বর্মবংশ যে খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-বাদী-বংশ তা' নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত।[১] এই বর্মবংশীয়েরা চন্দ্রবংশকে অপসারিত করে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই ব্রাহ্মণ্যবাদী বংশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আর একটি বংশ রাজত্ব করছিল, ইহা শূর বংশ। রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গলা আক্রমণকালে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি "রণশূর" নামীয় জনৈক নরপতির নাম পাওয়া যায়। এই শূর বংশের দৌহিত্র ছিলেন স্বয়ং বল্লাল সেন।[২] এই শূরবংশের সঙ্গে জনশ্রুতির আদিশূরের বংশের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ ঐতিহাসিকগণ এখনও পান নাই এবং আদিশূরেরও অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল কুলশাস্ত্রেই এর উল্লেখ আছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন: "কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড. পৃঃ ১০২।

২। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপি, ৬-৭ শ্লোক।

না, আদিশূর নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটনাটি ঘটিয়াছিল—এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমনের প্রবাদ আরও কতক প্রদেশেও আছে। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিবরণেও সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। লেখক পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমনের জনশ্রুতি আসামেও পেয়েছেন।

আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও বিচার করার সময় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন ঃ "মহারাজ যশোবর্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলে যে সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদিকধর্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন আদিশূরের পিতা মাধবকে আমরা তাহাদের অন্যতম মনে করি*। এই উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে বসুমহাশয় দায়ী। ইহা যদি ঐতিহাসিক সত্য হয় তা'হলে বুঝতে হবে পশ্চিমে ব্রাহ্মণ্যবাদ সুদৃঢ় হওয়ায় সেখানকার রাজারা পূর্বদিকে সেই ধর্ম প্রচার করার জন্যে লোক পাঠাতে আরম্ভ করেছিলেন! এই অনুষ্ঠানটির রাজনীতির অর্থ অতি প্রাঞ্জল। কারণ বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘাতে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শিথিল হ'য়ে বৌদ্ধ রাষ্ট্রকে ভাঙ্গার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে।

এখন দেখা যাক কি ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা বৌদ্ধরাষ্ট্র ধ্বংস হতে পারে। ইতিপূর্বে বর্ম রাজবংশের কথা বলা হয়েছে। এরা পূর্ব বাঙ্গলায় রাজত্ব করতো। পশ্চিমে রণশূরের রাজত্বের কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শূরদের সম্পর্কে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পুস্তকে লিখেছেন ঃ "ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে শূরবংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্তী 'দরদ' নামক দেশ হইতে গৌড় দেশে আগমন করেন ঃ

আগমাৎ ভারতবর্ষং দরদাৎ সরুদ্বিপ্রভঃ।
জিত্বাচ বৌদ্ধ রাজানাং তথা গৌড়াধিপং বলান্ ॥"

আদিশূর এই বংশের সর্বপ্রধান নরপতি। আদিশূর ঐতিহাসিক শূরবংশীয় কিনা তার বিচার আগেই করা হয়েছে। যে পূর্বোক্ত দরদস্থানের অধিবাসীদিগকে মনু "ব্রাত্য" নামে অভিহিত করেছেন, বৈয়াকরণিকেরা 'পৈশাচি' প্রাকৃত ভাষী বলেছেন এবং হিন্দুরা সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ বলেছে এবং এখনও বলে থাকেন, সেই জাতীয় লোকেরা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় উচ্চবর্ণের হিন্দু হলো। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠেও এই

ধারণা হয় যে দরদরা হিন্দু বলে সেখানেও গৃহীত হয়নি। এই দরদরা যে ভারতবর্ষীয় বলে গণ্য হতো না (এবং আজও হয় না) ধ্রুবানন্দের কথার ভঙ্গীতেই তা' প্রকাশ পায়। অথচ এই বংশই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে নানাবিধ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ সংগঠিত হতে লাগল। তাদের তাঁবেদার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির লোকেরা 'ভূমি' পেয়ে এই সমাজের অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করতে লাগল। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা আদিশূর কর্তৃক বাঙ্গলায় আনীত হয়েছিল—এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। নানা কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় লোক পশ্চিম ভারত বা দাক্ষিণাত্য থেকে এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। বাঙ্গলার পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বলেন, বর্মবংশীয় ভোজবর্মার রাজত্বকালে তারা 'শকুনসত্র' নামক যজ্ঞ করার জন্য বাঙ্গলাদেশে আনীত হয়। এই সকল বহির্দেশাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী লোকেরা হিন্দু রাজাদের নিয়ে বৌদ্ধদেশে চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তদনুযায়ী সমাজ সংস্থাপন করার চেষ্টা করছিল। এই 'লোটাকম্বল' সম্বল ঔপনিবেশিকেরা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলার রাজশক্তি কেড়ে নিয়ে বৌদ্ধদলনে প্রবৃত্ত হয়। এ'জন্যই আজও হিন্দু বাঙ্গলায় ধর্ম, সমাজ ও চর্চা পশ্চিম ভারতের দিকে মুখ চেয়ে আছে। এ'জন্যই আজ তথাকথিত উচ্চজাতীয় হিন্দুদের নিকট কান্যকুব্জ এত মাহাত্ম্যের স্থান এবং কাশীর নিকট তারা মাথা নত করে থাকে। একটি প্রচলিত কথা আছে—ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে। মুসলমান বিজয়ের পর বাঙ্গলার ইতিহাসে ঠিক সেরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। যে কারণে হিন্দু বাঙ্গলা কান্যকুব্জ এবং কাশীর দিকে মুখ চেয়ে আছে—সেই কারণেই মুসলমান বাঙ্গলা তার আরও পশ্চিম—আরব ও পারস্যের দিকে চেয়ে আছে।

বাঙ্গলার এই যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রেণী-সংঘর্ষ বিশেষভাবে দানা বেঁধে উঠে। যেহেতু বাঙ্গলার নীচুশ্রেণীর লোকেরা বৌদ্ধ বা অন্যপ্রকার অ-ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মাবলম্বী ছিল, সেজন্যে এই সংগ্রাম ঐতিহাসিকদের নিকট ধর্ম কলহ বা সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম বলে পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু আসলে ইহা শ্রেণীসংগ্রাম যা' মধ্যযুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ধর্ম কলহের রূপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম বৌদ্ধ ছিল, অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিল। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানুসারে একে ধর্ম সংগ্রাম বলা চলে না। কারণ বৌদ্ধ রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দির তৈরীর জন্যে এবং ব্রাহ্মণদের ভোগের জন্যে বিস্তর ভূমি দান করেছেন। পাল রাজাদের

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিল। বরং ইহা সত্য যে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বৈদেশিক ঔপনিবেশিকদের সন্ততিগণ ভূমি পেয়ে একটি অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই শ্রেণী নিজদিগকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রজাদিগের শক্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, অথবা তার পরিবর্তে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে স্ববশে আনার চেষ্টা মধ্যযুগীয় সভ্যতাতে পৃথিবীর সর্বত্রই এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে। বাঙ্গলার মুসলমানযুগে এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র।

যখন সুদূর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক দেশ থেকে সেন বংশীয়েরা এসে বাঙ্গালী পালবংশকে তাড়িয়ে একচ্ছত্র রাজা হলেন, তখন বৌদ্ধদলন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণতা লাভ করলো। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন: সেনবংশীয় রাজাগণের পূর্বপুরুষ কোন সময়ে বাঙ্গলাদেশে এসেছিলেন তা' আজও নির্ণীত হয়নি।...সমস্ত খোদিত লিপিতেই দেখতে পাওয়া যায় যে তারা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাটক দেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু মাধাই নগরে প্রাপ্ত ফলকে লক্ষ্মণসেন নিজেকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছেন। বিজয় সেনই সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বংশ সমস্ত বাঙ্গলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়সেনের পুত্রই বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন পৌত্র। বাঙ্গলার হিন্দুরা সেনবংশের রাজত্বকাল হইতেই নিজেদের ইতিহাসের আরম্ভ বলিয়া মনে করেন।" বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের "কৌলিন্য প্রথা" ও সংগঠন এই সময়েই হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

সেন রাজাদের উৎপত্তি নিয়ে বাঙ্গলায় এক সময়ে নানা তর্ক উঠেছিল। আকবরনামায় তাদের কায়স্থ বলা হয়েছে এবং লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র লছমনিয়ার নামও দেওয়া হয়েছে। এক সময়ে তাকে কায়স্থেরা স্বজাতীয় ও বৈদ্যেরা তাদের স্বজাতীয় বলে দাবী করতেন। আনন্দভট্টের বল্লাল চরিতে পালবংশ 'নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়' (ক্ষত্রিয়াধম) এবং সেন রাজারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। (বল্লাল রচিত ১২শ ও ১৮শ অধ্যায়)। বহুপূর্বে স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এক প্রস্তর লিপি থেকে পাঠোদ্ধার করে তাদেরকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' জাতি বলে স্থির করেন (Indo-Aryans দ্রষ্টব্য)। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, তারা কর্ণাটক থেকে আগত ব্রহ্মক্ষত্রিয়ই বটে। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বিজয় সেনকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলশিরোদাম্ বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্ব আবিষ্কৃত মাধাই নগরে প্রাপ্ত অনুশাসনে সামন্ত সেনকে -র্ণাটক ক্ষত্রিয়ানাম কুলশিরোদাম্' বলা হয়েছে। রাখালবাবু প্রাচীন অনুশাসন এখন্ধারপ্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। হিন্দু

কিন্তু ইদানীং আবিষ্কৃত খোদিত লিপিগুলিতে তাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তর্পণা দিঘিতে আবিষ্কৃত লক্ষণ সেনের খোদিত লিপিতে "লক্ষণ সেন মহৎ ব্রহ্মক্ষত্রিয়", বলে বলা হয়েছে। আবার এই লিপিতেই উৎকীর্ণ আছে যে লক্ষণ সেনের মাতা রামা দেবী চালুক্য রাজকুমারী ছিলেন।

পাল রাজগণ রাষ্ট্রকূটদের এবং চেদীর হৈহয়দের সঙ্গে বিবাহাদি করতো। সেনবংশীয়েরা চালুক্যদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধাদি চালাত বলে শ্রীযুত বৈদ্যে তাদের রাজপুত জাতীয় বলেন। তিনি বাঙ্গলাকে 'রাজপুত রাজচক্রের অন্তর্গত' বলেছেন।[১] এবং তিনি সেনদের মহারাষ্ট্রীয় বলে দাবী করেন। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মনে করেন যে সেনদের কর্ণাটক পিতৃভূমি পরিচয় দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, তারা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ধারওয়ার জেলার লোক ছিল।[২] এক সময় মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটকের অন্তর্গত ছিল। কানাড়া প্রদেশটি সেই নামই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বৈদ্যে মহাশয় প্রাচীনকালে রাজাদের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে জাতির বিচার হ'ত মনে করে এবং তদ্দ্বারা পাল ও সেন রাজাদের জাতি নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে হিন্দু রাজাদের কোন জাতি নেই। পাল বংশের পূর্ব যুগেও আমরা দেখতে পাই যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা পুলোমায়ীর (সতকর্ণী) সঙ্গে গুজরাটের শক ক্ষত্রপের কন্যার বিবাহ হয়েছিল। আরও দেখা যায় যে গুপ্তদের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণের কদম্ব রাজ-বংশের কন্যাদের বিবাহ হত। ভাণ্ডারকার মহাশয় প্রস্তর লিপি হ'তে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন যে রাজপুত রাজারাও হুণদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতো। কাজেই দেখা যায় যে বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা বর্তমান যুগের ন্যায় জাতি নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

সেন বংশের সম্বন্ধে বাঙ্গলার জনশ্রুতিতে দেখা যায় যে 'বল্লাল-চরিতে' তাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি বলা হয়েছে। আবার 'সম্বন্ধ-নির্ণয়ে' বলা হয়েছে "আদিশূর ও বল্লাল সেনকে যিনি যে প্রমাণে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলুন না কেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়তা নাই। বল্লাল নিজকৃত 'দান-সাগরে' আপনাকে (নিজেকে) ক্ষত্রিয় বলাইতে সাহসী হয়েন নাই, 'ক্ষত্র চরিত্র চর্য্যা' এইরূপ পাঠ প্রকটিত করিয়াছেন। 'চর্য্যা' শব্দের অর্থ আচরণ, সুতরাং 'ক্ষত্র চরিত্র চর্য্যা' শব্দে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী।...বল্লাল নিজকৃত দান সাগরে আপনাকে ক্ষত্র চরিত্র চর্য্যা মর্য্যাদা রক্ষণ করিয়াছেন।"

১। হিষ্ট্রি অব মেডিয়েভল হিন্দু ইণ্ডিয়া।

২। প্রসিডিংস অব দি সেকেণ্ড ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স : ১৯২৩।

আমরা এখন এই অনুমান করতে পারি যে সেনরাজারা ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের আচরণ করতো। মৎস্য পুরাণে ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতীয় অনেক লোকের নামোল্লেখ আছে। ভবভূতির 'মহাবীর চরিতে' বিশ্বামিত্রকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়েছে। ভাণ্ডারকর মহাশয় প্রাচীন ভারতে পাঁচটি 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' রাজবংশের নাম আবিষ্কার করেছেন। এই প্রকারে জয়সয়াল কথিত ভাকাটাকা বংশ, দক্ষিণের পল্লববংশ ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করে। বল্লাল চরিতের একাদশ অধ্যায়ে কদম্ব ও পল্লবদের ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন—অতএব 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়েছে। গুজরাট এবং পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' নামে একটি জাতিও আছে। গুজরাটে তারা ব্রাহ্মণের কাজ করে। সেনবংশ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিল বলেই তারা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণদের এতটা প্রাধান্য দিয়েছিল। বাঙ্গলায় তাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিল—এইরূপ ব্যাখ্যা উপরোক্ত বিবরণ থেকে গ্রহণ করা অযৌক্তিক হবে না।

বল্লাল সেনের সভাসদ অনন্ত ভট্ট রাজার অনুরোধে 'বল্লাল চরিত' লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শেষ করতে পারেন নি। বহুপরে তার এক বংশধর আনন্দ ভট্ট নবদ্বীপের জমিদার এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পৃষ্টপোষক বুদ্ধিমন্ত খানের সময় বল্লালের সমসাময়িক অনন্ত ভট্ট ও সারণ দত্তের লিখিত সেই সময়ের হিন্দুসমাজের অবস্থার বিবরণ গ্রহণ করে এই পুস্তক সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে বল্লালসেনের সময়ের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদ অনুবাদকের ভাষায় প্রদত্ত হলো। "সন্ন্যাসী ও তাদের অনুগামীরাই যেমন বৌদ্ধ সমাজের সেবাদণ্ড স্বরূপ। তেমনি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থেরাই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল! কিন্তু লোকসংখ্যা ছিল অগণিত, তাদের ভেতরে বিশ্বাসটা তেমন চার প্রকারের ছিল না। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের বাইরে যেতে পারতো না। সে (বল্লাল) বেনিয়াদের অধমন্য করেছিল আর কৈবর্ত্তদের তুলেছিল উপরে। শূদ্রের চেয়ে নীচু জাতদের বলতো অন্ত্যজ। অন্য সবজাতের মধ্যে বল্লাল যাদের তুলেছিলেন তাদের ভেতর মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকার নাম সারণ উল্লেখ করেছেন। তাদের অন্ত্যজ বলে ধরা হতো না, সুতরাং তাদের 'গ্রহণ' মানেই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠা দেওয়া। বল্লালের সমসাময়িক সারণের কাছ থেকে এইরূপ সংবাদই পাওয়া যায়। অবশ্য আনন্দ ভট্ট নিজের ব্যক্তিত্বে পুস্তকের শেষে একটা 'সংযুক্ত তালিকা' দিয়েছেন।"

এ দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ব্যতীত একটা বিশাল জনসঙ্ঘের সংবাদ ইঙ্গিত

করা হয়েছে—যাদের ধর্মের বালাই বড় একটা ছিল না ঃ এরা কি নিজেদের প্রাচীন কৌমগত ধর্ম (ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ন) অনুসরণ করতো ? তারপর চতুর্বর্ণের বাইরে 'অন্ত্যজ' বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কারবার শূদ্র পর্যন্ত গণ্ডীভূত ছিল, আর বৌদ্ধ পুরোহিতেরা সব জাতির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতো। তথাপি একটা বিশাল জনসংঘীরা ছিল যারা উপরোক্ত দু'ধর্মের ধার ধারতো না। এজন্যই কি বাঙ্গলা এত শীঘ্র ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পেরেছিল এবং এই প্রদেশে মুসলমান আধিক্যের কারণও কি এই ইঙ্গিতে নিহিত নেই ?

শেষোক্ত আনন্দ ভট্টের তালিকাটি বল্লালের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে দেওয়া হয়। তখন কি এই জাতিগুলির মর্যাদা পূর্বের ন্যায়ই ছিল ? সমাজ এক জায়গায় চিরকাল সনাতন অবস্থায় থাকে না।

বল্লাল সম্বন্ধে আনন্দ ভট্টের শেষোক্ত মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ "তিনি নিঃসন্দেহে একজন জারজ, অনিষ্টকারী, দুষ্টপ্রকৃতির রাজা ছিলেন।" এদেশে বল্লালের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটা কুৎসিত কথা প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রের ঔরসে জন্মেন। একটি কবিতায় বলা হয়েছে ঃ

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা
বিষক্সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা।"

(সম্বন্ধ নির্ণয় ; ২০৮ পৃঃ)

আবার কেহ বলেন তিনি বনে জন্মেছিলেন বলে—'বন-লালা' থেকে বল্লাল নামটির উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এই নামটি দাক্ষিণাত্যেও পাওয়া যায়। সেনবংশীয়েরা দক্ষিণ দেশীয় লোক বলে এই নামটিও সেখানকার হতে পারে। আনন্দভট্ট আরও বলেন ঃ সুবর্ণবণিকেরা নিজেদের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করতো, উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের বলতো দাসীপুত্র... আর ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাত রাজার প্রতিও নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ করত। এই বিবরণ সুবর্ণবণিকদের ভেতর বৌদ্ধ প্রভাবই অনুমিত হতে পারে।

সেনবংশের সময়ে যে বাঙ্গলার সমাজ একটা নূতন সমীকরণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হচ্ছিল তার প্রমাণও আনন্দভট্টে প্রদত্ত হয়েছে ঃ

"At that time Ballala observing the dis-organisation among the races of Brahmanas and Kshattriyas, held a consultation with those versed in the Vedas. In determining the Brahmanhood and Kshattriyahood of his people, he took

into consideration, importance of their origin and compelled them to pass through purifying ceremonies. (P.59)[১]

ইহা দ্বারা বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় বলে একটা জাতির সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই পুস্তকে রাণক (রাণক একটি পদবী) ও রাজপুত্র নামক উচ্চ বংশসমূহের সংবাদও পাওয়া যায়।' এই বল্লালের তিন শত বৎসরেরও অধিক পরে বৈষ্ণবগ্রন্থ জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' পূর্ব বাঙ্গলায় 'ব্রহ্মক্ষত্রী' জাতির উল্লেখ আছে। পুনঃ, 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে 'রাজপুত্র' বলে এক জাতির উল্লেখ দেখা যায়। এই সব জাতিগুলি এখন গেল কোথায়?

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বল্লাল সেন 'বংশতালিকা' দেখে 'শুদ্ধি' করে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করত। ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী যে বাঙ্গলায় পূর্বে ছিল তাহা এই সকল জাতিগত নাম থেকেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। অথচ আনন্দ ভট্টের 'বল্লাল চরিত' লিখিবার যুগেই রঘুনন্দন পুরাতন কোন সংস্কৃত পুস্তক থেকে একটা কল্পিত শ্লোকের জোরে ধর্মমত জাহির করলেন যে, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোন বর্ণ নাই।

এস্থলে অনুসন্ধানের আরও এক বিষয় হ'ল যে উপরোক্ত শ্রেণীর লোক-গুলির পেশা বংশগত ছিল কিনা? দেওপাড়া শিলালিপিতে লেখা আছে—"ইহা বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছিল।" রাণক শব্দটি কি পদবাচক? বল্লাল চরিতে উল্লেখ আছে যে বল্লালের পিতৃ-শ্রাদ্ধে রাণক ও রাজপুত্রেরা সর্বাগ্রে আহারে বসেছিল, তারপরে সৎশূদ্রদের আহারের স্থান হয়। ইহাতে রাণকদের অভিজাত শ্রেণীয় বলে অনুমান হয়। অথচ এই শিলালিপিতে এক রাণককে শিল্পী বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। তা'হলে কি এই সুচিত হয় না যে বাঙ্গলায় তখনও লোকের পরিচয়জ্ঞাপক জাতি প্রতিষ্ঠানটি (Institution) বংশ পরম্পরাগত না হয়ে কেবল পদসূচক ছিল, অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত আজকালকার ন্যায় জাতিরূপ প্রতিষ্ঠানটি 'কাষ্ট' (caste) না হয়ে ক্লাস বা শ্রেণী ছিল। এই জন্যই ব্রাহ্মণবংশীয় সেনরাজাগণ ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী হয়ে 'ক্ষত্রচরিত্রচর্যা' হয়েছিলেন। তাছাড়াও ঠাকুর নামে একটি উপাধির সংবাদ বল্লাল চরিতে পাওয়া যায়। এই উপাধি উচ্চবংশীয়-দের প্রদত্ত হতো। কিন্তু বল্লাল তার নাপিতকে এই উপাধিতে ভূষিত করায় অভিজাতদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

১। Proceedings of the A. S. B. No. X. vol. 1901 No. Jan. 1902. pp. 47-48 by H. P. Sastri.

যা হউক এবার পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক্। বাঙ্গলার দক্ষিণে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব রাজবংশ ও তার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতবর্গের ধ্বংস সাধন এই সময় থেকে ভালভাবেই আরম্ভ হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুযায়ী বর্ণাশ্রম পদ্ধতি পুনরায় সংগঠিত হওয়ায় পূর্বের অনেক জাতি উচ্চ শ্রেণীর স্তর থেকে নীচু শ্রেণীতে অবনমিত হয়। পূর্বে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জনশ্রুতি অনুসারে সুবর্ণবণিক ও ধোপা, চাষা জাতিগুলি বল্লালসেন দ্বারা তাদের পূর্ব সামাজিক পদ থেকে অবনমিত হয়ে যায়, কৈবর্ত্ত-দের একাংশ 'জলচল' হয়, ডোম, বাগদী, হাড়ি প্রভৃতি বৌদ্ধজাতিগুলি যারা বৌদ্ধ যুগে উঁচু স্তরাভিষিক্ত ছিল তারা সমাজের অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত স্তরে অবনমিত হয়ে 'পতিত' হয়। এবং নবসায়ক নামে কতকগুলি জাতি অপরদিকে উন্নীত হয়ে যায়। গয়লাদের একদল হল 'জলচল' অপর একদল নীচু শ্রেণীরই রয়ে গেল কিন্তু আসলে এই জাতিগুলো 'শ্রেণী' (guide) ছিল। বল্লাল চরিত ব্যতীত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ও 'বৃহৎধর্মপুরাণে'ও নানা জাতির কথা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে 'জোলা' ও বাঙ্গলার নানা জাতির জাতের উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয় এই পুরাণটি মুসলমান আক্রমণের পরে রচিত। 'বৃহৎ-ধর্মপুরাণে' বলা হয়েছে, রাজা যেন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ দিয়ে বর্ণ শঙ্কর সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্যতীত সবই বর্ণ শঙ্কর। এর মধ্যে বাঙ্গলার জাতি নিচয়ের একটি তালিকা আছে ঃ (১) উত্তম শঙ্কর, (২) মধ্যম শঙ্কর, (৩) অধম বা অন্ত্যজ শঙ্কর। (১) উত্তমের মধ্যে বর্তমানের সৎ-শূদ্রেরা পড়ে। যেমন—করণ, অম্বষ্ঠ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার কংসকার, শঙ্খকার, তামলিক, দাস (কৃষিজীবী), বারজীবী, মোদক ও মালাকার। এদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পেশা আছে। আর যাদের কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই তারা হচ্ছে—সূত, রাজপুত্র (রাজপুত ?), তাম্বুলি। মধ্যম শঙ্করদের মধ্যে আছে : তক্ষণ (সূত্রধর), রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক (অন্য অধ্যায়ে ইঁহাদের কনক-বণিক বলা হয়েছে), আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট-নাট্য, সাভক, শের জালিক। অধম শঙ্করদের মধ্যে মালগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘাটজীবী, দোলাবাহী, মল্ল অথবা মাল।

উক্ত তালিকা 'বল্লাল চরিত' হতে কিছু পার্থক্য আছে। স্বর্ণবণিক শৌণ্ডিক, নট, রজক, ধীবর, জালিক এঁরা সৎ শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতেন। এই জাতি-তাত্ত্বিক উৎপত্তির কথা সম্পূর্ণ-অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক। এগুলি পুরোহিত তন্ত্রের মনগড়া রচনা। অতীত প্রাচীন জনশ্রুতি যে, রাজা যেন তাঁর রাজত্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমাজের লোকের বর্ণ-সাঙ্কর্য ঘটালেন, ইহা আজ-

গুবি কথা। শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লেখককে বলেছিলেন যে, 'বৃহৎধর্মপুরাণ' চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে লেখা হয়েছিল। এই সব জাতিতাত্ত্বিক সংবাদ যে মনগড়া এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। কারণ, বল্লাল চরিতে বৈশ্যদের অর্থাৎ সুবর্ণ বণিকদের পাতিত্য দোষ ঘটাচ্ছেন বল্লালসেনের হস্তে। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনা, কিন্তু 'বৃহৎধর্মপুরাণ' এই ঘটনারও পরে লেখা। যদি বর্তমানের 'সুবর্ণবণিক' এই পুস্তকের উল্লিখিত সুবর্ণবণিক বা কনক-বণিক হয় তাহলে এইজাতি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মধ্যম শ্রেণীর সৎশূদ্র বলে পরিচিত ছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'রজক'কে সৎশূদ্র মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

'রাজপুত্র' সৎ-শূদ্র বলে গণ্য হচ্ছে। 'বল্লাল চরিতে' এবং 'সেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থে 'রাজপুত্র' জাতির উল্লেখ আছে। 'সেখ-শুভোদয়া'তে দেখা যায় লক্ষ্মণ-সেন তাঁদের সঙ্গে স্ব-জাতিয়ত্ব টেনেছেন। সংস্কৃত রাজপুত্র যদি বাঙ্গলায় 'রাজপুত' হয় তা'হলে 'জাতমরা রাজপুত' কবে উদ্ভূত হলো (নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য)। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে দেখা যায় রাজপুতকে কায়স্থের নিম্নে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাঙ্গলায় এই সব পরিস্থিতি কি প্রকারে, কি করে এবং কি হ'তে হলো তাহাই ভাববার বিষয়।

এদিকে ব্রাহ্মণ সর্ব-বর্ণশ্রেষ্ঠ ও দেবতাদের প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে লাগল। রাজসরকারের কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের পরবর্তী নীচে অভিজাতশ্রেণী বলে পরি-গণিত হলো। এইরূপে দশম শতাব্দী থেকে যে শ্রেণী-সংগ্রাম সুরু হয়েছিল এবং তদ্বারা এক নূতন সামাজিক আবর্তন ও বিবর্তন ঘটছিল—তা' সেন রাজ-গণের রাজত্বকালে নূতন পদ্ধতি প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীযুগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বোধ হয় তাহা পূর্ণতা লাভ করে। এই আবর্তন ও নূতন পদ্ধতির ফলে বর্তমান বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ সৃষ্ট হয়েছে। এই সমাজ বৌদ্ধযুগের গৌরব ও কীর্তি কাহিনীর কথা জানে না। বৌদ্ধ যুগের বাঙ্গালীর আন্তর্জাতিকতাভাব বা বাঙ্গলার সার্বভৌমিকত্বের কথাও জানে না। অবশ্য বৌদ্ধ ও পালযুগের কীর্তি-কাহিনীর কথা ক্রমেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ অতীত জানার মধ্যে শুধু জানে—বল্লালের কৌলিন্য প্রথা ও জাত মারামারির সংবাদ; লক্ষ্মণ সেনের খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়নের সংবাদ এবং সাতশত বছরের ছুঁৎমার্গের দলাদলি ও দাসত্বের খবর।

সেনবংশ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর বাঙ্গলার উপর থেকে একাধিপত্য হারায়। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণসেন অথবা আইন আকবরী মতে

লছমনিয়া বৃদ্ধাবস্থায় মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজি নামক তুর্কি সেনাপতি দ্বারা স্বীয় রাজধানী থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র নারাং তাঁর 'ইতিহাস প্রবেশ' নামক হিন্দী পুস্তকে তাহা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, লক্ষণসেন মগধ জয়ের জন্য ক্রমাগত কাশীর রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। উক্ত ঘটনা তার মৃত্যুর পর ঘটে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহা অস্বীকার করে বলেছেন যে ১১৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা এসে এই বলে ভয় দেখায় যে শাস্ত্রে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে একজন আজানুলম্বিত বাহু, শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট তুরষ্ক গৌড় অধিকার করবে। এই সময় উপরোক্ত তুর্ক সেনাপতি মগধ বিজয় সমাপ্ত করে লুন্ঠন করায় ব্যস্ত। সে সংবাদ নিশ্চয়ই গৌড়ে পৌঁছেছিল। তারা আরও বলেন যে এ'তে সাহু প্রভৃতি ধনী নাগরিকেরা ধনরত্নাদি সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা রাজধানী ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন না। তিনি সেখানেই থেকে যান। এর মধ্যে একদিন খিলজি অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করে আঠারজন অশ্বারোহী সঙ্গীসহ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজা আহারে ব্যস্ত। গোলমাল আরম্ভ হতেই খিড়কীর দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। মিন্‌হাজের ইতিহাসে এই ঘটনা রয়েছে। লামা তারানাথের রচিত 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' (শিফনার কর্তৃক জার্মাণ ভাষায় অনূদিত) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে মগধের একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু চরের বেশে মগধ, মিথিলা ও বাঙ্গলা প্রভৃতির লোকদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে খিলজির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেয়। তারপর বক্তিয়ার ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংস করে। এই বক্তিয়ারকে তারানাথ তুরষ্ক 'চন্দ্ররাজা' নাম দেয়। তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্বেদীতে থেকে এই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে মগধ ও গৌড় কেন এত সহজে বিজিত হয়েছিল। কিন্তু মিন্‌হাজ একথা বলেন নি। তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় তিনি অনেক কথাই চেপে রেখে ছিলেন কিম্বা অনেক কথাই জানতেন না।

আজকাল ঐতিহাসিকগণ মিন্‌হাজের এই আখ্যান বিশ্বাস করতে রাজী নন। তাঁরা সেন বংশের বিয়োগান্ত পতনের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সবগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দু স্বদেশ প্রেম প্রণোদিত হয়ে অনেক ব্যাখ্যাই খাড়া করা চলে বটে। কিন্তু একটা কথা কেহই লক্ষ্য করছেন না যে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ের পশ্চাতে বিশেষতঃ বাঙ্গলার সেন রাজত্বের বিয়োগান্ত পরিণামের পশ্চাতে আর একটি

বড় রকমের তথ্য থাকতে পারে। সেন রাজত্ব বিদেশাগত বংশীয়দের শাসন —ইহা অন্যান্য বিদেশাগত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কর্মচারীগণ যারা একটি বুরোক্রেসী গঠন করেছিল তাদের দ্বারাই রক্ষিত ছিল। দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল তখন বৌদ্ধ বা নাথধর্মী অথবা অপর কোন অব্রাহ্মণ্য-বাদী সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা লৌকিক কৌমগত ধর্মাবলম্বী। কাজেই এই শাসক ও শাসিতের মধ্যে অন্তরের প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব থাকাই খুব স্বাভাবিক ও সম্ভব। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' পাঠে অনুমিত হয় যে শাসিত সদ্ধর্মী (বৌদ্ধ) ও শাসক ব্রাহ্মণ্য বাক্‌ণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। সেন বংশের পতন সেই অসদ্ভাবের ফলেও হতে পারে। মুসলমান ঐতি-হাসিকেরা বলেছেন যে গৌড় বিজয়ের পর বৎসর বক্তিয়ার খিলজি যখন কামরূপ বা উত্তর বঙ্গ বিজয় অভিযানে বহির্গত হন তখন অনেক হিন্দু রাজা তার সঙ্গে গমন করেন! উক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গলার একদল লোক মুসলমানদের সঙ্গে জুটেছিল।

বক্তিয়ার খিলজি যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈন্য নিয়ে 'নোদিয়া' নগরে আসতেই লক্ষ্মণসেন পলাইয়া যান ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা তুর্কিদের পদানত হয় ; এই কথা আর বিচারসহ নয় বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 'গৌড়-জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে…লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড়-রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই…এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক।…গৌড-রাজ্যবিজয়ের পরে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন'।[১]

বর্তমানে লক্ষ্মণসেনের বংশ সম্বন্ধে যে সব সংবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে তাহা এই—তাঁর তিন পুত্র—মাধবসেন, কেশবসেন, বিশ্বরূপসেন। শেষোক্তদের সম্বন্ধে 'হরিমিশ্রের কারিকা' ও 'এডুমিশ্রের কারিকা' নামক দুটি আবিষ্কৃত পুঁথিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা' থেকে তুর্কি দ্বারা বাঙ্গলা আক্রমণের সম্বন্ধে নূতন আলোকসম্পাত করে। হরিমিশ্রের কারিকাতে বর্ণনা আছে যে কেশব সৈন্য সংগ্রহ করে একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, কিন্তু শত্রুর সম্মুখে তিষ্ঠিতে সমর্থ হননি, অবশেষে মুসলমান ভয়ে গৌড়

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩-৩২৬।

পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন।[১] বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় জনশ্রুতি আছে যে, কেশবসেন ঐ স্থানে সৈন্য সংগ্রহার্থ গিয়েছিলেন। পুনঃ, একটি কারিকায় বলা হয়েছে লক্ষণসেনের পরিবাদ তার জন্মগ্রহবৈগুণ্যে হয়েছিল। ইহা কি রাজার পলায়ন বিষয়ে ইঙ্গিত করে না? এড়ুমিশ্রের কারিকায় উল্লেখ আছে যে, "বিশ্বরূপ মুসলমান আক্রমণ হইতে পূর্ববঙ্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার সভায় কেশবসেন কুলীন ব্রাহ্মণগণসহ উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।"[২] এই বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে "কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা উভয়ে মুসলমানগণের (গর্গযবন) সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন।"[৩] বিশ্বরূপসেন তুর্কিদের পরাজিত করে "গর্গ যবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্র" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৪] এইস্থলে বলা বাহুল্য যে সংস্কৃতে 'গৌরী' শব্দকে 'গর্গযবন' রূপ দান করা হয়েছে।

লক্ষণসেনের প্রথম পুত্র মাধবসেন সম্বন্ধে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন যে, "পরম সৌগত মধুসেন ১১৯৪ শকে বা ১২৭২ খৃঃ বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন।" রাখালবাবু বলেছেন যে, "৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন যে, কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।"[৫] এই প্রসঙ্গে রাখালবাবু এ'ও বলেছিলেন যে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এট্‌কিসন্ রচিত উত্তর পশ্চিম জেলার গেজেটিয়ার (দ্বাদশ ভাগ) 'হিমালয় জেলা'র ৫১৬ পৃষ্ঠায় তাম্রশাসনের উল্লেখ নাই।"

স্বদেশীযুগের প্রারম্ভে যখন বাঙ্গালী নিজের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করে সেই সময় বাঙ্গলা পত্রিকাতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে কুমায়ুনের কোন স্থানের একটি মন্দিরের খিলানে মধুসেনের নামোল্লেখ আছে। এই বিষয়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক। সেই সময় এ সংবাদও প্রকাশিত হয় যে, পঞ্জাবের পূর্ব দিকস্থ পাহাড়ের রাজপুত রাজ্যগুলি —যথা,

১। নগেন্দ্রনাথ বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ পৃঃ ৫৪-৫৫। সম্বন্ধ নির্ণয়; ৭১১ পৃঃ।

২। নগেন্দ্রনাথ বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ পৃঃ ৫৪-৫৫। সম্বন্ধ নির্ণয়, ৭১১ পৃঃ।

৩। বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭।

৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896. Part I. pp. 9-15.

৫। Atkinson; Kumaon, p. 516.

চম্বা, সুকেত, মণ্ডি, কেউন্থল প্রভৃতি রাজারা লক্ষণসেনের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। তাদের উপাধি—'সেনদেব'। এই সকল স্থানে বাঙ্গালী আচার ব্যবহার পদ্ধতি বিকৃতভাবে এখনও প্রচলিত আছে। লেখকের জনৈক বন্ধু এ সময়ে অনুসন্ধান করে তার সত্যতা নির্ধারণ করেন। কথিত আছে বাঙ্গলার সেনবংশীয় রুদ্রসেনদেব পূর্ব পঞ্জাবে গিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। তার নামানুসারে "রুদ্রসেনপুর" আজ রুপার (Rupar) নাম ধারণ করে। হাতরাসের জমিদার কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ লেখককে বলেন যে চাম্বার রাজা তার নিকট লক্ষণসেনের বংশধর বলে পরিচয় দেন। যদি এই দাবী ঐতিহাসিক সত্য হয়, তা'হলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই বংশ কর্ণাটকে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করে 'ক্ষত্রোপেতা ব্রাহ্মণ' হয়, তাহা বাঙ্গলায় এসে তজ্জন্য 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলে গণ্য হয়। সেই বংশের একদল বংশধর পঞ্জাবে গিয়ে রাজপুত রূপে বিবর্তিত হয়। এতদ্বারা 'ইবেট্‌সনের' মতটি প্রমাণিত হয় যে Caste বা জাতি হচ্ছে একটি Status group বা জাতি একটি পদ বা মর্যাদাসম্পন্ন লোকসমষ্টিমাত্র। ইহাই ছিল প্রাচীনকালের পদ্ধতি। ভোগেল ও ইবেট্‌সন মহোদয়গণের জাতিতাত্ত্বিক তথ্য থেকে এই পাওয়া যায় যে, পঞ্জাব-পাহাড়ের রাজপুতদের মধ্যে কেহ কেহ গৌড় দেশ থেকে আগত বলে দাবী করেন। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। এতদঞ্চলের একজন ডোগরা রাজপুত লেখককে বলেছিলেন যে তারা পূর্বদেশ থেকে এসেছেন। এই সকল বিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

পুনরায়, একটি স্বাধীন হিন্দুরাজবংশের সংবাদ আমরা দনুজ মাধবে পাই। খোদিত লিপিতে আমরা দনুজ মাধবকে দেববংশ বলে উল্লিখিত হতে দেখি। এড়ুমিশ্র পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"দনুজ-মাধু যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্যন্ত যে প্রজা।"[১]

কিন্তু ইহা ভাটের অত্যুক্তি বলেই বিবেচিত হবে। এ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে দিল্লীর বাদশাহ যখন বাঙ্গলার বিদ্রোহী গভর্ণর তোগ্রলবেগকে (১২৭৯ খৃঃ) শাসন করার জন্য পূর্ববঙ্গে আসেন তখন রায় দনুজ (তাবাকতি আকবরীতে ভোজরায়, বাদাউনি বলেন, দানুজ) বাদশাহকে পত্র দ্বারা জানান যে তিনি তাঁ'কে সম্মান দেখানোর জন্যে আসবেন আবার এই অনুরোধও জানান যে তিনি আসলে বাদশাহ যেন দণ্ডায়মান হন। একজন

১। সম্বন্ধ নির্ণয়ে উদ্ধৃত, পৃঃ

কাফেরকে মুসলমান বাদশাহ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে অপারগ—বাদশাহ এই ভাবনায় বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েন। একজন সভাসদ বাদশাহকে বললেন যে রায় আসবার পূর্বেই তিনি যেন একটি বাজপক্ষী হাতে নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন; রায় এসে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করলে বাদশাহ দণ্ডায়মান হবেন ও বাজপক্ষীটি ছেড়ে দেবেন। বাদশাহ ও রায়ের আগমনে সেরূপ করলেন। রায় তোগ্রলকে ধরিয়ে দেবার জন্যে অঙ্গীকার করলেন।[১] বাঙ্গলার বর্তমান ঐতিহাসিকগণ এই নৌজা বা দনুজকেই দনুজ মাধব বলে স্থির করেন। ইনি ব্রাহ্মণদের একবার সমীকরণ করেন এবং ভূমি দান করেন। তিনি যে তৎকালে স্বাধীন ছিলেন সে ঘটনা বাদশাকে 'দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা করা' থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বাধীনতার মূল্যই এই; বোধহয় তোগ্রল তা'কে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাই তিনি সম্রাটকে সাহায্য প্রদান করেন।

জনশ্রুতি থেকে এই বংশের সম্বন্ধে শেষ সংবাদ অবগত হওয়া যায় না; তারা যে কায়স্থ রাজাদের কন্যা দান করেছিলেন এই জনশ্রুতি থেকে কেবল তাই জানা যায়। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজাদের কাছে তারা কন্যা দান করেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের স্বর্গীয় 'বড় রাজা' লেখককে এই কথা বলেও ছিলেন। সেনবংশের হিন্দুশাসনের শেষভাগে যে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিশেষভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কৃত্তিবাসের বর্ণনাতেই আছে ঃ

"পূর্বেতে আছিল শ্রীদনুজ (বেদানুজ) মহারাজা
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিহঁ সুখের সংসার।"

এই সম্পর্কে নগেনবাবু বলেছিলেন—"যতদিন পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল; প্রাচীন হিন্দু প্রথানুসারে অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণ গ্রামপতি ছিলেন। তাহারাই একরকম দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন; দেশের রাজাও পর্যন্ত তাহাদের কথায় উঠিতেন বসিতেন।" প্রাচীন প্রথানুসারে এই ব্রাহ্মণ গ্রামাণীরা যে নিম্নবর্ণ ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের ওপর অত্যাচার করত তা' নিঃসন্দেহ। হিন্দু ভারতের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য প্রদান করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বৈদেশিক পর্যটকদের উক্তি যে বাঙ্গালীরা বহু সংখ্যায় মুসলমান হচ্ছে—ইহার কারণও উপরোক্ত বিবৃতিতে অন্তর্নিহিত আছে।

The Tarikh-i-Mubarakshahi—Translated by K. K. Basu, pp. 39-40.

মহম্মদ-বিন-কাসেম কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণের বৃত্তান্ত আরবদের লেখা "চাচনামা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।[1] সেখানে এইরূপ লেখা আছে সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঠাকুরেরা (ক্ষত্রিয়), ব্রাহ্মণেরা এবং বৌদ্ধ সাধারণ ও তাদের মোহান্তগণ আরবদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। তাদের লেখায় 'মহান্ত' বলে বর্ণিত বড় বড় ধর্মালয়ের অধ্যক্ষেরা ভিতর থেকে আরবদিগকে পথঘাট ও অন্যান্য বিষয়ের সকল সন্ধান দিত। এই মহান্তেরা বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ছিল বলে অনুমান হয়। কাশেমের মুলতান বিজয়ের পতিত মেড ও জাঠেরা ঘন্টা বাজিয়ে ও নিশান উড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল। তারা আরবদিগকে বলে যে সিন্ধের শাসকশ্রেণী তাদের উপর অত্যাচার করতো।[2] 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে সদ্ধর্মিদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের দরুণ ধর্ম 'যবনরূপ' ধারণ করে উহার প্রতিশোধ নিতে আসলেন। আবার আবিষ্কৃত তাম্রলিপির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র অন্তরে অন্তরে সদ্ধর্মী ছিলেন। (নারং 'ইতিহাস প্রবেশ' নামক পুস্তকে বলেছেন যে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের কলহের ঘটনাটি মিথ্যা। সংযুক্তা নামে কোন রমণী ছিল না। বর্তমানে চাঁদবরদাইয়ের কাব্যে লিখিত ঘটনাগুলিও অপ্রামাণিক বলে গৃহীত হয়েছে)।

মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ের সঠিক ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। আরব মুসলমানদের দ্বারা অন্যান্য দেশ বিজয়ের ইতিহাস পাঠে আমরা এই তথ্য জানতে পারি যে প্যালেষ্টাইন, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়-গুলি নিজেদের মধ্যে বিকল্প মতবাদের ফলে পরস্পর একটা ভীষণ বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে আরবেরা তথায় আক্রমণকারী হয়ে আসলে তাদের একদল আরবদের সঙ্গে মিলে যায়। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির পরস্পর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আরব মুসলমানদের জয়ের পথ সহজ ও সুগম করে দেয়। পারস্যেও নামজাদা সেনাপতি ইসফান্দায়ার আরবদের দ্বারা পরাজিত হয়ে অবশেষে তাদের সঙ্গে মিশে যায় ও তাদের বিজয় অভিযানে সহায়তা করতে থাকে। জনসাধারণ পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকায় সৈন্যদল ও জন-সাধারণের অনেকে মুসলমান সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরবদের সঙ্গে যোগদান করে। এর ফলেই পারস্য এতে শীঘ্র ও সহজভাবে মুসলমান হয় যে, আরবেরা নিজেরাই তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। ভারতেও এই প্রকারের

1. *Dr. R. C. Mazumder : The Arab Invasion of India.*
2. *Lane Poole : History of Mediæval India.*

ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। 'ডবলিউ আর্ণল্ড'-এর 'প্রিচিং অফ্ ইসলাম' নামক পুস্তকের ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার পাঠ করলে অবশ্য উপরোক্ত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙ্গলায় সেনবংশ দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধ বিদ্বেষ, যে এই দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ ও পতিতেরা পছন্দ করেছিল তার কোন প্রমাণ নেই। বাঙ্গলার পতিতেরা একবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে এই দেশের পতিতেরা যে ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় শাসন ও শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রীতিভাবাপন্ন ছিল তাহা মানুষের মনস্তত্ব অনুযায়ী আদৌ সম্ভবপর নয়। হিন্দুরা তাদের স্বদেশের ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ লিখে রাখেনি বলেই আমরা এই সব সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঠিক বিবরণ জানি না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী উচ্চশ্রেণীগুলির দ্বারা যে বৌদ্ধ দলন মুসলমান যুগেও চলেছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেছেন—"এই সময়ের রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কুল-গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও মুসলমান দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণে এই জন্যই দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে)। সম্ভবতঃ এই সকল ব্রাহ্মণ ও মুসলমান রাজপুরুষগণের চেষ্টায় রাঢ় ও বরেন্দ্র হইতে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক বিতাড়িত বা উৎসাদিত হইয়াছিলেন।"[১] কান্দি রাজবাটীর পত্রিকায় লিখিত আছে ঃ

বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল।
বৌদ্ধাচারীগণ প্রতি নির্যাতন কৈল ॥"

এই ঘটনা বল্লালসেনের সময়ে ঘটেছিল।

অধুনা রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" আবিষ্কৃত হওয়ায় একটি নূতন তথ্য জানা যাচ্ছে। পণ্ডিতদের উপস্থিত মত যে শূন্যপুরাণের ধর্ম-ঠাকুরের পূজা, পরে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই পুস্তকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে। এছাড়াও ধর্মপূজা সম্বন্ধে আরও অনেক পুস্তক আছে। এখানের আলোচ্য 'শূন্যপুরাণ' যাহা বৌদ্ধ তন্ত্রের পুরাণ।[২] অমরকোষে ধর্মরাজ বা ধর্ম ঠাকুরকে তথাগত বুদ্ধ বলা হয়েছে। ঐ ধর্মপূজা সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের রঙে

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড : পৃঃ ৩৩০।
২। শূন্যপুরাণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৮ ভাগ, ২য় সংখ্যা (১৩৩৮)।

রঞ্জিত হয়ে আমাদের হাতে এসেছে। তথাপি ঐসব পুস্তকগুলিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। শূন্যপুরাণে আছে ঃ "হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধায়"[১] পুনঃ ধর্মপূজা বিধানে আছে ঃ হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মী ও সদ্ধর্মী কলহ যে কত তীব্র ছিল তাহা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের জল গ্রহণ করতেন না এবং সদ্ধর্মীর 'বামুন দেখিলে কোপাইরা মারিতে ইচ্ছাকরার' মনোবৃত্তি বৌদ্ধশীল গ্রহণের উপযোগীতা প্রমাণিত হত। পারস্পরিক এই প্রকার মনোবৃত্তির উপর যখন রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে আসলো, তখন বৌদ্ধ সমাজ, বিশেষতঃ গরীব বৌদ্ধ গণসমূহ যে কি ভীষণ অবস্থায় পড়বে তা' সহজেই অনুমান করা চলে। বৌদ্ধ গণসমূহকে নিশ্চয়ই সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হতো। ইহার ফল হিসেবেই যে তারা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীগণের প্রতি বিমুখ হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে মুসলমান আক্রমণের সময় নিশ্চেষ্ট ছিল—তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে আর সন্দিহান হওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' পাঠে এ তথ্যের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। সাহিত্যিকেরা বলেন—এই অধ্যায়টি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের ভাবই এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় ঃ

জাজপুর পুয়বাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহ্নি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন। ১

* * * *

মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।

১। এই বচন দু'টিতে "হিন্দু" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, এই পুস্তক মুসলমান আক্রমণের পরে রচিত হয়েছে। এই উক্তির দ্বারা ধর্মের প্রতি বৌদ্ধদের মনোভাব প্রকাশ পায়। 'হিন্দু' শব্দটি কতদিনের পুরাতন তা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। পৃথিরাজের চারণচাঁদ বরদাইয়ের পৃথিরাজ রসাওতে "হিন্দুপুত" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আজকালকার মত যে, ইহা ১৬শ খৃঃ লিখিত। বিখ্যাত কবি আমীর খস্রৌ 'হিন্দু' ও তাদের ভাষা 'হিন্দি' এবং 'হিন্দবী' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'খালেকবারী এবং Elliot কর্তৃক ভাষান্তরিত তাঁর রচনাসমূহ দ্রষ্টব্য। ইনি পৃথিরাজের মৃত্যুর আশী বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন।

বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে কারঅ বিনাস ॥ ৩
মনেতে পাইআ মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥ ৪
এইরূপে দ্বিজগন করি সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম্ম মনেত পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৫
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম ॥৬

* * * *

জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥ ৭

* * * *

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥১১

এই কবিতাটি কবে রচিত হয়েছে আমাদের তা আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হলো এর ভিতরে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা ও তাতে প্রকাশিত মনোভাবটি। এতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণেরা সদ্ধর্মিদের কাছ থেকে নানা রকমের কর আদায় করতো। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ সাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হতো। তারা এর ফলে বিশেষভাবে উত্যক্ত হয়েছিল। যখন তুর্কিরা বাঙ্গলা আক্রমণ করে তখন তারা ভেবেছিল ব্রাহ্মণ অত্যাচার থেকে এই নিরাকারবাদী ও জাতিভেদ বিহীন সাম্যবাদীয় মুসলমানগণ তাদের রক্ষা করবে। এইজন্য কবিকল্পনায় তারা ভাবল তাদের দেবতারা 'ইজার' পরে মাথায় কাল টুপি দিয়ে অর্থাৎ মুসলমান রূপে সদ্ধর্মিদের রক্ষা করার জন্য আসছে। এর তাৎপর্য এই যে বাইরের শত্রু দ্বারা গৃহশত্রু দমন হবে। এই ভেবে তারা মুসলমানদের প্রতি

সহানুভূতি সম্পন্ন হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ার খৃষ্টান সম্প্রদায়গণের পরস্পরের দলাদলিতে যেমন মুসলমানেরা এসেছিল, বাঙ্গলায় যে সেরূপ হয় নাই তার প্রমাণ কি? বরং 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'তে সেরূপ ভাবই প্রকাশ পায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বৌদ্ধদের প্রতি কি অত্যাচার করা হ'ত? ইতিহাস বলে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সময় শঙ্করাচার্য্যের গুরু কুমারীল ভট্ট একজন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজাকে প্ররোচিত করে কয়েক সহস্র বৌদ্ধদের হত্যা করায়। রাজা সুধন্বা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিল। 'শঙ্কর বিজয়ে' বর্ণিত আছে—"দুষ্ট মতাবলম্বী বৌদ্ধ জৈনদের তর্কে পরাজিত করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করতঃ ঢেঁকিতে কুটিয়া দুষ্টমত ধ্বংস করিবে।"[১] যখন ব্রাহ্মণ তার্কিকদের দ্বারা এই প্রণালী অবলম্বিত হ'ত তখন যে সব রাজা বৌদ্ধদের পরাজিত করে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র সংস্থাপিত করে একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, সেইসব রাষ্ট্র যে এই সব অভিজাত বা অত্যাচারী ও শোষক ছিল না তার প্রমাণ কি? বরং এমতাবস্থায় অন্য দেশের ইতিহাসে যাহা ঘটেছে এই দেশেও তাহাই ঘটেছে বলে অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণেরা যে অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নিয়ে যে সেন রাজাদের অতিশয় বিব্রত হতে হয়েছে তাহা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ও স্বীকার করেন।[২]

তুর্কিদের দ্বারা বাঙ্গলা বিজিত হওয়ার পূর্বে "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে মহামাণ্ডলিক উপাধিধারী কায়স্থ অথবা গোপ জাতীয় সামন্ত রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই সব বিদ্রোহ দ্বারা গণ-সাধারণের কোন প্রকার সুবিধা হয়নি। তুর্কিদের আক্রমণের সময় তাদের পূর্বোক্ত মনোভাব দেখেই তাদের অবস্থা বোঝা যায় যে তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে শোষিত হতো।

বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্বাংশে সেন ও দেব বংশের তিরোধানে মুসলমান শাসনের প্রসার হওয়ার পর হিন্দু যুগের অবসান হলো বলা চলে। কেবল ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে রাজা গণেশ উদয় হন কিন্তু তার পুত্র যদু মুসলমান হওয়ায় তাকে হটিয়ে চণ্ডীনারায়ণ দনুজমর্দ্দনদেব এবং তৎপুত্র মহেন্দ্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। যদু ওরফে জালালুদ্দিনকে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হয়। জালালুদ্দিনের পণ্ডিত ও কর্মচারী বৃহস্পতি

১। রামানুজাচার্য দ্বারা প্ররোচিত হ'য়ে কেরলরাজ কর্তৃক জৈনদলন হয়েছিল বলে শোনা যায়।

২। গৌড়ের ইতিহাস: রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

রায় মুকুরের কথা "স্মৃতি রত্নহার" গ্রন্থে আছে ঃ "নিজভুজদ্রবনার্জিতশ্রী"। এই প্রকারে মুসলমান অধিকৃত বাঙ্গলার বাইরে ছিল কমতাপুর রাজ্য এবং কুচবিহার রাজ্য। প্রথমটি গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহের সময় বিজীত হয়, দ্বিতীয়টি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় থেকে 'করদ' রাজ্যরূপে গণ্য হতে থাকে। বাকী থাকে ত্রিপুরা। ত্রিপুররাজ্য মোগলদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হয়নি। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' পর্যন্তও ত্রিপুরার মহারাজার উপাধী ছিল। Maharaja of Independent Hill Tippera (স্বাধীন পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজা)। তার অর্থ মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধকালে মহারাজা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার এবং বাঙ্গালীর জাতীয়ভাবে উচ্ছ্বাসের তেজ দেখে বিদেশী শাসকবর্গ ঐ উপাধী রদ করে দেয়। স্বর্গীয় দেশনায়ক মনোমোহন ঘোষ মশাই বলেছিলেন স্বাধীন বাঙ্গলার ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের উপস্থিত একমাত্র প্রতীক হলো ত্রিপুরা-রাষ্ট্র।

এক্ষণে দেখা যাক প্রাচীন বাঙ্গলার সামাজিক অবস্থা কি ছিল? সাহিত্যাদি মন্থন করে আমরা যা পেয়েছি তা আগেই বলেছি। মুসলমান যুগের সৃষ্ট সামাজিক শাসন পরিচালিত বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ দেখে স্বাধীন বাঙ্গলার সমাজ বোধগম্য করা অসম্ভব, এমন কি অবিশ্বাস্য বলে প্রতীত হবে। তখন বাঙ্গলায় রাজার মহাপীলুপতি ছিল. ঘনাঘন নামে যুদ্ধহস্তী ছিল, অশ্বাধ্যক্ষ ছিল, নাসির (অগ্রগামী) অশ্ববাহ। সৈন্যদল ছিল, নৌবাহিনী ছিল, এবং তারা যুদ্ধকালে 'হী হী' রবে রণধ্বনীও করত। ঘোড়ায় চড়ে লম্বাশ্মশ্রু বিশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ করত (মানিকচাঁদের গান)। স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণে যুদ্ধ করত (ধর্মমঙ্গল)। পাহাড়পুরের পোড়া ইঁটের মূর্ত্তি থেকে দেখা যায় যে কৃষক ও দ্বারবানেরাও জাঙিয়া পরিধান করত। স্ত্রীলোকেরাও তদ্রূপ পরিধান করত। এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরবারীযুক্ত পোড়া মাটির মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার বাঙ্গলাবাসীরা বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপন ও ধর্ম প্রচারার্থে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেতো। বিদেশ থেকে স্ত্রী নিয়ে ঘরে ফিরত। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ও কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে তার সাক্ষ্য মেলে। তাম্রলিপ্ত ছিল অতি প্রাচীন বন্দর। কে. ওকাকুরার 'আইডিয়েলস অব দি ইষ্ট' এ আছে যে তাম্রলিপ্ত থেকে উদ্যোগী বাঙ্গালী নাবিকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে ধারে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজেদের রক্ত ও কাথেব (চীন) লোকের সংমিশ্রণ ঘটাতো।

বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে আছে—লোকের সাধারণ বেশভূষা ছিল পুরুষের পক্ষে ধুতী চাদর ও মাথায় পাগড়ী। জীমূতবাহন তার 'দায়ভাগ' গ্রন্থে পৈতৃকধন বিভাগ মধ্যে "পংক্তি পরিচ্ছদ" উল্লেখ করেছেন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এটা নিশ্চয়ই গুপ্তযুগের পোষাক, কারণ পূর্বে আমরা দেখেছি। অন্যদিকে স্ত্রীলোকের শাড়ী, বডিস, কাঁচুলী, ওড়নার ব্যবহার ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এ সবের উল্লেখ আছে। পরিচ্ছদ বিষয়ে বাঙ্গলা, মগধ, মিথিলা ও পশ্চিম থেকে পৃথক ছিল না। অধ্যাপক গুরিয়ে দুঃখ করে বলেছেন যে, একাদশ শতাব্দীতে যেমন হিন্দু আইন পূর্বের 'দায়ভাগ' এবং দাক্ষিণাত্যের 'মীতাক্ষরার, পৃথকীকরণ ঘটেছিল, সেরূপ পোষাকেও সে যুগে পার্থক্য দৃষ্ট হয়েছিল।[১]

বোধহয় এককেন্দ্রীভূত শাসনের তিরোভাবে খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের বিবর্তন হওয়ায় প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। আবার সেন রাজারা দক্ষিণাপথ থেকে আগত বলে, বহু দ্রাবিড় এবং কর্ণাটক ব্রাহ্মণের বাঙ্গলায় বসবাস ইত্যাদির জন্যে দক্ষিণের আচার ব্যবহারের প্রভাব বাঙ্গলাকে অভিভূত করেছিল। খাস বাঙ্গালী চন্দ্রগোমিনের রচিত চান্দ্রব্যাকরণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে অধীত হতো[২], তাহাও বাঙ্গলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয় কিংবা বৌদ্ধলিখিত পুস্তক বলে বিলুপ্ত করা হয়। তার পরিবর্তে প্রচলন করা হয় "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ"। এদেশের ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণের ন্যায় মাথার থর কামিয়ে শিখাধারণ করতে লাগলেন। আবার পাল ও সেন রাজাদের রাজভৃত্যদের (সৈনিক ?) মধ্যে চোড়, খস, মালব, হুণ, কর্ণাট ও গৌড় প্রভৃতি নাম দেখে অনুমান হয় অন্য প্রদেশের লোকেরাও সৈন্য শ্রেণী বা অপর কাজে নিযুক্ত থাকতো। আর তাদের কেহ কেহ যে এদেশে বাস করেন নি তা কে বলিল ?

আবার তাম্রলিপি এবং কুলজীগ্রন্থসমূহ পাঠ করলে জানা যায় যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই বঙ্গদেশে বাস করেছেন। মুসলমান যুগেও এই ঔপনিবেশিকের স্রোত বন্ধ হয়নি। এরা সকলেই ধীরে ধীরে এই প্রদেশবাসী ও বাঙ্গলাভাষী হয়েছেন।

হিন্দুযুগের শেষ কথা হলো এই যে প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরাজত্বের অবসান মধ্যে বাঙ্গলার অধিবাসাদের একটা সামাজিক সমীকরণ হয়েছিল। লেখক একে প্রথম জাতীয় সমীকরণ (First Social Integration) বলে

১। Ghurye : Indian Costume.

২। B. N. Datta : Mystic Tales of Lama Taranatha.

অভিহিত করেছেন। তৎকালে বাঙ্গলার সমাজ ও একজাতিত্বের পার্থক্য ছিল না। সমাজ বিভিন্ন প্রদেশের বা বিভিন্ন মূল জাতীয় বা বিভিন্ন ধর্মের লোকদের স্বীয় শরীর মধ্যে একীভূত করে নিয়েছিল। সেজন্যে আমরা বিভিন্ন উৎপত্তির বা প্রদেশের লোকদের মধ্যে পার্থক্য দেখি না। আজ গৌড় ব্রাহ্মণ, কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, সারস্বত ব্রাহ্মণ, সরয়ূপারী ব্রাহ্মণ, মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলে বাঙ্গলায় কোন পৃথক বা পার্থক্যচিহ্নিত ব্রাহ্মণ সমাজ নাই, সকলেই 'দায়ভাগ' আইন শাসিত 'বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ'।

পূর্বে কোনও অতীত যুগে বাঙ্গলার কৌম অবস্থা ছিল। কিন্তু পরে পাল এবং সেন যুগে 'জনপদ' বিভাগের আবির্ভাব হ'তে দেখি। লোক তখন নিজেদের জনপদ বিভাগ দ্বারা পরিচিত হত—যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু দায়ভাগে অপুত্রকের কন্যা বা ভগিনীর পুত্রের (cognates) বিষয়াধিকার প্রদান ক'রে কৌমাবস্থার (clan stage) বাইরের অভিব্যক্তি অর্থাৎ একজাতীয়তার অভিব্যক্তি ঘোষণা করে।

বর্তমান পাশ্চাত্যের আইনবিশেষজ্ঞেরা বলেন, যখন কৌমাবস্থা থাকে তখন বিষয়াধিকার স্ব-গোত্রে গণ্ডীভূত থাকে। কিন্তু যখন ভিন্ন গোত্রে এই অধিকার বর্তায় তখন বুঝতে হবে স্ব-গোত্র (Agnate) এবং আত্মীয় ভিন্ন গোত্রের লোকদের (cognate) সম্মিলন হয়েছে। তখন বিষয় কৌমের বাইরের লোকের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। এর অর্থ এই যে সেকালে কৌমাবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে একজাতীয়তা (nationhood) অভিব্যক্ত হয়েছে। ইহাই আইন এবং সামাজিক অভিব্যক্তি বিষয়ে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে বাঙ্গলা অন্য প্রদেশ থেকে উচ্চস্তরের অভিব্যক্তিতে অবস্থিত।[১]

এস্থলে বলা দরকার যে আজকাল আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসার', 'বৌদ্ধকৃষ্টি', 'বৌদ্ধসমাজ' প্রভৃতির কথা প্রতিনিয়ত শুনে আসছি। কিন্তু বৌদ্ধ পঞ্চশীল গ্রহণকারীরা সনাতনী অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দু সমাজেই বাস করতেন। তাঁরা বর্ণাশ্রমী জৈন, শিখ, বৈষ্ণবদের ন্যায় পৃথক সমাজ সৃষ্টি করেন নাই। বিদেশীর লেখা পুস্তকগুলিই তার সাক্ষ্য দেয়। অপরদিকে যিনি 'দশশীল' গ্রহণ করতেন, তিনি বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করে মঠে সাধু (ভিক্ষু) হ'তেন। তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধর্ম ও দর্শন তত্ত্বের কলহও হতো। বৌদ্ধদের জন্য কোন পৃথক সামাজিক স্মৃতি ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক ছিল না। সর্বধর্মের লোকেরাই এক ভারতীয় আর্যসমাজ পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। কাদম্বরী

১। B. N. Datta: Hindu Law of Inheritance.

পুস্তকেও সেই সাক্ষ্য দেয়। পশ্চিম বাঙ্গলায় 'সরাক' বলে একটি কৃষিজীবি জাতি আছে। কবিকঙ্কণ তার 'চণ্ডী' কাব্যে এদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মানভূম জেলাসমূহে বাস করেন। ধর্মে তাঁরা জৈন, কর্মে কৃষিজীবি, জাতিতে দায়ভাগ শাসিত বাঙ্গালী হিন্দু; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এঁদের পৌরোহিত্য করেন। কবিকঙ্কন এঁদের বলেছেন, "সর্ববিষয়ে তাঁরা নিরামিষ"—তাহা আজও সত্য। সরাক শব্দ 'শ্রাবক' থেকে উৎপত্তি। এঁরা জৈনগৃহস্থ। কিন্তু ভারতের সর্বত্র জৈন ধর্মের যা' অবস্থা, এঁদের পক্ষেও তাই ঘটেছে। পারিপার্শ্বিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের ভাব ও আচার ব্যবহার দ্বারা এঁরা অভিভূত হয়েছেন। সেজন্যে এঁদের পুরোহিত আজ ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা শিব পূজাও করে থাকেন।

অষ্টম নবম শতাব্দীর অপভ্রংশ ভাষায় লেখা 'পাহুড় দোঁহা' নামক পুস্তকে দেখা যায়, এককালে জৈনরাও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং শিবপূজা দ্বারা প্রভাবিত ও অভিভূত হয়েছিল। তার চিহ্ন বাঙ্গালী জৈনরা আজও বহন করছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাঢ় জনপদে 'আর্য'কৃষ্টি ও ধর্ম' জৈনমত-রূপে প্রথম প্রবেশ করে। বাঁকুড়াতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রস্তরমূর্তি ও ভাস্কর্যের বহু ভগ্নাংবশেষ সর্বত্র পাওয়া যায়। ঐ সরাকেরাও সেরূপ সামাজিক ভগ্নাবশেষ। কবিকঙ্কণের কালে এরা ছিল তন্তুবায়, এখন ধরেছে কৃষিবৃত্তি।

কবিকঙ্কন মুঘলযুগের প্রারম্ভের পশ্চিম বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। সেখানে হিন্দু জাতিদের বর্ণনা-কালে সরাকদের উল্লেখ করেছেন। তার ফলে বোঝা যায় যে বল্লালসেন এবং চৈতন্য ও রঘুনন্দনের সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের দ্বিতীয় সমীকরণ (Second Social Integration) হয়; তাতে সরাক জাতি স্থান পায়। সেরূপ বাঙ্গলার আর একটি প্রাচীন জাতি, 'আগুরি' বা 'আগরি' জাতি যাদের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও কবিকঙ্কনে উল্লেখ আছে, তারাও এই দ্বিতীয় সমীকরণের অন্তর্গত।

কবিকঙ্কন জাতিসমূহের বর্ণনাকালে বলেছেন: "বর্ণ বিপ্র হয় মঠস্বামী" এর অর্থ—তথাকথিত অনাচরণীয়দের পুরোহিত আদিতে বৌদ্ধ মঠের মোহন্ত ছিল। ইহা সর্বদা সত্য বলে বোধ হয় না। বর্তমানের অনাচরণীয়দের পুরোহিতেরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণের পদবীধারী লোক। বৈষ্ণব পুস্তক 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে: কষ্টশ্রোত্রীয়, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি অভাবগ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা 'বর্ণবিপ্র' হয়েছিলেন। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন: শীতলাদেবীর পূজকেরা 'ধর্মঘোরীয়া' ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন। কিন্তু এঁরা আসলে বৌদ্ধ পুরোহিত

ছিলেন। হয়ত হতে পারে এই যে, বৌদ্ধ 'হারীতি দেবী' যখন শীতলামায়ী হ'লেন, তখন তাঁর ভিক্ষু পূজক ব্রাহ্মণ সাজিলেন। কিন্তু এরা ব্রাহ্মণসমাজে আজও গ্রাহ্য নন।

অপরদিকে দেখি নাগার্জ্জুনের 'একজটা দেবী', 'তারাদেবী' যখন ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় 'কালীমায়ী', 'মা তারা' হ'লেন তখন তাদের পুরোহিত হ'লেন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ! এর কারণ পাল ও হিন্দুযুগে মহাযান প্রসূত তান্ত্রিক ধর্ম উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা সেবিত হতো। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বেদবিহীন তান্ত্রিক বলা হয়েছে। কিন্তু আগমবাগীশের দল যখন তন্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মে পরিণত করলেন তখন উচ্চশ্রেণীরাই তাতে অনুরক্ত হ'লেন। সেজন্যে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেই তান্ত্রিক দেবীদের পূজকরূপে রয়ে গেলেন। এখানে আমরা শ্রেণী লক্ষণ নিরীক্ষণ করি।

শেষের কথা, মুসলমান যুগে যে সব হিন্দু বাইরে থেকে এসে বাঙ্গলায় বসবাস করতে থাকেন, তাঁরা দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণের বাইরে রইলেন। তাঁরা ভাষায় ও বাহ্যিক আচার ব্যবহারে বাঙ্গালীভাবাপন্ন হলেও বাঙ্গালী হিন্দু সমাজভুক্ত আজও হন নাই। বাঙ্গালা স্বজাতির সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক আদান প্রদান নাই। তাঁরা অনেক স্থলেই পূর্ব বাসভূমের প্রাচীন সমাজের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক করে নিজেদের অবাঙ্গালীত্ব এবং জাতীয় কৌলিন্য রক্ষা করেন। আজও বেশীর ভাগ তাঁরা মীতাক্ষরা আইনাধীন। তাঁদের স্মৃতি এবং পুরোহিতও পৃথক। উপস্থিত সকলেরই এক আইন হয়েছে।

এঁদের মধ্যে যেসব রাজপুত বাঁকুড়াতে বাস করেন তাঁরা বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের চাকুরীর অধীন থাকায় সর্ব বিষয়ে বাঙ্গালী হয়েছেন। এঁরা দ্বিতীয় সমীকরণের মধ্যস্থিত। কিন্তু কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণাদি যাঁরা মুসলমান যুগ বা তার পরে বাঙ্গলায় বসবাস করেছেন তাঁদের অনেকেই এতদিন মীতাক্ষরার অধীন ছিলেন। তাঁরা সামাজিকভাবে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের বাইরে আছেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে দু'একটি বর্দ্ধিষ্ণু বংশ ব্যবধান ভেঙ্গে বাঙ্গালী স্বজাতীয় সমাজভুক্ত হয়েছেন, যেমন লেখকের একজন মালদহবাসী আগরওয়ালা জাতীয় বন্ধু তাঁকে বলেছেন—"আমি বাঙ্গালী, আমরা দায়ভাগ আইন স্বীয় বংশে গ্রহণ করিয়াছি। আগরওয়ালা আমার আসল নাম নয়।" এই প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝা যায় যে, অনেক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, লালা কায়স্থ প্রভৃতি দ্বিতীয় সমীকরণভুক্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রবেশ করতে চান, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ইহা লেখকের কাছে এই সব জাতীয় কেহ কেহ স্বীকার করেছেন।

এই সব কারণের ফলে এই নূতন ঔপনিবেশিকদের বিবাহাদি ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা রয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই সব ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যাঁরা পুরাতন অধিবাসী, তাঁদের সঙ্গে নূতনদের বিবাহ চলে না। সেজন্যে তাঁরা কৌম বা জনপদগত বিভাগে বিভক্ত না হয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে 'মিল' বা গণ্ডী দ্বারা বিভক্ত। ইঁহারা সব তৃতীয় সমীকরণের অপেক্ষায় আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মুসলমান যুগ ॥

"সিয়াহ গোয়ন্দ হিন্দু হামচুঁনি অস্ত।
সোয়াদ ই আজাদ-ই আলম হামী অস্ত ॥"

(আমীর খস্‌রো)

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কি মুসলমানদের দ্বারা বাঙ্গলা দেশ আক্রান্ত হয় এবং সে সময় থেকেই বৌদ্ধদের নাম আর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের সম্পর্কে শেষ উল্লেখ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কেবল চৈতন্য চরিতামৃত আর বৈষ্ণব সাহিত্যে; কিন্তু সে উল্লেখও কেবল করা হয়েছে বাইরের বৌদ্ধদের সম্পর্কে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে এই বৌদ্ধেরা গেলেন কোথায় ?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে একটি মত হচ্ছে এই যে—মুসলমানেরা ভারতীয়দের "বুদপরস্ত (মূর্তি উপাসক) হিন্দু" এই সাধারণ নামে আখ্যায়িত করত, এবং এ'জন্যে মুসলমান যুগের ইতিহাসে আর তাদের কোন আলাদা অস্তিত্বের সন্ধান মেলে না।[১] ভারতীয়রা হিন্দু; তাদের 'হিন্দী' বা 'হিন্দবী' নামে একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে—এটা দিল্লী দরবারের ফার্সী কবি আমীর খস্‌রোর অভিমত।[২] সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে বৌদ্ধদের যখন আর কোন পৃথক অস্তিত্ব রইল না তখন বৌদ্ধ গণসঙ্ঘ আর ভারতের পতিত জনসাধারণের অদৃষ্টে এ'যুগে কি ভাগ্য ছিল—সে সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সব বিষয়েই পতিত হওয়ায় ধর্মান্তরিত হয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সব সময়েই ব্যগ্র থাকত। এজন্যে তাদের বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জানি যে কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজেও একটা বৈষম্য সৃষ্টি পূর্বক অভিজাতশ্রেণী এবং

১। Dr. Ketkar—"History of Caste in India". গজনীর মামুদের দরবারী ঐতিহাসিক অল্-বেরুনী বলেন—তিনি ভারতীয় বৌদ্ধদের সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কলহ-বিবাদ আছে; কিন্তু তাদের (বৌদ্ধদের) দর্শন তিনি পাননি। বোধ হয় তাদের পৃথক সত্ত্বা তিনি ধরতে পারেন নি। অথবা তখন উহা ছিল না (Prolegomena to India.

২। Elliot : History of India. খস্‌রোর "খালেক বারিতে,' উপরোক্ত দু'টি নামই উল্লিখিত আছে।

জনসাধারণের মাঝে একটা দুস্তর ব্যবধানের বিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং বৌদ্ধ রাজা ও অভিজাতশ্রেণীর বিরুদ্ধেও গণসাধারণের উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম কখনও অর্থনীতিক সাম্যবাদের উপর স্বীয় পদ্ধতি স্থাপন করে নাই। এ ধর্ম শুধু ধর্মক্ষেত্রে সাম্যবাদ চেয়েছিল এবং সে বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছিল। যেমন এই বাঙ্গলায় বৌদ্ধদের ধর্মক্ষেত্রে একদিকে দেখা গেছে যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীয় বা উচ্চকুল সম্ভূত লোকেরা নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হয়েছে, বৌদ্ধ সহজযান বাদের ব্রাহ্মণবংশীয় সররুহপাদ গ্রন্থকার হয়েছে, আবার অপর দিকে হাড়ি, ডোম, জেলে প্রভৃতি জাতীয় লোকেরাও ধর্মাচার্যের স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা বলে সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না; একত্রে আহার করা আর "স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি" মন্ত্রণানুযায়ী সব জায়গা থেকে স্ত্রীলোক যোগাড় করে বিবাহ করলেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না। এটা মানবজাতির ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। এজন্যেই বলা হয় বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্যবাদ ছিল না এবং বর্তমানকালের মুসলমানদের মাঝেও তা' নেই। তবে বৌদ্ধদের মাঝে সাম্যবাদ যেটুকু প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে তাও ছিল না। ঠিক এজন্যেই পতিতেরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

আজ পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্মের সংঘারাম মধ্যে ধর্মমূলক বা অধ্যাত্ম সাম্যবাদ[১] প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংঘারামগুলোতে যার যতটুকু প্রয়োজন সে ঠিক ততটুকুই পেত এবং প্রত্যেকে যথাসাধ্য সংঘের সেবা করত; অবশ্য এ ব্যবস্থা ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সমাজেও ধর্মমূলক বা অধ্যাত্ম সাম্যবাদকে ভিত্তি করে একটা আন্দোলনের প্রবর্তন হয়েছিল। এমনকি ঐতিহাসিকেরা বলেন যে খৃষ্ট প্রবর্তিত ধর্মমণ্ডলীও প্রথমে এই অধ্যাত্ম সাম্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বুদ্ধ তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে যে গঠন-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা' ঊনবিংশ শতাব্দীর নৈ-রাষ্ট্রবাদ মতের প্রবর্তক বাকুনিনের 'Anarchist Communism' গঠন প্রণালীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বাকুনিনের সমাজ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীভূত শাসন পরিষদ নেই ঃ মানুষের প্রত্যেক বাসস্থলই তার মতে সর্ব বিষয়ে স্বাধীন থাকবে এবং প্রত্যেকেই সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পরস্পরের স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হ'য়ে বাস করবে। বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংঘসমূহও অনেকটা এই প্রণালী অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১। Dr. R. C. Mazumder : Corporate Life in Ancient India.

সংঘগুলির প্রত্যেকটি অপরটি থেকে পৃথক ও স্বাধীন; এবং প্রত্যেকের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু একত্রে সংঘবদ্ধ করে চালানোর জন্যে কোন কেন্দ্রীভূত শাসন পরিষদ ছিল না। এ পদটি বুদ্ধদেব তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হ'লে তিনিই তা' মিটিয়ে দিতেন। এমনও প্রমাণ আছে যে, তিনি এ প্রচেষ্টায় একবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের চক্ষে তাঁর স্বজাতীয় গণতন্ত্রগুলিই আদর্শ ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্বে গণতন্ত্রের অকর্মণ্যতা বিষয়ে নিন্দা আছে। বৌদ্ধধর্ম মণ্ডলীর যে গঠনপদ্ধতি ছিল, তৎকালে ভারতে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আবার রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা যেমন পোপ ও তাঁর College of Cardinal-দের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং এখনও আছে, বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়ের সেই কেন্দ্রীভূত শাসন ক্ষমতার অভাব ছিল। বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্মমণ্ডলী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ন্যায় এ' অভাব রাজশক্তির দ্বারা পূরণ করে নিয়েছিল। সম্রাট অশোক ও ধর্মপালের সংঘের প্রতি অনুজ্ঞাই তার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য এ' প্রকারের ব্যবস্থা অন্যান্য ধর্মের প্রথমাবস্থায়ও ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের কনষ্টান্টিনোপলস্থিত সিজার (সম্রাট) সেই সাম্রাজ্যসীমার মধ্যস্থিত খৃষ্টীয় ধর্মের কোন বিচারের শেষ হুকুমদাতা ছিলেন। আবার খেলাফৎ সাম্রাজ্যে বাগদাদস্থিত খলিফাই সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ছিলেন। বৌদ্ধধর্মও বোধহয় সেজন্যে রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত, তবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিবাদ উপস্থিত হলে মাঝে মাঝে একটা সঙ্গীতি (Council) ডেকে তার মীমাংসা করা হত এবং সে সঙ্গীতি অনুষ্ঠানে রাজশক্তির সহযোগিতা আহ্বান করা হত। ঠিক সেই জন্যই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক-জন রাজা বা সম্রাটকে স্বদলে আনবার বা আনাবার চেষ্টা করত এবং রাজাকে ধর্মের পরিচালক হিসেবে খাড়া করত।

ইউরোপে একটা প্রবাদ আছে যে, "Religion follows the flag" অর্থাৎ ধর্ম রাজশক্তির অনুসরণ করে। এর তাৎপর্য হ'ল এই যে রাজশক্তির সাহায্যেই ধর্মের উত্থান আর এর অভাবেই ধর্মের পতন ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মের পুনরুত্থান কালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিস্তার ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ করল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেকেই বৌদ্ধ রাজশক্তির অভাবে আপন স্বার্থ-হানির সম্ভাবনায় ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করল এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজদরবারে যাতায়াত করতে লাগল। বাঙলার ব্রাহ্মণ্য-

বাদীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে যেমন সেই ধর্মাবলম্বীয় একটা অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল, ঠিক তেমনি বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনীশ্রেণীগুলোও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় সমাজের দিকে ভিড়তে আরম্ভ করল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বাঙ্গলার কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজে প্রবেশ করেন সবার শেষে।[১] কারো কারো মতে কায়স্থেরা হলো শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ-কার্যোপজীবিশ্রেণী; বৃহৎধর্ম্মপুরাণে 'কায়স্থ' ও 'বৈদ্য' বলে কোন জাতির উল্লেখ নাই। এর পরিবর্তে আছে "করণ" ও "অম্বষ্ঠ"[২]; এরা পরবর্তীকালে একটা জাতিতে পরিণত হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজশাসনের প্রবর্তন হলে পর তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সমাজে প্রবেশ করে। এ সময়ে তারা একটা বিশিষ্ট সম্পদশালী বা ভূ-স্বামী শ্রেণীর জাতিতে উন্নত হয়েছিল। তারপর দেশে তুর্কি শাসন প্রবর্তিত হলে তাদের অনেকেই তুর্কি শাসনের রাজকর্মচারী শ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং এভাবে তারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ভারতীয় সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে—তুর্কি শাসনের সময়ে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যখন আপন শ্রেণী বা ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিল, তখন গণশ্রেণী বা পতিতেরা কি করছিল? সদ্ধর্মিরা (বৌদ্ধ) যে তুর্কি-মুসলমান আক্রমণকে তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবে দেখছিল এ কথার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। তাদের ভাগ্যচক্রের কি বিবর্তন হয়েছিল সেটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

উত্তর ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে তুর্কি-মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় সমাজের শ্রেণী-সংগ্রাম অন্য আকার ধারণ করে। ভারতীয়েরা সে সময় থেকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত হ'তে থাকেন; আমীর খসরু ভারতীয়দের 'হিন্দু' বলেছেন। তখনকার হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র এবং সে সময় ভারতীয় যাহা কিছু সবই তারা আঁকড়ে ধরে একটা স্বজাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার গণ্ডী কাটতে চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। আর বিদেশাগত মুসলমানেরা আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন; তার ফলে তাদের ভেতরে মূল-জাতীয় বা স্বজাতীয় বলে কোন ভাব ছিল না। যে কোন দেশের, বর্ণের বা জাতির লোক মুসলমান হলেই সে ইসলামীয় সমাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়ে থাকে। ইসলামের এই সাম্যবাদ বিজিত জাতিগুলির হৃদয় জয় করে

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: সাহিত্য পরিষদের ১৩৩৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

২। History of Bengal (Dacca University).

এবং এর ফলে আরবদের দ্বারা বিজিত জাতের লোকেরা অনেক স্থলে প্রায়শঃই সম্পূর্ণভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নিত। এইচ. জি. ওয়েলস্ মহাশয় বলেন যে, ইসলামের অভ্যুত্থানের যুগে তদপেক্ষা উদার সমাজ পদ্ধতি অন্য কোন সম্প্রদায় মানবজাতিকে উপহার দিতে পারেনি।[১]

ইসলামীয় সাম্যবাদ ভারতে খুব কার্যকরী হয়েছে সেজন্যে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সর্বাধিক। কেবল বাঙ্গলা দেশেই মুসলমানের সংখ্যা যত, একমাত্র যবদ্বীপ ভিন্ন সে সংখ্যক মুসলমান পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। ভারত বিজয়ী মুসলমানদের আন্তর্জাতিকতার ফলে হিন্দুধর্ম ত্যাগকারীরাও তাদের ভেতর স্থান পেল। রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি জাতিদের প্রায় অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গেছে, এক সময়ে তারা পারস্যের কারমান প্রদেশে ও উত্তরে আফগানিস্থান পর্যন্ত সকল স্থানে বাস করত এ কথা পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তৎপর গুজার ও অপরাপর জাতের লোকেরা অগুন্তি সংখ্যায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। বাঙ্গলা দেশের বেলায়ও সেই অনুমান করে বলা হয় যে পতিত জাতির ভেতর থেকেই বেশী সংখ্যায় লোক মুসলমান হয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বার্বোসা নামে কোন এক ইউরোপীয় পর্যটক এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'বাঙ্গালীরা হুড় হুড় করে মুসলমান হচ্ছিল।'!

ভারতবর্ষে সাতশ' বছরের হিন্দু মুসলমানের সংগ্রাম, হিন্দু আর মুসলমান অভিজাতবর্গের ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতেই পর্যবসিত হয়েছিল। এটা প্রথমদিকে ছিল মূল জাতীয় (Racial) সংগ্রাম। কিন্তু পরে যখন হিন্দু অভিজাতবর্গের এবং হিন্দু উচ্চবর্ণের অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল, তখন এটা আর দুটো ভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংগ্রাম হিসেবে অপরিবর্তিত রইল না; আর এ সময় ভারতীয় পতিতদের অনেকেই ধর্মান্তর গ্রহণ করে হিন্দুসমাজের বৈষম্য-নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ পেল এবং এদের অনেকে উচ্চপদও লাভ করেছিল, যেমন খিলজি সম্রাট বংশের, মালিক কাফুর আর খসরু নামীয় সেনাপতি দু'জন প্রথমে ছিল হিন্দু। উভয়েই ছিল পতিত সমাজের লোক। এই খসরুকে বিধ্বংস করে যিনি দিল্লীতে একটা বাদশাহী বংশের (তুঘ্‌লক) পত্তন করলেন, তাঁর মা ছিলেন জাঠজাতীয়া রমণী। এইভাবেই

১। H.G. Wells : Outlines of History.

শূদ্র ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করল। চন্দ্রগুপ্তের মাধ্যমে শূদ্র জাতি যেমন একবার ভারতে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এই ধর্মান্তরিত সেনাপতিদের আর শূদ্ররক্ত সঞ্জাত সম্রাটদের মাধ্যমে ভারতে পতিতগণ আবার নিজেদের প্রকট করে তুলল।

এ'ভাবেই হিন্দু-সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভের আশায় ভারতের পতিতেরা দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। ভারতের জাতীয় রাজশক্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের প্রতি কোনদিন ন্যায় বিচার করেনি সেজন্যে এরা একবার আশ্রয় গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে, আবার মুসলমান রাজশক্তি একটা সাম্যবাদীয় সমাজ-পদ্ধতির সুবিধা দেখানোর পর ছুটে চলে সেই দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই, যেসব স্থানগুলোকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে 'ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত' স্থান হিসেবে ঘৃণা করত, সেই সব স্থান আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান প্রধান। মহাভারতের কর্ণপর্বে গান্ধার (পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্থান), পঞ্চনদ, মদ্রক, সিন্ধু সৌবির (সিন্ধ) প্রভৃতি দেশসমূহকে ব্রাহ্মণদের বাসের অযোগ্য বলা হয়েছে। মনুতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের 'দরদ' ও 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে। আবার এদিকে বাঙ্গলাকেও বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ বর্জিত দেশ। কিন্তু এ সকল দেশই আজ মুসলমান প্রধান। অথচ মুসলমান আক্রমণকালে এসব দেশেই ব্রাহ্মণধর্মীয় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, এই সব দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমান সাম্যবাদ গ্রহণ করেছে?

হিন্দুর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ে অভিজাত হিন্দুরা কি করেছিল—এটা স্বভাবতই মনে উদয় হয়ে থাকে। ভারতীয় সাহিত্যপাঠে বোঝা যায় যে ৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটে, তখন থেকেই শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত বেদান্তবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এ সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের ফলে উভয় ধর্মের নানা প্রকারের সমন্বয় সাধন চলছিল। শঙ্কর যখন তাঁর বৈদান্তিক মত প্রচার করতে লাগলেন তখন তাঁকে ব্রাহ্মণেরা 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' হিসেবে বলতে আরম্ভ করল। এর আগেই তান্ত্রিক মতবাদ ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এবং অনেকের মতে এ'টা গোঁড়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়ার ফল এবং পরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেকে আবার তান্ত্রিকদের শক্তিদেবীকে মহাযান বৌদ্ধ 'একজটা', 'বজ্রতারা' ইত্যাদি দেবী অনুমান করে থাকেন, এবং বুদ্ধকে পৈতে পরিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীয়

শৈবদের শিব সাজানো হয়েছে বলেও আবার কেহ কেহ অনুমান করেন।[১] আবার কেহ কেহ এ'টাকে বিদেশাগত ধর্ম হিসেবে ধরে থাকেন।[২]

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া কাল থেকে শঙ্করের বেদান্ত মত প্রচার কাল অবধি দেখা যায় যে, রাজারাই এই পুনরুত্থানে সাহায্য করেছিলেন। অভিজাতীয়েরা কেন বেদান্তগত সঞ্জাত শৈব ও শক্তি পূজায়[৩] আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অর্থনীতিক কারণ সাহিত্যে আজও অজ্ঞাত। হয়ত বা ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যানুসারেই এ'টা ঘটেছিল—কারণ বৈদান্তিক মত গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় শাস্ত্রগুলোর দোহাই দিয়ে বৌদ্ধ অথবা অন্য প্রকারের সাম্প্রদায়িক ধর্মমতকে নির্জিত করা চলত আর সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ও পতিতদের শোষণ করার সুবিধে হতো।

এই কারণেই হয়ত বেদান্তের মতটি অভিজাতীয়েরা গ্রহণ করেছিলেন। "শঙ্কর দিগ্বিজয়ে" ৭।৯০ আছে—বৌদ্ধ গুরু বধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যখন কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রবেশ করেন, সে-সময়ে শঙ্কর তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে কুমারিল বলেছিলেন—"তথাগতাক্রান্তভূদশেষং স বৈদিকো ইধ্বা বিরলী বভূব" অর্থাৎ "বৌদ্ধেরা সমস্ত দেশ অধিকার করে নিয়েছে, বৈদিক মার্গও লুপ্তপ্রায় অবস্থা।" বৌদ্ধ সাম্যবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গীদের বুনিয়াদী স্বার্থে যে বিশেষ আঘাত পড়েছিল এবং তা দূর করার জন্যে পুরোহিতবর্গ আর উচ্চস্তরের লোকেরা যে কি করছিলো তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। তারা 'নবক্ষত্রিয়' শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদের সাহায্যে সাম্যবাদীদের উপর নির্যাতন সুরু করে দিল। কুমারিল নিজেই মহারাষ্ট্র দেশের এক রাজাকে প্ররোচিত করে বহু সহস্র বৌদ্ধের প্রাণনাশের কারণ হয়েছিলেন। এখন শঙ্করও সেই মত গ্রহণ করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েন। যে বেদান্ত মত প্রচার কল্পে শঙ্কর দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেটা যে কতদূর অভিজাতদের স্বার্থের অনুকূলে চালিত হয়েছিল তাহা শঙ্করের কার্যেই প্রকাশ পায়। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের তর্কে পরাস্ত করার জন্য "বেদ একমাত্র অভ্রান্ত প্রামাণ্য" বলে গ্রহণ করলেন এবং খৃষ্টীয় 'নাইট টেমপলার'দের মত একদল সণ্ডা গুণ্ডা পালোয়ান চেলা তাঁর সঙ্গে সব সময়ই থাকত; উদ্দেশ্য

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: বৌদ্ধধর্ম।

২। H. P. Sastri: Introduction to N.N. Basu's "The Modern Buddhism and its Follwers in Orissa." p.10.
হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী: হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা, পৃ: ৯।

৩। "তান্ত্রিক মতের ভিত্তিও বেদান্তের উপর"—মহানির্বাণতন্ত্র।

—প্রহারপূর্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। বেদের বিরুদ্ধে কোন মতই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। অন্যত্র "শঙ্কর দিগ্বিবিজয়" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ ও জৈনদের তর্কে পরাস্ত করে তাদের মাথা কেটে নিয়ে ঢেঁকিতে কুটবার ব্যবস্থার কথা আছে। তাঁবেদার নব-ক্ষত্রিয়েরা এদের হুকুম তামিল করবার জন্যে মোতায়েন থাকত। এই প্রচার অমোঘ অস্ত্র নিয়েই নব-বৈদিকের দল অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা দিগ্বিজয়ে বার হ'তেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈনদের "পুনর্জন্মবাদ", "কর্মফলবাদ" রূপ মতবাদের অস্ত্রকে নিজস্ব করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। "তোর শিল, তোর নোড়া, তোর ভাঙ্গব দাঁতের গোড়া"—যেন এই ভাব আর প্রণালী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বৈদান্তিকের মতের উৎস সম্পর্কে পরলোকগত ৺দ্বিজদাস দত্ত বলেছেন যে, "বৈদান্তিক মত বলতে কুমারিল ঐতরেয়াদি শতপথাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থোপদিষ্ট কর্মমার্গকেই লক্ষ্য করিতেছেন। কুমারিলের লক্ষ্য মতেই দেখা যায়—শঙ্করের সময়ে ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণগ্রন্থ লুপ্ত প্রায়। মূল 'ত্রয়ী' বা ঋগ্বেদাদি যে শঙ্করের সময় ততোধিক লুপ্ত প্রায় এবং অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয় শঙ্করাচার্য স্বয়ংই মূল ঋগ্বেদ দেখিতে পান নাই। তাহা না হইলে তিনি ঋগ্বেদকে 'বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগ হেতু' বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। অনুসন্ধানের ফলে ইহা দেখা যায় যে ঋগ্বেদ বর্ণাশ্রম বিভাগের উৎস নয়; এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রথম বিবরণ (সংবাদ) পাওয়া যায়।"[১] কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদের বিধান—এই বলে বৈদান্তিক দল দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লো। এ থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি এই নূতন মতটি কতটুকু শ্রেণীস্বার্থ দুষ্ট। এ জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রগুলোকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এগুলো "শ্রেণীগত দর্শনশাস্ত্র" (Class Philosophy) মাত্র। আবার তিনি এও বলেছেন যে, "কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন।" আশ্চর্যের কথা ঐতরেয় অর্থাৎ ইতরারপুত্র মহিদাস শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলে ব্রাহ্মণ পিতার দ্বারা শিক্ষাকার্যে উপেক্ষিত হতেন। তিনি পাতালে গিয়ে শিক্ষালাভ করেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বড়াই করেছেন!

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সময় যে সব ধর্ম উত্থিত হয়েছিল এবং সেগুলো যে অভিজাতীয়েরাই গ্রহণ করেছিলেন—এ তথ্য আমরা তদানীন্তন সাহিত্য পাঠেই জানতে পারি। সূর্য উপাসনা যা' ইরাণী মাগীদের (Magi)

১। দ্বিজদাস দত্ত: ঋক্‌বেদ।

মাধ্যমে ভারতে প্রচলিত হয় তার সম্পর্কে কিংবদন্তি ভবিষ্যপুরাণে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দ্বারাবতী থেকে বহ্লীকদেশের সূর্য মন্দিরে কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য করার জন্য গিয়ে এই পূজা পদ্ধতি আর সূর্যের পুরোহিতদের ভারতে নিয়ে আসেন। এই পুরোহিতেরাই মগ বা শকদ্বীপ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়।[১] সূর্য পূজা যদি একজন রাজপুত্র দ্বারা ভারতে প্রচলিত হয়ে থাকে, শৈব ও শাক্ত ধর্মও সেরূপ অভিজাতদের দ্বারাই প্রথম গৃহীত হয়েছিল। বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের এই সকল নূতন ধর্ম কাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তার সংবাদ জানা যায়। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের পতনের পর ভারতের আদিম জাতিসমূহের সংস্কার এবং বিশ্বাস নূতন আকারে প্রকট হতে থাকে। নৈসর্গিক উপাসক আদিম জাতিসমূহ প্রথমে গাছ, পাথর, সাপ, নৈসর্গিক ও মহামারীর উৎপাত প্রভৃতিকে দেবতারূপে পূজা করত। পরে বোধ হয় হুণ মহাযানীদের পাল্লায় পড়ে সেইসব 'ক্ষেত্রপাল', হারিতীদেবী, বটগাছ, অশ্বত্থ (ন্যগ্রোধ বৃক্ষ)[২] প্রভৃতি পূজার রূপ নেয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকালে এগুলোকে আমরা লৌকিক ধর্মের মধ্যে স্থান পেতে দেখি। ক্রমে, ক্ষেত্রপাল—ভৈরব ও হারিতীদেবী—শীতলা দেবী রূপে বিবর্তন হ'ল। আর বট, অশ্বত্থও হিন্দুদের কাছে পূজা পেতে আরম্ভ করল।

এই লৌকিক বিশ্বাস ক্রমশঃই ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'তে থাকে। সেজন্য পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যগুলোতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্য[৩] কীর্তন দেখতে পাই। যেমন সংস্কৃত চণ্ডীতে মৌর্যদের বলা হয়েছে 'দৈত্য'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনগুলো ব্রাহ্মণেরা নাম পালটে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ করে নেন। আর এ ভাবেই ক্ষেত্রপাল—ভৈরব, হারিতীদেবী—শীতলামাতা এবং বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রূপ পেলেন। অশ্বত্থ গাছ হয়ে উঠলো হিন্দু দেবতার আবাসস্থল। এমন কি "যজ্ঞ নিন্দা করেন" যে ধর্মঠাকুর তিনিও পাঁঠাবলি ভোগ সহযোগে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজা পেতে লাগলেন। শেষে এই দুই ধর্ম এমন ভাবে মিশে গেল যে এই মিশ্রণের মাঝখান থেকেই বাঙ্গলার বর্তমান

১। নগেন্দ্রনাথ বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড।

২। ন্যগ্রোধ বৃক্ষ (Indian fig tree) মহেন্-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত দ্রব্যের মধ্যে একটি পূজিত বৃক্ষ। এই বৃক্ষকেই ব্রাহ্মণদের রচিত সাহিত্যে সম্মানিত করা হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত হিন্দুরা তাই করছে।

৩। দীনেশ সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; পৃঃ ৪৮।

হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হলো—শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন, 'যখন একজন ব্রাহ্মণপূজক শিবপূজার সময় "ধ্যেয়ঃসদা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন তিনি হিন্দু। যখন "আত্মানং বিষ্ণুস্বরূপাং বিভাজ্য" মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনি বৌদ্ধ।[১] এ ভাবে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশ থেকে মুছে নির্মূল করে দেয়। বৌদ্ধ চন্দ্র গোমীন দ্বারা প্রণীত চান্দ্র ব্যাকরণ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত। পুণা থেকে তাহা ছাপা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বৌদ্ধ ধর্মের লোক-গুলো তাহলে গেল কোথায়? ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে কোন্ কোন্ শ্রেণী কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থানের পূর্বে এ কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ নানা সম্প্রদায়রূপ ধারণ করে সে সময়ে বঙ্গে প্রবেশ করে। সূর্যোপাসনার বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে; বাঙ্গলায় সৌর উপাসক নেই। কিন্তু রামজীবন বিদ্যাভূষণ (১৬৮৯ খৃঃ) "আদিত্য চরিত" বা "সূর্যের পাঁচালী" নামে যে পুস্তক রচনা করেন তাতে দেখা যায় "এই পাঁচালীতে হাড়ি জাতির প্রতি যে নিগ্রহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা সৌর উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া থাকেন।"[২]

অতঃপর শৈবধর্ম রাজা মহারাজা বা বিত্তবান সওদাগরদের দ্বারাই গৃহীত হতে দেখা যায়। শিবোপাসক ধনপতি সওদাগর লৌকিক দেবতার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে বলছেন ঃ

'যা করেন শিবশূল এবার পাইলে কূল
মনসারে বধিব পরাণে।'[৩]

আবার শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজাও যে লৌকিক ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন তার প্রমাণ হ'লো দেবকীনন্দনকৃত মনসামঙ্গলের এই উদ্ধৃতিটি।

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ।"[৪]

শক্তিপূজাও কিন্তু প্রথম প্রচারিত হয় অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীর মাঝেই। "খুল্লনার বিপদে (শ্রীমন্তের খেদে) লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয়

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—অভিভাষণ বক্তৃতা।
২। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ১৮৯।
৩। কেতকাদাস : মনসামঙ্গল।
৪। দেবকীনন্দন : শীতলা মঙ্গল, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ১ম সংখ্যা ৩৯ পৃঃ।

বিদীর্ণ হইতেছিল, সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই।"[১] অন্যদিকে ঘনরামের "ধর্মমঙ্গল কাব্যে" ধর্মরাজ সকল দেবদেবীর উপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণিত হয়েছেন এবং অন্য সব দেবদেবী ধর্মঠাকুরের হুকুম তামিল করেছেন বলে তাঁর বইতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বই প্রায় আড়াইশ বছর আগেকার রচনা। এভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য থেকে নজীর সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের সময়ে এই ব্রাহ্মণ্যবাদ কেবল অভিজাত বা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই গ্রহণ করেছিলেন এবং "মঙ্গল সাহিত্যে" অভিজাত ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় পূজা আর লৌকিক ধর্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে পারি! সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের জাবর কেটে সহজযান বা সহজিয়া, নেড়াচার্যের নেড়া-নেড়ীরদল ধর্মপূজা, গাজন, চড়ক, শীতলা ও মনসার পূজায় ব্যাপৃত ছিল। (রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে কালী, চড়ক, গাজন, শীতলা প্রভৃতির পূজার ব্যবস্থা নাই)। ইতিমধ্যে মুসলমান ধর্মের বান—ডাক দিল বাঙ্গলার সমাজে। মুসলমান গাজীরা চারদিকে তরবারীর সাহায্যে জোর করে বাঙ্গলার লোকদের মধ্যে সাম্যবাদীয় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো। একদিকে অস্ত্রের সাহায্যে লোক জয়, অপরদিকে ধর্ম প্রতিষ্ঠা। পতিতেরা সেই ডাক শুনলো। সাম্যবাদের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজনীতিক সুবিধাও ইসলামীয় সমাজ দিতে আরম্ভ করলো তখন এ' দুয়ের আকর্ষণের তরঙ্গ আর রুখে কে?

পূর্ববঙ্গে পতিতের সংখ্যাধিক্য ছিল বলে অনুমিত হয়। ইহার অর্থ স্থানীয় লোকেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে ছিল এবং হয়ত নামমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাক্রান্ত ছিল কিম্বা বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা অভিভূত না হয়েও নাথধর্ম বা কোন প্রকারের লৌকিক ধর্মাবলম্বী ছিল। এদের মধ্যে গাজী, ফকির ও মৌলভীরা গিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে তাদের ধর্মান্তরিত করতে থাকে এবং নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের আশায় নানা অলৌকিক গল্প কাহিনীর 'লেকচার' দিয়ে অজ্ঞ মুর্খ জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে ইবন বটুটার বর্ণনা এবং ডাঃ এনামুল হকের 'কবি শেখচান্দ' প্রবন্ধ অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখতে পারেন। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)। "চণ্ডাল" বলে পুরাতন নামে পরিচিত এবং বর্তমানের নমঃশূদ্র পূর্ববঙ্গের আদিম অধিবাসী। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ কোচ প্রধান স্থান। পুঁড়ো বলেও একটি

১। দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২১।

জাতি আছে। কোচ ও মেচ জাতিরা প্রাচীনকালে কোন এক সময়ে পার্বত্য প্রদেশ থেকে নীচে নেমে উত্তরবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই কোচদের পালরাজাদের সময়ের 'কাম্বোজ' জাতি বলেও অনেকে সনাক্ত করতে চান।[১] ঐতিহাসিক যুগেই এরা 'হিন্দুধর্ম' গ্রহণ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে। প্রবাদ আছে রাজা যখন হিন্দু হয়ে রাজবংশী নাম নিয়ে "শিবের সন্তান" বলে পরিচয় দিতে লাগলেন, তখন সাধারণ প্রজারা বিরক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। নরতত্ত্ববিদের মতে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নরতাত্ত্বিক কোন প্রভেদ নেই। এই ভাবে যখন পতিত হিন্দুরা ক্রমাগত মুসলমান হ'তে আরম্ভ করলো তখন হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে একটা সমস্যা উপস্থিত হয় কি প্রকারে এই ধর্মান্তরিতকরণের তরঙ্গ রোধ করা যায়? ঐতিহাসিকেরা বলেন, হিন্দুদের মুসলমানকরণ, মুঘল রাজত্বের অপর ভাগেই অর্থাৎ তুর্কি ও পাঠান শাসনকালেই বিশেষভাবে হয়েছিল; এই সময় কেবল পতিতেরা নয়, উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও নূতন শাসনের সুবিধা পাবার আশায় দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করতে লাগলো।[২] মুসলমান প্রথানুযায়ী 'জিম্মিদের' (করদ অমুসলমান প্রজা) আইন ও সামাজিক চাপ দিয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণ করান হোত। যে ভাবে হিন্দুরা মুসলমান হ'তে আরম্ভ করেছিল—সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরলোকগত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন যে এটা একটা 'Sad reflection on Hinduism' অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের একটা কালিমা।

মুসলমান প্রচারকেরা যখন বাঙ্গালীদের ইসলামের দিকে টানতে লাগলো, তখন হিন্দু রাজশক্তির অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই বাঙ্গালীদের মুসলমান করণের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। একদিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের দল এগিয়ে এলেন; আর অন্যদিকে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেব কর্মক্ষেত্রে উদয় হলেন। বাঙ্গালীরা এই দুই টানায় পড়ে দু'ভাগে বিভক্ত বয়ে গেল—মুসলমান আর হিন্দু[৩]।

পূর্বে বলা হয়েছে, শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম উচ্চ বর্ণ ও সমাজের উচ্চস্তরের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। উচ্চস্তর গেল, বাকী রইল নিম্নস্তর। তা'হলে প্রশ্ন উঠে—এই নিম্নস্তরের লোকেরা কি অবস্থায় রইল? শ্রেণী বিভাগ এখানেও স্বীয় প্রভাপ প্রকাশ করেছে। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৫।

২। বার্বোসার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ।

যে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যেরা শাক্ত ধর্মাবলম্বী,[১] আর অন্য জাতিগুলো গৌড়ীয় অর্থাৎ চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। আবার তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলো ধর্মপূজা করেন বা ক্রমশঃ চৈতন্য ধর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ও চৈতন্য ধর্ম গ্রহণ করছেন। এই বিভাগ কি ভাবে হলো? অনুমান করা হয় যে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় যে শ্রেণী-বিভাগের আবির্ভাব ঘটে, তারই খেই ধরে ধর্মেও এ বিভাগের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অভিজাতীয়দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই ব্রাহ্মণ্যধর্মই শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়রূপে বাঙ্গলায় দেখা দেয়। আবার এই সব সম্প্রদায় ধনী ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল বলে, তান্ত্রিক আগমবাগীশ-দের কথা কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণীয়েরাই শোনে। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৯৪০ খৃঃ আনন্দবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি কঙ্কনচণ্ডী—২য় ভাগ; ৯২৯-৯৩০ পৃঃ) এবং অন্যান্য অনেকের মতে মুসলমান কালেই শাক্তপূজা বাঙ্গলায় প্রাধান্য লাভ করে। সে সময়ে শক্তিপূজার মাধ্যমে ক্ষাত্রশক্তি অর্জন করার জন্যে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে সুরথ রাজার দুর্গোৎসব কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন করে "চণ্ডী" অথবা "দেবী-মাহাত্ম্য" নাম দিয়াই শক্তিপূজার ধর্মগ্রন্থ প্রচার হয়। সুরথ রাজার রাজধানী 'কোলবিধ্বংসীরা' ('কোলবি-ধ্বংসীনন্তদা' পাঠান্তর 'কোলবিধ্বংসীনস্তথা') বিনষ্ট করে দেয়, পরে জনৈক ঋষির পরামর্শে অরণ্যে অকাল-বোধন দ্বারা শক্তিপূজা করায় তিনি হৃত রাজ্য ফিরে পান। পূজা করার ফলে বিনষ্ট রাজ্য ও ষড়ৈশর্য পাওয়া যায় এই তথ্য বিজিত হিন্দু অভিজাতদের নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করার কথা।

অনেকের মতে এই পূজা তুর্ক-মুসলমানদের শক্তি প্রতিরোধ করার জন্যেই প্রচারিত হয়েছিল। তারা 'কোল' অর্থে মুসলমান মনে করে থাকেন। কিন্তু সংস্কৃতে চণ্ডীর যে সব টীকা আছে, সেগুলোর কোনটাতেই 'মুসলমান' অর্থ হয় না। সংস্কৃত 'কোল' অর্থ শূকর। কোন টীকাকার এই অর্থে 'কোল' জাতিকে বুঝেছেন। কেহ ক্ষত্রিয় জাতি, কেহ বা আবার উত্তরপশ্চিমের 'যবন' জাতি বুঝেছেন। কিন্তু মুসলমানেরা শূকর বিধ্বংসী নন; সেজন্যে কোলবিধ্বংসী অর্থ মুসলমান হতে পারে না।

তান্ত্রিক ধর্ম তুর্কি আক্রমণের আগেই ভারতে প্রচলিত ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাঙ্গলার অভিজাতেরা মহাযানী বৌদ্ধ বা মন্ত্রযানী (তান্ত্রিক)

১। শিশিরকুমার ঘোষ: অমিয় নিমাই রচিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

ছিল। তারা মুসলমান যুগেও তান্ত্রিক ছিল। তবে শক্তিপূজার বিশেষ প্রচার হয়ত তুর্কি শাসনকালেই হয়েছিল। কারণ, "তখন তাহাদের আবশ্যক হইল প্রচণ্ড শক্তি মাতৃদেবতার, যিনি পীড়িত ও ভীত ভক্তদের অঙ্কে স্থান দিয়া শত্রু শাসন করিতে পারিবেন......তখন চণ্ডীর মাহাত্ম্য আশার সংবাদ লইয়া প্রচারিত হইল।"[১]

আগমবাগীশেরা তান্ত্রিক মতকে মধ্যযুগীয় বাঙ্গলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটাকে একটা পূর্ণতর বর্ণাশ্রমীয় সনাতনী রূপও তাঁরা দিয়েছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণকে স্বদলে টানবার চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থা পদ্ধতির কিছু সংস্কার করে একটু নূতন পদ্ধতির প্রচলন করেন; যেমন কালী পূজার প্রকারভেদ। এরা 'কালী জাগর্তি গোপাল', 'কালী জাগর্তি কালিকে' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা আর তন্ত্রের উপাসনার মাঝে সামঞ্জস্য রাখার প্রচেষ্টা করেন এবং এক উপায়ে জাতিভেদের গণ্ডীও ডিঙ্গাবার চেষ্টা করেন। যেমন, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা ভৈরবী চক্রে জাতিভেদ মানতেন না, কিন্তু অন্য সময়ে জাতিভেদ মানতেন। সেজন্যেই নবশায়কাদি জাতিগুলো তন্ত্রে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়নি। এ সব কারণের জন্যেই আগমবাগীশেরা আড়ম্বরে পূজা-পদ্ধতি প্রচলন করা সত্ত্বেও এই ধর্ম গণসমূহের (masses) ধর্ম হিসেবে গড়ে উঠেনি।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, চৈতন্য ও রঘুনন্দনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কৃষ্ণানন্দের পরে শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে এবং মহাপ্রভুর একশত বছর পরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহ প্রবলরূপ ধারণ করে। বৈষ্ণবদেব সহজ 'শ্লোগান' বা প্রচারকথা গণসাধারণকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল এবং সেকালে তথাকথিত উচ্চ জাতীয় শ্রেণী বলতে বোধ হয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশীয় লোকদের বোঝাত। কারণ পাল বংশের আমল থেকে সাধারণভাবে এই কয়েকটি জাতির লোকেরাই 'আমলাতন্ত্র' গঠন করেছিল বা করতো (খোদিত লিপি-সমূহ দ্রষ্টব্য)। এরাই রাজকার্যের প্রভাবে ভূমি, খেতাব আর সম্মান পেয়ে সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করতো। এর বাইরে ছিল বণিক জাতির লোকেরা। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনী হোত। (মঙ্গলকাব্যে কেহ কেহ শৈব ছিল বলে বর্ণনা আছে)। হয়ত তারা সবাই ছিল বৌদ্ধ। অন্ততঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের এই মত। কিন্তু "বল্লালচরিত" পাঠে উক্ত মতের সমর্থনে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সুবর্ণ বণিকদের দলপতি বৌদ্ধ-

১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃ: ৯২৯-৯৩০।

রাজাকে কন্যাদান করেছিল। কিন্তু তা' থেকে 'সবাই বৌদ্ধ ছিল' এটা প্রমাণিত হয় না। আর তা'হলে বল্লালের ভোজন গৃহে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ঝগড়াই বা তোলা হবে কেন? অন্যদিকে বৌদ্ধ গৃহস্থ যে বর্ণাশ্রমের বাইরে ছিল তারই বা প্রমাণ কোথায়? খোদ পালরাজারা রাষ্ট্রকূটবংশে বিবাহ করত। আবার নবশায়কেরা পরাশর সংহিতা মতে পরশুরাম কর্তৃক এই নাম প্রাপ্ত হয়। এই জাতি ভারতের অন্যান্য স্থানেও আছে। কিন্তু তাঁরা 'নবশাখা' নয়। যা হোক সুবর্ণবণিকদের সম্পর্কে প্রবাদ এই যে তাঁরা রাজরোষে পড়ায় এবং বৌদ্ধ সম্পর্ক থাকায় বল্লাল সেন তাঁদের জাতিচ্যুত করে পতিতদের দলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহৎধর্মপুরাণে (১৩-১৪ শত খৃষ্টাব্দে) সুবর্ণ-বণিকের নাম নেই; বরং মধ্যম বর্ণ-সঙ্কর কনক বণিকের উল্লেখ আছে। সে সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাঙ্গলায় সৌরোপাসনা প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে নি এবং তখনকার দিনে যারা অভিজাত-বংশীয় ছিল তারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শৈব অথবা শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল। এর বাইরের লোকেরাও ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো; আবার তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্তও হতে লাগলো। লামা তারানাথের মতে, বাঙ্গলায় তুর্কি আক্রমণের পরে, তৎকালীন গোরক্ষনাথের দলভুক্ত নাথধর্মীয় লোকেরা ছিল, তাহারা তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ্যবাদী) সঙ্গে মিশিতে থাকেন। এঁরা পরে "জুগী" নামে পরিচিত হতে থাকেন। এক্ষণে তাঁরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয়। তাঁরা, কাপালিক ধর্মীয়েরা এবং পরের জাত-বৈষ্ণবেরা "ধর্মগত জাত" (Religious caste) রূপে বিবর্তিত হন। তারানাথ বলেছেন, কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্র দলটি বুদ্ধে অনুরক্ত রইলো। কিন্তু আজ তাঁরাও অন্তর্ধান করেছেন। এক কথায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হন। এই প্রকারে জৈনরাও 'সরাক' নামে বাঙ্গালী হিন্দু বলে পরিচিত হয়েছেন। আশ্চর্যের কথা, এই যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ই পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের কথা, বুদ্ধের সন্ন্যাসের ন্যায় সঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতের সর্বত্র প্রচার করেছেন। আজ গোপীচাঁদ সর্ব ভারতীয় সাধু। তারানাথ তাঁর কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এই গীতে আমরা পাই, গোপীচাঁদের ১০০ রাণী ছিল। কেবল অদুনা ও পদুনা তাঁর সঙ্গে ভিক্ষুণী সেজে দেশ পর্যটন করেন। এই ঘটনা পালযুগের পরে। বাকী রাণীরা দেবরদের বিবাহ করেন। স্বামী পরিব্রাজক হ'লে স্মৃতির মতানুযায়ী স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারত। বাঙ্গলায় তখন

সেই প্রথা ও এই সঙ্গে দেবর বিবাহ প্রথা বোধহয় দশম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল।

চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপে এক অপ্রত্যাশিত রাজনীতিক ঘটনা ঘটে। হোসেনশাহ্ তখন গৌড়ের বাদশাহ্।[১] নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এই মর্মে বাদশাহের নিকট এক সংবাদ পৌঁছে। এতে বাদশাহ্ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ করবার জন্যে হুকুম দেন। অবশ্য শেষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এই অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া আছে ঃ

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণে ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপের বিপ্র তোর করিব প্রমাদ॥

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥[২]

এ ঘটনার পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিকতা আছে কিনা তা' জানার কোন উপায় নেই। এই সংবাদ প্রতিধ্বনিত করছে, যশোরের কথকদের কথায়।[৩] কিন্তু সে সময় থেকে নবদ্বীপে যে লোক সমাবেশ হতে আরম্ভ করলো তার দ্বারা বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে পড়লো। নবদ্বীপ ছিল তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এর সন্নিকটে শান্তিপুরে অদ্বৈত গোঁসাই বাস করতেন। তিনি "নরসিংহ নাড়িয়াল বলে খ্যাত, যাহার মন্ত্রণায় শ্রীগণেশরাজা" তাঁর বংশধর।[৪] রাজনীতিজ্ঞান যে তাঁর ছিল না বা সমাজের বিষয় চিন্তা তিনি করতেন না তা বলা যায় না। অদ্বৈত গোঁসাই ছাড়াও নবদ্বীপে আরও কয়েকজন বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। এরা প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানে বা ব্রাহ্মণ্যাভিমানী শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না।

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে সে সময়ে হাবশীরা রাজা ছিল।
২। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল; নদীয়াখণ্ড, পৃঃ ১১।
৩। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩।
৪। ঈশান নাগর: অদ্বৈত প্রকাশ।

এ সব লোকের মাথায় কোন রাজনৈতিক কল্পনা ছিল কি না জানার কোন উপায় নেই। তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, হোসেনশাহের ক্রোধের বিবরণ কি একেবারেই ভিত্তিহীন ? গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন যে, সে সময়ে গৌড়ের শাসনকর্তারা সমগ্র নবদ্বীপ জেলাকে বলপূর্বক মুসলমান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং নবদ্বীপ সহরে অত্যাচার চালিয়েছিলেন। এই সব লোকের পরবর্তী কালের কার্য দ্বারাই প্রকাশ পায় যে এদের সময়ে কোন একটা বিপ্লবের ছবি বা পরিকল্পনা মনে জেগেছিল। তাছাড়া চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হয়েছে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবার ভবিষ্যৎ বাণী ছিল।

ঐ রাজনৈতিক ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিমাই পণ্ডিত (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী) ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িককালে স্মার্ত রঘুনন্দনেরও সেস্থানের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। ঐ সময়ে যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা প্রত্যেকে ভালভাবেই হউক বা মন্দভাবেই হউক বাঙ্গালী জীবনে নিজেদের কাজের ছাপ রেখে গেছেন।

নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনাকালে ব্রাহ্মণবংশীয় সাধু নিত্যানন্দ অবধূতও এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। পরে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এই নিমাই পরে 'চৈতন্যদেব' নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং অদ্বৈত ও মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি বয়স্ক বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে সমাজ বিপ্লবের শানিত অস্ত্ররূপে পরিণত করেন। এই বৈষ্ণব সমাবেশ হেতু বাঙ্গলায় একটা বৈষ্ণব মত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মূলকথা ছিল—'আচণ্ডালে প্রেমদান' এবং সংজাতীয় লোকেদের এক বন্ধনে বাঁধা। এই ধর্মের প্রভাবে সপ্তগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কালীদাস হাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়েছিলেন—মহাপ্রভু তাতে পরমপ্রীত হয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবতে আছে—জাতিভেদের অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি শূদ্র রামরায়কে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন; আর তাঁর ব্রাহ্মণ অনুচর ভক্তেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করে শুধু 'দাস' বলে আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন। ঈশান নামীয় এক ব্রাহ্মণ উপবীত ছিঁড়ে তাঁদের সেবার অধিকারী হয়েছিলেন। "আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই"—এ বাক্য চৈতন্যদেব অটল নির্ভীকতার সঙ্গেই প্রচার করেছেন। এই কথা চৈতন্য ভাগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে।[১]

চৈতন্যদেব ও তাঁর সহকর্মীরা যখন হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা ভেঙ্গে দিয়ে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন মুসলমান এবং মুসলমান

১। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৬৬।

ভাবাপন্ন কয়েকজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত রয়েছে—"তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।" এদের একজনের নাম ব্রহ্ম হরিদাস অপর দুই জনের উপাধি সাকর মল্লিক ও দবীর দাস। শেষোক্ত দু'জন চৈতন্যদেব প্রদত্ত সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী নামে খ্যাত। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন, ইঁহারা মুসলমান বংশোদ্ভব ছিলেন। আজকালকার পণ্ডিতদের মত যে, তাঁরা কর্ণাটকাগত ব্রাহ্মণ বংশীয়; কিন্তু সমাজে 'ঠেকো' ছিলেন। তাঁরা নিজেদের 'নিচ' জাতীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১] আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করায় এবং ছুঁৎমার্গ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উপরোক্ত তিনজনকে ব্রাহ্মণ্যবংশীয় বলে প্রচার করা হচ্ছে। এঁরা ছাড়াও অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নামও বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই সমাজ বিপ্লবের পশ্চাতে কিসের অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়? পূর্বেই বলা হয়েছে যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা বাঙ্গালীকে স্বদলে টানার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিকদের দল অন্যতম। উচ্চবর্ণ ও অভিজাতদের মধ্যেই এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর ব্রাহ্মণের অন্য যে দলটি বাঙ্গালীদের স্বমতে আনার জন্যে চেষ্টা করল তারা এই অদ্বৈত পণ্ডিত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দল। এঁরা কিন্তু নবশায়ক (নবশাক) এবং তৎনিম্ন জাতিগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলেন। ব্যক্তিগতভাবে দু' একজন উচ্চবর্ণ ও উচ্চস্তরের লোক ব্যতীত গণসমূহের মধ্যে এঁরা কাজ করতে লাগলেন। পতিত জাতের লোকেরা এঁদের ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দেয়। এজন্যই নিত্যানন্দ, চৈতন্য আজ পর্যন্ত "পতিতপাবন" আখ্যায় ভূষিত আছেন। চৈতন্য ধর্ম প্রথম দিকে উচ্চবর্ণ ও অভিজাতদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল পরে গণসমূহের মধ্যে বিস্তার ও ব্যাপকতা লাভ করে। নবদ্বীপের স্মার্ত ও গোস্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাদা আলোচনা করে বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসার সম্পর্কে লেখক যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার কিঞ্চিৎ নীচে দেওয়া গেল ঃ

(১) খেতুড়ীর মহোৎসবের পর বাঙ্গলায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মত সর্বত্র প্রচারিত হতে লাগলো।

(২) নবশায়কেরা এবং অ-সৎ শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিপীড়িত হতো। সেজন্য তাদের অধিকাংশ লোক গোস্বামীদের শিষ্য হ'ন। অনেক ব্যবসায়ী

১। প্রমথনাথ তর্কভূষণ : বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম, পৃঃ ৬৮।

জাতির ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল না, গোস্বামীরা তাদের পৌরোহিত্য করতে থাকেন।

(৩) কায়স্থ ও বৈদ্যদের ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা ছিল, তাদের কোন সামাজিক অসুবিধা ছিল না।

(৪) শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ কন্যাদান, পংক্তি-ভোজন প্রভৃতি আদান-প্রদান করতেন না। স্থান বিশেষে এখনো তা করেন না। নবদ্বীপেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আজও আছেন।

(৫) নবশায়কদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণেরা নারায়ণ (শালগ্রামশীলা) সঙ্গে যাতায়াত করতেন না।

(৬) মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবল ছুঁৎমার্গও ছিল।

(৭) নবশায়ক ও অসৎ-শূদ্রের গোত্রপ্রবর ছিল না।

কবিকঙ্কণ থেকে বোঝা যায় যে, মধ্যযুগে ধনী হলেই সামাজিক পদমর্যাদা পাওয়া যেত না এবং তার প্রমাণ হোল সুবর্ণ বণিক, সাউ প্রভৃতি জাতি।

এই প্রকার অসংখ্য ধর্ম ও সামাজিক অসুবিধার জন্যে অধিকাংশ হিন্দু চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে তারা ব্রাহ্মণ, গুরু, পুরোহিত পেতে লাগলেন। "হরিভক্তিবিলাস" নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ শূদ্রের নারায়ণ (শালগ্রামশীলা) পূজা করার অধিকার দেয়। দেখা গেল যাদের কোন গোত্র-প্রবর ছিল না তারা পুরোহিতদের গোত্রপ্রবর গ্রহণ করতে লাগল। যে সব ব্রাহ্মণ নবশায়কদের গুরুগিরি ব্যবসা করছিলেন, তাঁরা এখন হতে লাগলেন "গোস্বামী"। পতিত ও অন্ত্যজের বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো এবং তারা ব্রাহ্মণও পেতে লাগলেন। আর এই ব্রাহ্মণেরা "বর্ণ-ব্রাহ্মণ" বলে প্রতিষ্ঠিত হলো।

অনেক মুসলমানও বৈষ্ণব হয়েছেন এবং এদের অনেকে জাতবোষ্টম সমাজে মিশে গেছেন বলে এক্ষণে অনুমান করা হয়। হয়ত বা অনেক নবশায়কাদি মুসলমান সমাজে স্বীয় পদানুযায়ী উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ায় পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে সেই সমাজে মিশে যান। পতিত বা তথাকথিত যে কোন নীচু জাতীয় লোক গোস্বামীদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলে সেই সব গোস্বামীরা শিষ্যদের হাতের জল গ্রহণ ও তাদের বাড়ীতে স্বপাকে অন্ন গ্রহণ করেন। অনেকে ইহাদের বাড়ী পাকা খানা (পুরী, লুচি, মিষ্টান্নাদি) খান। বীরভদ্র গোস্বামী বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মধ্যে মালাচন্দন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা করেন। "জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে" (দেবকীনন্দন—বৈষ্ণব-বন্দনা)। "ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি" (দীন কৃষ্ণদাসের পদ) প্রভৃতি

প্রথম যুগের বৈষ্ণবভক্তগণের বৈপ্লবিক মনোভাব, হরিনাম জপলেই মুক্তি ; ধর্মের এই সব সহজ ধ্বনিগুলো ছুঁৎমার্গী, ক্রিয়াকাণ্ডে আড়ম্বরপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রপাড়িত হিন্দুরা নূতন বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে যায়। আবার এই বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা হিন্দু সমাজে থেকে হিন্দুত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হয়। এদিকে নিত্যানন্দও আবার একটা সমাজ বিপ্লবাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি পার্বত্য গারো, হাজং প্রভৃতি অসভ্য ও অনার্য্যভাষী জাতিদেরও মন্ত্র দীক্ষিত করে পরম বৈষ্ণব হিসেবে গড়ে তোলেন (জানকীনাথ পালের—'দয়াল নিতাই' দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণেরা যাদের কাছে যেত না সেইসব হিন্দু ধর্ম বহির্ভূত লোকদের ও জাতিদের বৈষ্ণব করে বৈষ্ণবেরা হিন্দু জাতির পরিসর আরও বাড়িয়ে তোলেন।

এ'সময়ে যে সব সহজযানী বৌদ্ধ ছিল তারাও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে মিশে যেতে লাগলো। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা আগে থেকেই 'সহজিয়া ধর্ম' প্রচার করে বৈষ্ণব ধর্মের রাস্তা আরও সহজ সরল করে তোলেন। তারপর নিত্যানন্দ যখন বলতে আরম্ভ করলেন—"ভর যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরিবোল"—তখন সহজযানীদের হিন্দু সহজিয়াদের সঙ্গে মিশতে আর তেমন আপত্তি রইল না।[১] 'গুরুই একমাত্র সত্য'—যখন একথা উঠল তখন সহজযান পন্থীরা যারা প্রথমে ওই বুলী তুলেছিল তাদেরও আর এদের সঙ্গে মিশতে আপত্তি রইল না। কেবল বুদ্ধের বা নিজের গুরু নামের পরিবর্তে হিন্দু 'হরি' ও নূতন গুরু নাম সংযোজিত হতে লাগলো। এক্ষণে অনুমান করা হয় যে বর্তমান কালের বৈষ্ণব কর্তাভজারা বৌদ্ধ সহজযানপন্থীদের নামান্তর। সহজযানপন্থীরা বুদ্ধকেও মানতো না—কেবল মানতো একমাত্র গুরুকে। কিন্তু এর বহু পূর্বেই বুদ্ধদেবকে প্রাচীন বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতি 'হরিভক্তিবিলাস'-এ নারায়ণের অবতার বুদ্ধদেবের পূজার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। "মহাচীনাচার" নামীয় তান্ত্রিক গ্রন্থেও বুদ্ধদেব যে বিষ্ণুর অবতার তা' স্বীকৃত হয়েছে।

যা' হোক সে সময়ে যে সব বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায় রাজনৈতিক বিপ্লব জনিত মুসলমান শাসনের প্রবর্তন ও তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নির্যাতনের জন্যে সমাজের কোথাও সাহায্য বা আশ্রয় পেল না, তখন তারাই দলে দলে বৈষ্ণব হতে লাগলো—এ প্রকার অনুমানও করা হয়ে থাকে। চৈতন্যদেবের

১। M. M. Bose : The Post Chaitanya Sahajia Cult of Bengal.
৺অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়।

১।

দল তাদের জন্যে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধন করে হিন্দুধর্মের দ্বার উদঘাটন করে দেন। এরূপ প্রবাদও আছে যে খড়দহে নিত্যানন্দের সন্তান বীরচন্দ্র একদিনেই তের শত বৌদ্ধ 'নেড়া-নেড়ীকে' বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। কেহ কেহ বলে থাকেন নিত্যানন্দই এ'কাজ করেছিলেন। সে সময় থেকেই বৈষ্ণব সমাজে নেড়া-নেড়ীর দল সৃষ্টি হয়েছে। এরা বৌদ্ধ সহজযানী নেড়া-নেড়ীর দল। ভাগ্য বিপর্যয়ে তারা দিশাহারা হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দু'টি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে, তৎকালীন বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে যে মানসিক হতাশার ভাব উপস্থিত হয় তা' সে সময়ের সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জীবনের সর্বত্রই যেন একটা 'পরাজিত মনস্তত্ত্ব'র পরিচয় এই সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। এই মনস্তত্ত্ব প্রসূত হা-হুতাস ও ক্রন্দনরোল গুপ্ত যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে ও জয়দেবের বৈষ্ণব বা 'গীতিকাব্য'-এর সঙ্গে পরবর্তী বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনা করলে স্পষ্টই পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। বাঙ্গালী বৈষ্ণবে রাধা গেরুয়া বসন পরিহিতা ও যোগিনীপারা।[১]

উর্দ্দু সাহিত্যেও এ প্রকারের মনস্তত্ত্ব পাওয়া যায়। অধ্যাপক মাহাফি বলেন যে, হিন্দুদের অধঃপতনের কালে তারা ধর্মকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গ্রীকেরা তা' করেনি বলে তারা বাঁচতে পারে নি। একথা সত্য যে যেমন বৈষ্ণব কবিতাগুলোর মাধ্যমেই বাঙ্গালী তার মনোবেদনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে এবং ধর্মোন্মাদনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা প্রকাশ করে; পশ্চিমেও তদ্রূপ ব্রজভাষায় লেখা বৈষ্ণব সাহিত্যে সে প্রকার মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায়। সেখানেও হিন্দুর পতনের পর এই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।[২]

উর্দ্দু সাহিত্যে সুফীদের 'মাসুক' (beloved) আর 'আসিক' (lover) সম্বন্ধীয় কবিতার ভেতর দিয়েই সে ক্রন্দনের সুর বেজে উঠে! যেখানে তা' নেই, সেখানে প্রেম সম্বন্ধীয় কতকগুলো erotic বা প্রেমিক সম্পর্কিত গজল অথবা স্বীয় সমাজ সম্বন্ধে হা-হুতাশের ক্রন্দন দ্বারা উর্দ্দু সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে। এই হা-হুতাশের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো পরলোকগত কবি হালী ও মহম্মদ ইকবালের কবিতাবলী।

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, বসুমতী সং দীনেশচন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ; ২য় খণ্ড, 'চৈতন্য যুগ' অধ্যায়।

২। হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস—রামকুমার বর্মা।

চৈতন্য ধর্মের সামাজিক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন : "বৈষ্ণব ধর্ম ভারতে সাধারণতঃ একটা গণশ্রেণীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বাঙ্গলায় কিন্তু এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে, তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীগুলিকে এই বৈষ্ণব ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়ন থেকে অনেকটা বিমুক্ত করে। ফলে, এ আন্দোলন একটা নূতন সাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করার চেষ্টাও করে"।[১]

এইসব সামাজিক বিপ্লবের ফলে বাঙ্গলার সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। গণসাধারণ ও পতিতদের অনেকে সাম্যবাদীয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; আর অবশিষ্টের অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলো বা পুরাতন হীনযান বৌদ্ধ ধর্মকেই আঁকড়ে থাকলো। তারপর যারা রইল, তারা অভিজাত-শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ্যবাদীয় তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী হয়েই রইল; (সামান্য কয়েকজন ব্যতীত যারা চৈতন্যের শিষ্য হয়) কিম্বা সুবিধাবাদী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হলো।

একমাত্র এই সামাজিক শ্রেণীভেদ ব্যতীত, রাজনীতিক্ষেত্রে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এবং কায়স্থেরা গৌড়ের মুসলমান শাসনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেল। তার ফল হলো এই যে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গ সমস্বার্থের খাতিরে এক অখণ্ড শ্রেণী সংগঠন করেছিল। সেজন্যেই সুলতান 'ভাঙ্গী' ইলিয়াস শাহকে হিন্দু অভিজাতবর্গ বিশেষভাবে সমর্থন করতো। রাজা উপাধিধারী হিন্দু সেনাপতিরা এবং তাদের হিন্দু পাইকেরা এই সুলতানের একমাত্র ভরসা ছিল।[২] দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে একডালার যুদ্ধে বাঙ্গলার সুলতানের সৈন্য দলের সেনাপতিত্ব করেন সহদেব।[৩]

পৌরোহিত্যতন্ত্রের নিষ্ঠুর গোঁড়ামী এবং চৈতন্যের উদারতা "চৈতন্য-চরিতামৃত" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে নিম্ন বর্ণিত সংবাদে পাওয়া যায় :

"এথা শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী॥

১। B. C. Pal : Bengal Vaishnavism. 117--120.

২। জিয়া বারণীর পুস্তক।

৩। তারিখ-ই-মুবারক সাহী।

দীঘী খোদাইতে তারে মন্‌সাব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়রে তেঁহে বহু বাঢ়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজাস্থানে॥
*   *   *
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা॥
তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব-বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥
*   *   *
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে—ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
রায় আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে চলিলা।

(চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২৫ পরিচ্ছেদ)

এই গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধিরায় বিষয়ে আর কেহ কোন সংবাদ দেয় নি। হয়ত তিনি বাঙ্গলাকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় ছিলেন। অথবা গৌড় অঞ্চলের ভূ-স্বামী ছিলেন। এই জাত-মারার পশ্চাতে কিছু রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, তিনি যশোর অঞ্চলের লোক ছিলেন।[১]

পুনঃ, এরূপ প্রবাদ আছে যে গণেশের পুত্র যদু যখন তার দরবারের লোকদের সম্মুখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং হিন্দুদের বলে যে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই তার স্থানে সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত[২] করতে পারেন। তখন দরবারী অমাত্যেরা বলেন ইহার কোন প্রয়োজন নাই।[৩]

১। যশোর-খুলনার ইতিহাস।
২। ফেরিস্তা দ্রষ্টব্য।
৩। পৃথিরাজের সময় থেকে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত হিন্দু বনাম মুসলমান ধর্মীদের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। স্বার্থের ভিত্তিতে জনসাধারণ একত্রিত হয়ে কার্য করত।

পরের যুগের সুলতান হোসেন শাহ পূর্বে এক হিন্দু রাজার অধীনে চাকুরী করতেন। বাদশাহ হয়ে পূর্ব মনিবের সর্বনাশ সাধন করেন। তিনি প্রথমে রাজা সুবুদ্ধিরায়ের ভৃত্য ছিলেন। তারপর "উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ" এই অপবাদ তার নামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তার শরীর রক্ষীদের সেনাপতি ছিল কেশব বসু, গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ) সন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী, সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী) ও দবীর খান (রূপ গোস্বামী) এবং অন্যান্য হিন্দুরা আমলাতন্ত্রের মধ্যেই ছিল। হোসেন শাহের উড়িষ্যা বিজয় ও হিন্দু মন্দির ধ্বংসের সময় বড় বড় হিন্দু কর্মচারীরা তার সঙ্গে ছিল। এইভাবে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস থেকে যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায় যে ধর্মের প্রাচীর দিয়ে এ প্রদেশে অথবা ভারতের অন্য কোন স্থানে হিন্দু বনাম মুসলমান সংগ্রাম সংঘটিত হয় নি। এই যুগের ভারতীয়েরা ধর্মের ঐক্যের পরিবর্তে সমশ্রেণীর স্বার্থের ঐক্যই ভালভাবে চিনেছিল।[১] শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম রাজনীতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে চলেছিল।

মুসলমান লেখকদের লেখা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করলে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে বাঙ্গলার মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলমানেরা সমস্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে একযোগে কাজ করেছে। একবার হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গ তাদের সৈন্য নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং গৌড় দখল করে। অবশেষে দু'হাজার বাঙ্গালী পাইকের প্রাণ নাশের পর সুলতান পুনরায় গৌড় দখল করেন।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, গৌড়ের সুলতানাৎকালে বাঙ্গলার অনেক জমিদার বা সামন্ত অর্দ্ধ-স্বাধীন বা পূর্ণ-স্বাধীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। মল্লভূমির বিষ্ণুপুরের রাজারা স্বাধীন ছিল, তথাকথিত পাঠানেরা তাঁদের জয় করতে পারে নি। রাজসাহী অঞ্চলের চাঁদরায় একজন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী লোক ছিলেন। ইনি রাজকর না দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইঁহার বিষয়ে "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে বলিতেছে, "পূর্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥ যুদ্ধকারি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥ নানাদেশ লুঠি রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার" (পৃঃ ১৮৮)॥ আবার, "জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়, দুষ্ট পাষন্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়। শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা" (পৃঃ ২৯৯)॥ পুনঃ, "রামচন্দ্র রায়ের হয় দুই কুমার।

[১] পৃথ্বিরাজের সময় থেকে।

মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার" (পৃঃ ২০৯) ॥ এই সঙ্গে মুসলমান দস্যুরও সংবাদ পাওয়া যায় ঃ "আর শাখা যবন দস্যু শেরখাঁ নাম যার। শ্রীচৈতন্যদাস নাম এবে তাঁর ॥" আবার কুতুবুদ্দিন নামে এক দস্যু দলপতির নামোল্লেখ আছে। এই দল জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় (পৃঃ ১৮৫)।

বৈষ্ণব সাহিত্যে এদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চাঁদরায়ের এক লক্ষ ফৌজ ছিল। তা' হলে তিনি কি প্রকারের ডাকাত ? অনেক ব্রাহ্মণও এই সময়ে দস্যুবৃত্তি করতেন, "শুনি অশ্রু যুক্ত হইয়া কহে সর্বজন। বঙ্গদেশী দস্যু মোরা, বিপ্রদুরাচার। প্রায় চাঁদরায় কর্তা হন মো সবাকার ॥" (নরোত্তম বিলাস ১০।১৬৬)। ইহারা জাহ্নবী দেবীর নিকট হতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। চাঁদরায়ও বৈষ্ণব হয়ে অহিংস হন। এই যুগে বিজয়গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" গ্রন্থে ব্রাহ্মণ সিপাহীর উল্লেখ আছে। যুদ্ধের সময়ে ভয়ে "কানে পৈতা দিয়ে সব সন্ধ্যা মন্ত্র জপে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী চরিত্রের যে আলেখ্য দেওয়া হ'য়েছে, তার বিপরীত সংবাদ আমরা সাহিত্যে পাই।

বাঙ্গলার রাজনীতির অবস্থা যখন এ প্রকার তখন বাঙ্গলার অর্থনীতিক অবস্থা কি প্রকার সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই ইতিহাস সম্পর্কে বাঙ্গলার সাহিত্য পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সে সময় পালরাজাদের শাসনকালীন সামন্ত-তন্ত্রীয় প্রথার বিবর্তন পুরোদমে চলছে। গৌড়ের রাজাদের সনদপ্রাপ্ত বংশ পরম্পরায় রাজা উপাধিধারী সামন্তদের এই তালিকা পাই ঃ বিষ্ণুপুরের মল্লবংশ, এঁরা বলেন, গৌড়ের সুলতানদের যুগে বিষ্ণুপুর-রাজ স্বাধীন ছিল। পাঠান আক্রমণ এঁরা প্রতিহত করেছিলেন। পঞ্চকোটের রাজবংশ, মল্লুক ফতোয়াবাদের (বর্তমান ফরিদপুর) "প্রতাপেতে যম" অর্জুন-রাজা ইত্যাদি। তা'ছাড়া ঠিকাদার জমিদারদের সম্বন্ধে সংবাদও আমরা পাই। এঁরা বাদশাহের নিকট থেকে পরগণা, জেলা প্রভৃতি ঠিকা নিয়ে নির্দ্দিষ্ট খাজনা রাজসরকারে জমা দিত। বাকী যা' অতিরিক্ত থাকতো, তা' হোত তার লাভ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—বৈষ্ণব রঘুনাথের পিতা সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্য-দাসের কথা। "বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ।"[১] তা'ছাড়াও ছিলেন খেতুড়ীর নরোত্তম দত্তের পিতা, নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ, দক্ষিণের রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি। এ'সময় অনেক জমিদার অথবা বড় রাজ-কর্মচারী মুসলমানী "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হতেন। আবার অনেকে মল্লিক,

১। চৈতন্যচরিতামৃত ; চৈতন্য ভাগবত।

সরকার, মজুমদার, হালদার, তরফদার, চাকলাদার প্রভৃতি মুসলমানী শাসন বিভাগীয় উপাধি পাইতেন। এ ভাবেই সামন্ত ও জমিদারদের নিচে একটা আমলাতন্ত্রীয় শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এ'ছাড়া দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অল্প জমির কৃষিজীবি ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিত্তোপজীবিশ্রেণীর উল্লেখও সাহিত্যে পাওয়া যায়।

মুসলমান যুগের এই প্রথমার্ধে শাসন-প্রণালী মধ্যযুগের ম্যাকিয়াভেলীর নীতি অনুসারে পরিচালিত হ'ত। জনসাধারণকে আমলাদের খামখেয়ালীর উপরই নির্ভর করতে হ'ত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে তদানীন্তন সমাজের চিত্র ও জমিদার এবং আমলাদের সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র আছে। কবি নিজে চাষাবাদ করে জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে গ্রামত্যাগী হন। কবি বন্য পশুর মুখ দিয়ে সে সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। ভল্লুক কেঁদে কেঁদে বলছে—

"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভল্লুক
নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক ॥"

এস্থলে কবি নেউগী, চৌধুরী প্রভৃতি আমলাতন্ত্রের লোকদের এবং তালুকদার বা জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণকে ঈঙ্গিত দিয়ে বলেছেন।

এই যুগে বৈষ্ণব ও শাক্তদের সাহিত্যে ধনী বণিকদের উল্লেখ আছে। সপ্তগ্রাম, নবদ্বীপ প্রভৃতি সহরের শ্রী ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। কবিকঙ্কণে কবি বর্ণনা করেছেন যে ধনপতি, চাঁদ বেনেকে মালা চন্দন দিয়ে সমাজের শ্রেষ্ঠ বলে সম্মান দেওয়ায় অন্যান্য নিমন্ত্রিত বেনেরা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন ঃ

—"এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে ॥
বণিকসভায় আমি আগে পাই মান।
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥"

এর উত্তরে ধনপতি বলছেন ঃ

"সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর ॥
ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার জাত খড়াই টাকা ॥"

এ' বর্ণনায় বংশ মর্যাদা অপেক্ষা ধন মর্যাদার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কবিকঙ্কণের কালে মুঘল রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তখনও পূর্বের জের চলছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তখন গরীব ও পতিতদের অবস্থা কিরূপ

ছিল ? কবিকঙ্কণ, কালকেতু ও ফুল্লরার দুঃখ বর্ণনার মাধ্যমে সেই পতিতদের অবস্থাও বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশী চণ্ডীর কাছে বলছে—

"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনী ॥
* * *
প্রথম বৈশাখমাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥"

জ্যৈষ্ঠে—"বৈঁচির ফল খেয়ে করি উপবাস।"
শ্রাবণে—"বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ ॥"
আশ্বিনে—"উত্তম বসনে বেশ করয়ে বণিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥"
কার্ত্তিকে—"নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥"
মাঘে—"ফুল্লরার আছে কত কর্মের বিপাক
মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥"
ফাল্গুনে—"বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥"

এরূপে প্রত্যেক মাসে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর লোকে যখন নানা প্রকারের সুখভোগ করছে তখন প্রতি মাসেই "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।"

শস্যশ্যামলা, বিবিধ ধনসম্পদে সম্পদ-শালিনী বাঙ্গলায় গরীব ও পতিতেরা চিরকালই দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়ে আছে। বাঙ্গলার সাহিত্যিকরা চিরকালই রাজার ও ধনীদের বিষয় নিয়ে নানা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গরীব ও পতিতদের বুকভাঙ্গা কান্না, হাহাকার রব কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। পূর্বজন্ম অথবা অতীতের কর্মফলেই মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণাদি পেয়ে থাকে— এই মতটি বৌদ্ধ ও হিন্দুদের নৈতিক জ্ঞানকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই জন্য ভারতীয় সাহিত্য শ্রেণীগত সাহিত্যের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কবিকঙ্কণ ফুল্লরার মুখ দিয়ে পতিতের যে দুঃখ বর্ণনা করেছেন, মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'ইবন্ বেটুটা' নামায় জনৈক আরব পর্যটক তারই সমর্থন করে গেছেন। তিনি বলেছেন: "বাঙ্গলাদেশ ধনধান্য ও বিবিধ প্রকারের আহার্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে কিন্তু সাধারণ লোক অতীব দুঃস্থ ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ, এমন কি তাদের গাত্রাবরণ পর্যন্ত নাই।"

বাঙ্গলার মুসলমান যুগকে যদি এই দেশের মধ্য যুগের শেষার্দ্ধ বলে ধরা যায়, তা' হলে বর্তমান বাঙ্গলার সমাজের ভিত্তি এই সময়েই পত্তন হয়েছে

বলে বুঝতে হবে। এই যুগসন্ধিক্ষণে একদিকে অদ্বৈত পণ্ডিত চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করে উদার বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি করেন এবং পতিত ও বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রপীড়িত গণসাধারণকে হিন্দু সমাজের মধ্যে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল দলগুলো অর্থাৎ সমাজের বনিয়াদী স্বার্থের শ্রেণীগুলো আপন আপন পুরণো স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে চেষ্টিত হলো। সেই সময় রঘুনন্দন চৈতন্যের সমসাময়িক হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। আর তার পূর্ব যুগে দায়ভাগ প্রণয়নকারী জীমূতবাহন এবং মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টও জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে অবশ্য জীমূতবাহন সম্পর্কে মত হলো এই যে জীমূতবাহন একাদশ শতাব্দীর লোক।[১]

এই রক্ষণশীলদল নিজেদের বনিয়াদী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করলেন তার ভেতর কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনু সাহিত্যের টীকা রচনা করার সময় কুল্লুকভট্ট 'অনার্য্য' শব্দের অর্থ 'শূদ্র' করলেন। রঘুনন্দন আরও সুর চড়িয়ে বললেন যে বাঙ্গলায় আছে কেবল দুটো বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। এই উক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির বাইরের সকল লোককে 'শূদ্র' বলে অভিশপ্ত করা হলো। বল্লাল-চরিতে রাণক ও রাজপুত্র শ্রেণীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং এ'তেও পরবর্ত্তী যুগের প্রেম-বিলাসে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' জাতির উল্লেখ রয়েছে। শেখ শুভোদয়া গ্রন্থে 'রাজপুত্র' জাতির উল্লেখ আছে। ঐ পূর্বোক্ত উক্তির সরলার্থ হলো যে ব্রাহ্মণই আর্য্য অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অধিকারী। এই জাতির বহির্ভূ'ত সকলেই অনার্য্য ও শূদ্র ; তা'রা বৈদিক সভ্যতার অধিকার ও সুবিধা ভোগের বাইরে। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের সময় যখন অন্য কোন জাতি রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থনের অভাবে এই মতের প্রতিকূলাচরণ করতে অক্ষম ছিল, তখন রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার জন্য মনুকেও ছাড়িয়ে গেলেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ যদি আমরা আলোচনা করি যে মধ্যযুগীয় সমাজের পরিস্থিতি দেখেই তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা উপরোক্ত অনুমান করেছিল, কারণ তারা পাঠ করেছে যে, বিষ্ণুপুরাণে মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয় ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা বৌদ্ধ প্লাবনের সময়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করার ফলে প্রাচীন বর্ণাশ্রমপদ্ধতি ভেঙ্গে যায়। তার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজে এই

১। **Kane : History of Dharmasastra. Vol. IV';**
Panchanan Ghosh : Calcutta Law Journal. Vol. 25 : 1917.
B. N. Datta : Hindu law of Inheritance.

দুই বর্ণের অভাব হওয়াতে সে সময়ে ব্রাহ্মণদের মনে এ'রূপ সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ভ্রান্ত সংস্কারকে সমর্থন করবার জন্যে কোন প্রমাণযুক্তি কোন ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়নি বলেই এ'রূপ গোঁজামিল দিতে হয়েছিল। আমরা জানি যে বৌদ্ধ-যুগেই বেশীর ভাগ স্মৃতি রচিত হয়েছিল। তা'হলে বলতে হয় যে এই পরিস্থিতির সেই সময়েই উদ্ভব হয়েছিল এবং এই শ্লোকের সে সময়ের স্মৃতিগুলোতেই স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা' না হয়ে মুসলমান যুগেই এ গোঁজামিলের উদ্ভব হয়। আমরা এ' অনুষ্ঠানের কি অর্থ করবো? মুসলমান আক্রমণের পূর্বে 'নূতন ক্ষত্রিয়' সৃষ্টি হতে আমরা দেখেছি। (শ্রীযুক্ত বৈদ্যের রাজপুত ও মারাঠাদিগকে বৈদিক ক্ষত্রিয়দের খাঁটি বংশধর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতীত হয়েছে) কিন্তু সে সময়ে এ' শ্লোকটির উদ্ভব হয়নি। এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনদের বিপক্ষে নিজেদের তরফদারীর লোক সৃষ্টি করবার জন্য নূতন-ক্ষত্রিয় উদ্ভব করা হয়েছিল; আর পৌরোহিত্য আধিপত্য কায়েম রাখার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই কি তখন এ' শ্লোকের সৃষ্টি হয়নি? মুসলমান যুগে নবসংগঠিত হিন্দু সমাজকে নিজেদের তাঁবে রাখার জন্যেই কি এই গোঁজামিল দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল? মনে হয় রঘুনন্দন উপরোক্ত গোঁজামিলেরই প্রতিধ্বনি করে বাঙ্গলায় 'কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র'—এই দু'জাতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গলার বাইরে ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবীদার জাতিসমূহ আছে। এ' কি রকমে সম্ভব হয়? বাঙ্গলার বাইরের বেনিয়া ও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকেরা উপবীতধারী। বাঙ্গলায় 'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য' নেই বল্‌লেও বাঁকুড়ার মল্লজাতি, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, খাতড়ার রাজবংশ, মণিপুরী ও তিপ্রা জাতিরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে থাকেন এবং উপবীত ধারণও করেন। রঘুনন্দনের পূর্বে এবং সমকালেও ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীধারী লোক বাঙ্গলায় ছিল।[১] মনে হয় যেখানে যে সব লোক ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী ক'রে স্বীয় শক্তিতে তা' বজায় রাখতে পেরেছে সেখানে তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ দ্বারা সে' দাবী স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়ে নিয়েছে; আর সেই স্থলেই নাগোজী ভট্টের বংশের ন্যায় ব্রাহ্মণ আপন যজমানের সুবিধার জন্যে স্মৃতির ভিন্ন অর্থ করেছেন। প্রবাদ আছে, যশোহরের প্রতাপাদিত্য "ক্ষত্রিয়" স্বীকৃত হয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীয় রাজ্যাভিষেক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন[২]; বোধহয় বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবীকে কায়েমী

১। বল্লালচরিত ও প্রেমবিলাস।

২। চন্দ্রদ্বীপ ঘটককারিকা।

করবার জন্যে শক্তিমান লোকের অভাব ছিল বলেই রঘুনন্দনের গোঁজামিল আজও বলবৎ আছে। হিন্দু ভুঁইয়া রাজারা স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করতে পারলে হয়ত এই দাবী কায়েমী হোত। এ'সব ব্যাপারের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম ভীষণভাবে কাজ করেছে।

যাহোক এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক্। বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির "মীতাক্ষরা" নামক টীকা হিন্দু ভারতের অন্যত্র আইনরূপে গৃহীত হয়েছে। মীতাক্ষরায় যাজ্ঞবল্ক্যের "পৈত্রিকভূমি উপাও এবং দাস, পিতা-পুত্রের সমানাধিকার"-রূপ মত সমর্থিত হয়েছে। যখন সমগ্র হিন্দু ভারত এই আইন গ্রহণ করেছিল, সে সময় দায়ভাগে পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানের সম্পূর্ণ অধিকার (Absolute right) সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য ইংরেজের Supreme court এই মতকে, পাকাপোক্ত কর্মঠ ব্যবস্থাকে বাঙ্গলার কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করেন। এই মত মনু ও নারদের মত প্রসূত। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু 'দায়ভাগ' পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াও যৌথপরিবার প্রথা (Joint family System) বজায় রেখেছে, যদিও তাহা মীতাক্ষরা হতে বিভিন্ন। এইরূপ প্রমাণ আছে যে, 'দায়ভাগ' লৌকিক আচারকেই সমূর্ত করে তুলেছে। তা' হ'লে এর অর্থ কি এই নয় যে বাঙ্গলায় বহুপূর্বে সগোত্রীয় দায়াধিকার (Agnattic Succession) আইন ভেঙ্গে নিকটস্থ আত্মীয়ের (Cognatic Succession) অধিকাররূপ আইন প্রচলিত হয়েছিল এবং মীতাক্ষরা লিখনের বহু পূর্বেই বাঙ্গলা একজাতীয়তা অর্জন করেছিল।[১] ইহা প্রমাণিতও হয়েছে যে দায়ভাগের মতগুলো বাঙ্গলায় পূর্বে প্রচলিত ছিল।[২] এই প্রকারে দায়ভাগ সমাজের উচ্চতর বিবর্তনের পরিচায়ক। বাঙ্গলা বহুপূর্বে কৌম প্রথা ভেঙ্গে জনপদ প্রথা বিবর্তন করে একরাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ'বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজাতীয়তা প্রাপ্ত ইউরোপীয় আইন-গুলোর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

'দায়ভাগ' যে মুসলমান আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত তা' একেবারেই সত্য নয়, এ'কথাও এখানে স্মরণ রাখা উচিত। যা' হোক, লোকের যখন পৈত্রিক

১। B. N. Datta : Hindu Law of Inheritance (An anthropological study).

২। Kane : History of Dharmasastra, Vol. I.

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার ব্যবস্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নানা লোকের অধিকার এসে তাতে বর্তায়। এ'জন্যে দায়ভাগে পুত্র, কন্যা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের অংশ প্রদত্ত হয়। কিন্তু বনিয়াদী স্বার্থ এ'তে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে অর্থনীতির সাম্য রক্ষা করার একটি পন্থা হলো চুল-চেরা করে সমস্ত ভাগ করে দেওয়া। সম্পত্তির সমানাংশে বিভক্তকারী একদল সাম্যবাদী আছেন যাঁরা সম্পত্তিকে সমান ভাগে ভাগ করে সামাজিক সাম্য আনয়ন করতে চান। মুসলমান 'সরিয়াত' আইন ও ফরাসী বিপ্লবের পরের 'নেপোলিয়নীয় আইন' (Code Nepolean) এই প্রকারের। দায়ভাগ উপরোক্ত সাম্যবাদীয় আইন নয়; তবে মীতাক্ষরা থেকে অনেকখানি আধুনিক, এর দ্বারা অভিজাতদের এবং অন্যান্য বিভিন্ন বনিয়াদী স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এ'জন্যই কি রঘুনন্দন এসব স্বার্থের তাড়নায় বেদের শ্লোক জাল করে "সতীদাহ" ব্যবস্থা বাতলে দেন ? অবশ্য এ'বিধি তিনি বাধ্যতামূলক বলে ব্যবস্থা দেননি। সতীদাহ প্রথার পশ্চাতে যে অনেক সময় অর্থনীতিক স্বার্থ জড়িত থাকতো তা' সত্যসন্ধী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। বাড়ীর কোন বধূ বিধবা হ'লে তাকে সম্পত্তিচ্যুত করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা করে সরিয়ে দেওয়া। এ'জন্যই শোকাতুরা সদ্য বিধবাকে ধর্ম, পরকাল-প্রথা ও লোক-লজ্জার ভয় দেখিয়ে সহমৃতা হ'বার অঙ্গীকার করিয়ে ঢাকঢোল বাজানোর মধ্যে জীবন্ত পোড়ান হোত। আবার বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী সতীদাহ হ'ত।

রঘুনন্দন তাঁর 'অষ্টবিংশতি-স্মৃতি তত্ত্বে' দায় বিভাগীয় অধ্যায়ে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে ধনবিভাগ বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়েছেন। তা' থেকে বোঝা যায় যে তিনিও পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানদের সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করেছেন। দ্বিজদের অসবর্ণা কন্যা বিবাহে নিষেধ করেছেন। কিন্তু রঘুনন্দনের দেড়শত বছর আগে বৃহস্পতি রায়মুকুট তাঁর 'স্মৃতিরত্নহার' পুস্তকে ব্রাহ্মণদের চতুর্বর্ণে বিবাহের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ৺শাস্ত্রী বলেন—"বোধহয় বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা চারিবর্ণে বিবাহ করিতেন। কারণ তিনি বর্ণসন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত তাহা হইলে তাহাদের কিরূপে অশৌচ পালন ব্যবস্থা হইবে তিনি তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্মৃতির বইএ এইরূপ অশৌচের উল্লেখ নাই। কারণ এখন বর্ণ সন্নিপাতই নাই। নেপালে এখনও ব্রাহ্মণের চারিবর্ণে বিবাহের কথা আছে, এবং চারিবর্ণের সন্তানের দায়ভাগের কথাও

আছে। বৃহস্পতির সময়ে প্রথাটা বোধহয় উঠিয়া আসিতেছিল—কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই"।[১]

বৃহস্পতি রায়মুকুট পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌড়াধীপ রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদুর নিকট বিশিষ্টভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। এই শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণের চতুর্বর্ণের বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিন্দু যতই নিজের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাতে লাগলো এবং মুসলমান আধিপত্য দেশে যত অধিক সুদৃঢ় ও কায়েমী হতে আরম্ভ করলো, পুরোহিত-তন্ত্র হিন্দু-সমাজে স্বীয় আধিপত্য বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ছুঁৎমার্গকে ততই কঠোর ও বৃদ্ধি করতে লাগলো। মুসলমান যুগের প্রথমার্ধে, অর্থাৎ মুঘল শাসনের পূর্বে বাঙ্গলায় পূর্ণমাত্রায় সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ের সামন্তেরা এবং তাদের নিম্নস্থ জমিদারেরা হয় মুসলমান নয় হিন্দু ছিল। এই যুগের নানা আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ার ফলে অতীতকে ছেঁটে ফেলে 'নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন' হয়। একদিকে, অদ্বৈত-চৈতন্যের দল বনিয়াদীস্বার্থ ভেঙ্গে সকল শ্রেণীর লোকের ভেতর ধর্মের বন্ধনে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। অপর দিকে রঘুনন্দনের দল ব্রাহ্মণ্যবাদের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অভিজাতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট রইলেন। সেজন্যেই সামন্ততন্ত্রীয় যুগের প্রথানুযায়ী বর্ণাশ্রমী হিন্দুর গোঁড়ামী ক্রমশই বাড়তির পথেই চলছিল। আর এসব টানাহেঁচড়ার ফলেই বাঙ্গালী জাতি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হ'ল মুসলমান, বাকীদের মধ্যে একদল অভিজাত তান্ত্রিক, আর অপরদল হয়ে গেল (সাধারণ) বৈষ্ণব। তা'ছাড়া যে দলটি মুসলমান হলো না, বরং বৌদ্ধধর্ম আঁকড়ে পড়ে রইল, তারা শাস্ত্রীর মতে অস্পৃশ্য হয়েই রইল। তার মধ্যে বাঙ্গলার হিন্দুদের প্রায় অর্ধেক লোক অস্পৃশ্য ও 'জলচল' নয়; এরা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল অথবা এখনও গুপ্তভাবে আছে। ইংরেজ সরকারের সেন্সাস রিপোর্টে অস্পৃশ্যতা বিষয়ে ভূতপূর্ব গভর্ণমেণ্ট তাদের তপশীলভুক্ত করেছেন, এরূপ হিসাব পাওয়া যায়। যারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত কোন প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে না, তাদের সন্তান-সন্ততিই আজ পর্যন্ত অস্পৃশ্য ও 'জলচলে'র বাইরে আছেন। এখানে আরো বলা যায় যে অস্পৃশ্যতা অনুষ্ঠানটি পৃথিবীর সব জাতের মধ্যেই আদিমকালে ছিল। ইহা "টটেমবাদ ও টাবু" প্রভৃতি বিধানিষেধের ফলপ্রসূত।

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৩৮ ভাগ, ছয় সংখ্যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

ভারতে উপনিষদের যুগে এটা প্রথম দেখা যায়। অবৈদিক ধর্মসম্প্রদায়গুলো ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকালে অবজ্ঞাত এবং হেয় হয়েই থাকে। এর জন্যেই প্রাচীন বিধিনিষেধ মিশ্রিত হয়ে বর্তমানের সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। টাবু নিষেধে শ্রেণী লক্ষণ বিশেষভাবে কাজ করে।[১]

বাঙ্গলার সমাজ নূতনভাবে সংগঠিত হবার পূর্বে বিশদভাবে তার সম্ভবপর চিত্র ৺শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।[২] তাঁর মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় অনেক ধর্ম সম্প্রদায় ছিল। তাদের ভেতর নয়শত ঘর ব্রাহ্মণ, পশ্চিম দেশাগত একশত কায়স্থ এবং এই গোষ্ঠীগুলির নিম্নজাতীয় দাসগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিল।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে বিশেষতঃ তমলুকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম মত প্রচলিত ছিল। কারো কারো মতে হীনযান মত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। মহাযান মতটি উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ-পুরোহিত ও উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিবাহিত পুরোহিতদের মধ্যে 'বজ্রায়ন' প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদের অনেকে এবং ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ আবার 'নাথধর্ম' মানত। এই সময়ে সহজিয়া (সহজযান) ধর্মমতটি মধ্যবিত্ত বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষভাবে চলতো আর অল্পভাবে চলতো নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে। শেষতঃ তান্ত্রিক ধর্ম সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীগুলোর মধ্যে এ'টা সহকারী ধর্মরূপে ছিল এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছিল মুখ্যভাবের ধর্ম হিসেবে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই বিশ্লেষণাত্মক চিত্র সর্ববাদীসম্মত নাও হতে পারে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যখন হিন্দুসমাজ পুনঃ সংগঠিত হতে আরম্ভ করে, তখন থেকে উচ্চ শ্রেণীদের তান্ত্রিক মত গ্রহণ করতে দেখা যায়। ৺শাস্ত্রীর মতে বৌদ্ধযুগে উচ্চশ্রেণীগুলো মহাযানপন্থী ছিল; এরাই পরে তান্ত্রিক হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠে যে বৌদ্ধ থেকে তান্ত্রিক হয়ে যায় কী প্রকারে? পূর্বের মত এই—বৌদ্ধ সম্প্রদায় হ'তেই তান্ত্রিক মতটির উদ্ভব হয়। পরে ব্রাহ্মণেরা এত মতটিকে নিজেদের করে নেয়। কিন্তু ৺শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তান্ত্রিক মতটি শকদের 'মগ' পুরোহিতদের দ্বারা ভারতে প্রবর্তিত হয়। শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন যে, তন্ত্রে "চীনাচার" আদি আচার স্পষ্টই বিদেশী। হালে জনৈক পণ্ডিত পরীক্ষা করে দেখেছেন যে 'আগম' শব্দটি বৈদেশিক। তা

১। B. N. Datta : Studies in Indian Social Polity.

২। Modern Buddhism and its Followers in Orissa by Nagendra Nath Bose ; Introduction by H. P. Sastri.

থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে এ আচারও বিদেশাগত।[১] কিন্তু ঐ বিষয়ে মতভেদ আছে।[২] বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেরা উভয়েই এক উৎপত্তিস্থল থেকে 'তন্ত্র' মতটি প্রাপ্ত হন। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এটা শীঘ্রই বিস্তার লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মত ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অধিকার বঞ্চিত স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের জন্যেই এই মত গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তান্ত্রিক মতটি ব্রাহ্মণদের মধ্যে লোকপ্রিয় করে তোলেন। এ' থেকে বোঝা যায় যে বাঙ্গলায় মুসলমান-পূর্ব আমলে যারা আমলাতন্ত্রীয় অথবা দরবারী লোক ছিল তারা ছিল মহাযানপন্থী; পালরাজারাও তাই ছিলেন। এঁরাই পরবর্তীকালে তন্ত্রমত গ্রহণ ক.রন এবং হিন্দুসমাজ পুনঃ সংগঠনকালে স্বতঃসিদ্ধভাবে হিন্দু তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। বিদেশাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিল এবং এরা রাজদরবারী অথবা আমলাতন্ত্রের লোক হিসেবে তৎকালীন অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুসলমান আক্রমণের ফলে সমাজ যখন 'ওলটপালট' হয়ে যায় তখন ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধরাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাহারো মতে তুর্কি-মুসলমানদের বৌদ্ধ বিদ্বেষ মধ্য-এশিয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়ের ৫০।৬০ বছর পরই জেঙ্গিস খাঁর মঙ্গোল সৈন্যদল মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া বিধ্বস্ত করে দেয় ও অনেক মুসলমান রাজত্বও ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু জেঙ্গিস খাঁর লোকেরা বৌদ্ধ ছিল না। সেজন্যে তুর্কি-মুসলমানদের হিংসামূলক ভাব ও আচরণে বৌদ্ধ বিদ্বেষের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। পক্ষান্তরে আরবেরা সপ্তম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধদের বিপক্ষে আফগানীস্তানে লড়ছিল। তারা বৌদ্ধদের বুদপুরস্ত (বুদ্ধ পূজক) বলত। বোধহয় ভারতে বৌদ্ধ-রাজশক্তির অভাবে বৌদ্ধেরা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে পারেন নি। অনেকে আবার বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে বৌদ্ধ প্রতিকূলতা দুর্বল হয়েছিল। 'চাচনামা' অনুসারে অবশ্য বৌদ্ধেরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। আবার লামা তারানাথের বিবরণ অনুসারে মগধের একদল ভিক্ষু তুর্কীদের সঙ্গে জুটেছিল। ৺শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তৎপর বৌদ্ধমঠের জমিগুলি মুসলমান শাসকেরা বাজেয়াপ্ত করে নেয়, গ্রন্থাগার পুড়িয়ে

১। হিন্দী সাহিত্যকা ভূমিকা : পৃঃ ৯।

২। B. N. Datta : Dialectics of Hindu Ritualism ; pt. II.

দেয় ও সন্ন্যাসীদের হত্যা করে। লেখক নিজেও দেখেছেন যে রাজগৃহ, সোমপুরীবিহার ও সুবর্ণবিহারের আশপাশের লোকেরা মুসলমান।

নালন্দায় লাইব্রেরী কয়েকবার বিধ্বস্ত হয়। P. al. Jor-এর তিব্বতীয় পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে ধর্মসগন্ধ অর্থাৎ নালন্দার বৃহৎ লাইব্রেরী তিনটি মন্দিরে রক্ষিত ছিল। তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) ভিক্ষুদের দ্বারা অগ্নিসংযোগে তাহা ধ্বংস করা হয়। মগধের রাজমন্ত্রী কুকুতসিদ্ধ নালন্দায় একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে ধর্মোপদেশ প্রদানকালে জনকতক তরুণ ভিক্ষু দু'জন তীর্থিক ভিক্ষুকের গায়ে নোংরা জল নিক্ষেপ করে। তার ফলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে 'রত্নসাগর', 'রত্নধনুক' আর নয়তলাযুক্ত 'রত্নদধি' নামক তিনটি মন্দির অগ্নি-সংযোগে ধ্বংস করে। উক্ত তিনটি মন্দিরেই সমষ্টিগতভাবে ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাগার ছিল।[১] এইভাবেই আর্থিক সাহায্যের অভাবে সংঘারামগুলো উঠে যেতে লাগলো, লোক আর ভিক্ষুও হ'তো না। তখন হয় মুসলমান, নয় ব্রাহ্মণ্যবাদী এই দুইয়ের এক হওয়া ভিন্ন উপায়ও ছিল না। লামা তারানাথের মতে গোরক্ষনাথের শিষ্যেরা তুর্কি আক্রমণের পর তীর্থিক রাজাদের কাছে সম্মান পাওয়ার জন্যে ঈশ্বরোপাসক (দেব ভাজু) হয়ে ওঠে। তারা বলতো যে এর ফলে তুর্কিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। উত্তর ভারতে নাথ সম্প্রদায়ের পরিস্থিতিই উক্ত উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করে। এই সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা মহাযানপন্থীয় তান্ত্রিক ধারা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী তান্ত্রিক হয়ে উঠে। তার ফলে তাদের সমাজে শ্রেণীগত শাসন ঠিক থাকে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হয়েই ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্কীর্ণতা এমন যে যারা তাদের নৈষ্ঠিক শিষ্য হবে তারাই ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করতে পারবে। এই সময়েই বাঙ্গলায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণ বিভাগ দেখতে না পেয়ে রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলকেই শূদ্রের পর্যায়ে ফেল্‌লেন। আর সেজন্যে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। যে সব বৈশ্য আচার সমন্বিত ও বৈশ্য ব্যবসায়ী জাত ছিল, ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তারা বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করলো এবং 'নবশাখা' বলে গৃহীত হলো। এ'রা তখন 'জল-আচরণীয়' বলে গণ্য হলো। নবশাকের আসল নাম কিন্তু "নবশায়ক"। বল্লালচরিতে তাই পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে "নবশায়ক"

১। History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India—by P. al. Jor. Edited by S; Das. p. 92.

জাতিদের নামের তালিকা পরাশর সংহিতায় আছে। (লেখকের "ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ইতিহাস" ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।) "সম্বন্ধ নির্ণয়" নবশায়কদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরাশর সংহিতা থেকে উপাখ্যান উদ্ধৃত করে বলেছেন যে যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন গোপ, নাপিত প্রভৃতি ন'টি জাতি তাকে সাহায্য করে। এজন্যে তিনি তাদের "নবশায়ক" অর্থাৎ ন'টি তীর এই আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু এই পুস্তক অর্বাচীন ও অপ্রামাণিক, ইহা পরাশর স্মৃতি হতে পৃথক। বল্লালচরিত পাঠে এটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে এই জাতিগুলো পূর্ব থেকেই বাঙ্গলায় ছিল এবং সুবর্ণবণিক, কুম্ভকার, মালাকার, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতিগুলো যে অহিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল সে সম্পর্কে কোন প্রমাণও নেই। "জল-অনাচরণীয়" হলেই যে অব্রাহ্মণ্যবাদীয় হবে তারও কোন যুক্তিসম্মত হেতু বা প্রমাণ নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বর্ণাশ্রমবাদীয় হিন্দু সমাজের একাংশ 'জল-অনাচরণীয়' ও অস্পৃশ্য—কিন্তু তার জন্যে তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। যা হ'ক, যেসব বৌদ্ধেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করে রইল তারা 'অনাচরণীয়' হয়ে আজও অস্পৃশ্য রূপে গণ্য। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ধর্মঠাকুর পূজকেরা অস্পৃশ্য ; শীতলা ঠাকুরের পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়, অথচ গলায় পৈতে নেই, কিন্তু শরীরে তাম্র ধারণ করে আছেন (ধর্মঠাকুরের পূজকেরাও শরীরে তাম্রধারণ করে থাকেন)। এঁরা বেশীর ভাগই হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁরা ধর্মঘোরীয়া যোগী এবং তাম্রলিপ্ত দেশের হীনযানী সন্ন্যাসীদের শেষ প্রতিনিধি বলে অনুমিত হয়।[১] এখনও বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে ধর্মঠাকুরের পূজো বিশেষভাবে হয়। পুরাতন বিবাহিত বৌদ্ধ পুরোহিতেরা এখন বর্ণব্রাহ্মণ হয়েছেন। আবার কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "ধর্ণবিপ্র হয় মঠস্বামী"—এই উক্তির উপর জোর দিয়ে ৺শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, বর্ণব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ পুরোহিতদের বংশধর। কিন্তু বৈষ্ণবদের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কান্যকুব্জ থেকে আগত অনেক ব্রাহ্মণ এই পেশা অবলম্বন করে "গোয়াল, কুমার, যুগী, তাঁতীর পেশা কষ্ট-শ্রোত্রীয় আর বংশজেরগণ। তার মধ্যে বহু হৈল বর্ণের ব্রাহ্মণ।"[২] এ'রা আবার অগ্রদানীও হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা অনাচরণীয়দের চেয়েও তাদের পুরোহিতদের ওপর বেশী ক্রুদ্ধ। নেপালেও সেরকম যজমান অপেক্ষা

১। N. N. Basu : Modern Buddhism and its Followers in Orissa. Introduction by H. P. Sastri ; p. 19.

২। নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস, পৃঃ ২৮৯।

তাদের পুরোহিতদের উপর ব্রাহ্মণদের রাগ বেশী। এই সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীন জৈন সম্প্রদায় আজ পশ্চিমবঙ্গে "সরাক" নামে আত্মগোপন করে আছেন। তাঁরা এখন প্রকাশ্যে শৈব কিন্তু জৈন আচাররত। তাঁরা নিরামিশাষী। যদিও আজকাল কেহ কেহ আমিষ ভোজনও করেন। কলকাতায় আস্‌লে তাঁরা জৈন মন্দিরে যান। কবিকঙ্কণে সরাকদের উল্লেখ আছে ঃ "সর্ব বিষয়ে তাঁরা নিরামিষ"। এঁরা বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মানভূম জেলায় বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার দু 'থাক' আছে। ইঁহারা কৃষিজীবি জাতি ; পদবী—মাঝি, পরামাণিক, মণ্ডল। বাঙ্গলায় সর্বপ্রথম আর্য্যধর্মের একটা শাখার অনুপ্রবেশের ধ্বংসাবশেষ এঁরা।

এ পর্যন্ত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের একটি সম্ভবপর চিত্র আমরা পেলাম। এই সমাজ উচ্চ শ্রেণীভেদ ও স্বার্থাবলম্বনে সংগঠিত। এই নূতন শ্রেণীভেদ, এই পদ্ধতির প্রকাশের মাধ্যমে দেখা যায় যে পতিতেরা পতিত ও পদদলিতই রয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামী "নূতন হিন্দুদের" কাছে একান্ত অসহনীয় হয়েছিল বলেই তাঁরা চৈতন্যের শিষ্য হতে লাগল। এ সময়ে সুবর্ণ বণিকদের ন্যায় উপেক্ষিত জাতিরাও বৈষ্ণব হতে আরম্ভ করল। বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলনের প্রথমভাগে বুর্জোয়া শ্রেণীই এর দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে সুবিধা বুঝে 'নবশায়ক' জাতির সাধারণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যায়।[১] বৈষ্ণব ধর্ম এখনও পতিতদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যারা মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান হননি, তাঁরা বৈরাগী বাবাজীদের শিষ্য হয়ে ক্রমশঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন।

কিন্তু যে আদর্শের আলো নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, সে আদর্শ তাঁরা রক্ষা করে চলতে পারেননি। বৈষ্ণব-সমাজ মধ্যেও আবার সেই আভিজাত্যাভিমানী শ্রেণী উত্থিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের আভিজাতীয় অহঙ্কারকে অটুট ও অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আবার ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছেন। 'বর্ণাশ্রমধর্ম' এখন তাদের ভিতর পুনরায় দৃঢ়মূল হয়েছে। এমন কি 'জাত হারালে বোষ্টম' জাত উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবরাও সমস্ত ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা 'দশকর্ম' সম্পন্ন করেন। অনেক 'জাতবৈষ্ণব' ব্রাহ্মণ বংশের আভিজাত্যের দাবী করেন এবং পৈতে পরে স্বাতন্ত্র রক্ষা করেন (স্বাস্বত ব্রাহ্মণ)। ছুঁৎমার্গ বিশেষভাবে রক্ষিত ও প্রতিফলিত হয়। আচণ্ডালে আর প্রেম বিলান হয় না, মুসলমান আর বৈষ্ণব সমাজে

১। রজনী চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড : পৃ: ১৩৫।

স্থান পায় না। অবশ্য কালেভদ্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায় ইহা লেখকের সাক্ষাৎ জানা কথা।

প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিতর বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশ করেছে বলে ব্রাহ্মণ্যবর্ণাশ্রম অভিমানী বৈষ্ণবেরা নিত্যানন্দের বিবাহ-জনিত গোলমালের ফলে তাঁর পুত্র বীরচন্দ্রের "জাতে ঠেকো" হবার দোষকে এখন নানা উপায়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।[১] রূপ ও সনাতনকে ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে। যদিও সনাতন নিজে চৈতন্যকে বলেছেন ঃ "সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়। মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়।।" তিনি আরও বলছেন ঃ "নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম।" এজন্যে তিনি জগন্নাথের মন্দিরে কখনও প্রবেশ করেন নি। "মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।"[২] বোধহয় রূপ ও সনাতন জাতিচ্যুত মুসলমান ভাবাপন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের আদি আবাসস্থল যশোরের চেঙ্গুটিয়া পরগণায় পীরালীদের বাস।[৩] হরিদাসকে এখন ব্রাহ্মণবংশজাত বলা হচ্ছে। কিন্তু কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে সপারিষদ মহাপ্রভুর যে চিত্র আছে তাতে হরিদাসের প্রতিকৃতি খাঁটি রোহিলার (পাঠান) চেহারার সঙ্গে মিলে যায়। রূপ, সনাতন ও হরিদাস কখনও অন্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে একপংক্তিতে ভোজনে বসতেন না এবং পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। বোধহয় অবিদিত মনের ভেতর "আমি মুসলমান" ভাবটা জেগে উঠত। সে কারণেই সাধারণ হিন্দুর কাছ থেকে তাঁরা একটু তফাৎ থাকতেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেতর যে শ্রেণীর জ্ঞানাভিমান বোধ জেগেছে ও আচণ্ডালে প্রেম বিলানোর আদর্শের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে তার অর্থ অন্য কথায় এই যে বৈদিক পুরোহিত শ্রেণীর শ্রেণীচেতনা (class consciousness) মণ্ডিত আদর্শ যা বিগত তিন হাজার বছর ধরে জাগ্রত আছে এবং বৌদ্ধ বিপ্লবকে দমিত ও পরাজিত করে বিজাতীয় ধর্ম বিপ্লবের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রাম করছে—তাহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমাজ বিপ্লবকে আবার নিজ শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করে নিচ্ছে। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আধিপত্যবাদ (আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার প্রচেষ্টা) বৈষ্ণব সাম্যবাদকে হটিয়ে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

১। লালমোহন বিদ্যানিধি : সম্বন্ধ নির্ণয়।
২। চৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্যলীলা।
৩। নগেন্দ্রনাথ বসু : পীরালীকাণ্ড।

বৈষ্ণবধর্মের সাম্যবাদ বড় গভীর ছিল না। চৈতন্য নিজ ভক্তদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের ব্যবহার করার জন্য জেদ করতেন। কিন্তু তাঁর গৃহস্থ ভক্তরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনেই চলতো। বৈষ্ণবদের ইতিহাসে এমন অনেক নজীর আছে যাতে দেখা যায় যে, অনেকে বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধ ভেঙ্গে অনেক কাজ করেছেন এবং সে সব নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজ বিগর্হিত কর্ম সে সময় বৈষ্ণব সমাজ পরিপাক ও হজম করে নিয়েছে।[১] আজ পর্যন্ত দেখা যায় যে গৃহস্থ বৈষ্ণব মণ্ডলীর বাইরে জাতবোষ্টম বলে একটা বৈষ্ণব সমাজ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে পতিতদের অনেকে এই সমাজে স্থান পেয়েছিল। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন: পূর্বেও সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বৌদ্ধ সংঘে আশ্রয় লাভ করতেন। বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হলে যে সকল নরনারী নিরুপায় হয়েছিল এরা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গলাদেশে 'নেড়ানেড়ী' নামে প্রচলিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য সেই সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নবীন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে উদ্ধার করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তদুপরি বৈষ্ণবধর্মের ব্যবস্থায় বর্তমান হিন্দু বাঙ্গলার অভিব্যক্তি হয়। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে—নেতাদের সমাজ বিপ্লবের প্রেরণা কোত্থেকে এসেছিল? একসময় কি নবদ্বীপে যথার্থই একটা রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের কথা ও আলোচনা চলেছিল, যা'র আভাষ ও ইঙ্গিত পেয়েই হোসেনসাহ সেখানকার ব্রাহ্মণদের উচ্ছন্ন করবার হুকুম দেয়? রাজা গণেশের মন্ত্রণাদাতা নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশধর অদ্বৈত গোঁসাই কি এতটুকু রাজনীতিক জ্ঞানশূন্য ছিলেন যে, কেবল "কৃষ্ণ কোথা" বলে বলে কেঁদে বেড়াতেন? তখনকার হিন্দু আভিজাত্য যে এতটা রাজনীতিক জ্ঞানশূন্য ছিল না তার প্রমাণ গণেশকে বাদ দিয়ে আমরা চণ্ডীপরায়ণ দনুজ মর্দ্দন ও মহেন্দ্রে দেখতে পাই। এঁরা বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি বলে নিজেদের মুদ্রাঙ্কিত করে উহার প্রচলন করেন। মুসলমান কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের পর আর্য্যাবর্ত্তে কোন হিন্দুরাজা যা' করতে পারেনি তাহাই সাধন করেছিলেন বলে দনুজ-মর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২] নিরপেক্ষ বিচার করলে গণেশ ও দনুজমর্দ্দনদেব পৃথক ব্যক্তি। চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) রাজবংশের কুলুজীতে এই নামে এক রাজার নাম পাওয়া

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: বৈষ্ণব-সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব।

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গলার ইতিহাস; ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮০।

যায়। কিন্তু এই তালিকাতে স্বাধীন রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের পুত্র মহেন্দ্রের নামোল্লেখ নাই (নগেন্দ্র বসুর রাজুবনয়স্থকাণ্ড)। হয়ত চন্দ্রদ্বীপের রাজাই যদুর বিধর্ম গ্রহণ করাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্র তাঁ'র পুত্র চণ্ডীপরায়ণ মহেন্দ্রকে প্রদান করে পরলোকে যান। পরে হয়ত যদু ওরফে জেলালুদ্দীনকে এই গৌড়রাষ্ট্রকে পুনর্জয় করে আয়ত্তাধীন করতে হয়। বৃহস্পতি রায়মুকুট ইঙ্গিতে তাহাই ব্যক্ত করেন বোলে প্রতীত হয়।

আশ্চর্যের কথা মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই দুই স্বাধীন রাজার নামোল্লেখ একেবারেই করেন নাই। বৃহস্পতি রায়মুকুট জেলালুদ্দীনকে জগদত্ত সুত বলেছেন এবং তিনি নিজ ভুজ "অর্জিত দ্রবীনশ্রী" অর্থাৎ রাজ্য অর্জন পুনরুদ্ধার করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] এতদ্বারা উপলব্ধি হয় যদু মুসলমান হয়েও পিতৃরাজ্য হারিয়েছিলেন এবং চণ্ডীপরায়ণ দনুজমর্দ্দন ও তৎপুত্র চণ্ডীপরায়ণ মহেন্দ্র স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, এই সব ঘটনা অদ্বৈতাচার্য্যের পিতামহের সময়ে ঘটেছিল। এর স্মৃতি তাঁর সময়ে হিন্দুদের মনে নিশ্চয়ই জাগ্রত ছিল। এই স্মৃতিই কি রূপ ধারণ করে হিন্দু রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নবদ্বীপে জল্পনা-কল্পনার মূল হয়েছিল, যে ব্যাপার কিছুটা টের পেয়েই গৌড়ের বাদশাহ তথাকার লোকদের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেন ? নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে সে প্রবাদও চৈতন্যদেবের পূর্বে প্রচলিত ছিল।[২] আবার রজনী চক্রবর্ত্তী তাঁর গৌড়ের ইতিহাসে বলেন : "চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে মুসলমানেরা নবদ্বীপের উপর বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল।...সে সময়ে হিন্দুদের মনে একটি বিশ্বাস ছিল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে...কাজী গৌড়েশ্বরকে জানান যে নবদ্বীপবাসীগণ স্বাধীন হইবার বাসনা করিয়াছে...গৌড়েশ্বর নবদ্বীপবাসীগণের শাসনের জন্য কাজীর প্রতি আদেশ করিলেন।"[৩] হয়ত এই অত্যাচারের ফলই সমাজ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। হয়তঃ অদ্বৈত প্রভৃতির "অবিদিত মনে" মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের ভয়ে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সামাজিক ও ধর্মের রাস্তায় চালানো হয়। সেই কারণে মুসলমানদের হাত থেকে বাঙ্গলা রক্ষা করার পরিবর্তে মুসলমান ধর্মযাজকের হাত থেকে বাঙ্গালীকে রক্ষার কর্মে আত্মনিয়োজিত হল। এই কাজের জন্য একটি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। গণেশ যেমন অদ্বৈতের অতিবৃদ্ধ পিতামহের শাণিত অস্ত্র ছিলেন, সেরূপ রাজনীতিক অস্ত্রের অভাবে চৈতন্যকে অদ্বৈতের দল, ধর্ম ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রের শাণিত অস্ত্ররূপে পেলেন।

১। আহম্মদ হাসন দানি : Journal of Historical Quarterly. Sp. 1952.

২। চৈতন্যভাগবত।

৩। গৌড়ের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২।

এ'জন্যেই চৈতন্যকে অতটা তুলে ধরা হলো। নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে আসবার পর অদ্বৈত পণ্ডিত তাঁকে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রকাশ্যভাবে "অবতার" বলে অভিষেক করেন এবং শচীদেবী প্রভৃতি তাঁকে বরণ করে অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। আবার নিমাই পণ্ডিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী" নামে সন্ন্যাসী হলে, পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে অদ্বৈত পুনরায় তাঁকে "অবতার" বলে সর্ব ভারতের সমক্ষে ঘোষণা করেন।[১] এই দুই আভাষের অর্থ কি? প্রথমটির দ্বারা কি তাঁকে বাঙ্গলার নেতা বলে মেনে নেওয়া হয় নি? আর দ্বিতীয় ক্রিয়া দ্বারা কি তাঁকে নিখিল ভারতীয় নেতা বলে মেনে নেওয়া হয় নি? নূতন কাজের জন্য লোকমান্য নূতন নেতার প্রয়োজন ছিল, তাই এই অভিষেক। সে সময়ের হিন্দু বুর্জোয়াদের চৈতন্যকে সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁকে 'পতিত পাবন' বলে প্রচার করে তাঁর কাজের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত গণসাধারণকে হাতে রাখা সে সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চৈতন্যের ন্যায় লোকপ্রিয় জননেতার নেতৃত্বে একটা হিন্দু রাজনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বিজাতীয় রাজশক্তির বিপক্ষাচারণ করতে সাহস পেত, কিন্তু গৌড়ের সুলতানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও বাঙ্গলায় হিন্দুর তথোপযুক্ত শৌর্য্যবীর্য্যের অভাবের জন্য সে ভাব মূর্ত্ত হতে পায়নি। এইজন্য চৈতন্য ও চৈতন্যশিষ্যেরা "সীজারের জিনিষ সীজারকে আর ভগবানের জিনিষ ভগবানকে দাও"—এই খৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিল। চৈতন্যের দল রাজশক্তিকে না ঘাঁটিয়ে উল্টো পথে সমাজ বিপ্লবে মনোযোগ দেয়। এই প্রকারের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর অনেকস্থলে এই প্রকারের পন্থা অনুসৃত হয়েছে। স্বয়ং খৃষ্টই এই পন্থাবলম্বন করেছিলেন; ভারতে বর্তমানকালে উক্ত পন্থা অনেকের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে।

রাজশক্তির অভাবে সামাজিক অথবা অর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না! প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্যই চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গলার সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। তিনি "পতিত পাবন" বলে আজও পূজিত ও সম্মানিত হলেও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে "স্পৃশ্য" ও "অস্পৃশ্য" প্রশ্ন পুনঃপ্রবেশ লাভ করেছে।

মুসলমান যুগের শেষ কথা এই যে লোকসংখ্যা গণনা দ্বারা দেখা গেছে যে বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোক অহিন্দু। তার কারণ কি? সে সম্বন্ধে একটা যথাসাধ্য সম্ভবপর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বোধ হয়

১। বিমানবিহারী মজুমদার: শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান।

সর্বপ্রথম লোকসংখ্যা গণনাকালে ডাঃ ওয়াইজ দেখেছেন যে ঢাকা বিভাগেই অহিন্দুর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশী। আর পদ্মাতীরবর্তী জেলাসমূহেই তাহা দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্যের কথা মুসলমানযুগের প্রাক্কালে এসব স্থানে অর্দ্ধ-স্বাধীন হিন্দু ভুঁইয়ারা ছিল। হিন্দুর শেষ স্বাধীন রাজবংশ (দেববংশ) এস্থল থেকেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু কালে কার্যতঃ উল্টা হিসাবই দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যেখানেই দেখিবে হিন্দু জমিদার, সেখানেই দেখিবে মুসলমান সংখ্যায় বেশী।" এ অনুসন্ধানের একটা সম্ভবপর কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে সর্বত্র গাজী ও পীরের সমাধি দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার সর্বত্র মুসলমান ও হিন্দু পীর পূজা করে থাকেন। ছুঁৎমার্গ ও অবৈদিক কর্মের লোকদের প্রতি ঘৃণাই ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মের বাইরের লোকদের ক্ষুব্ধ করেছিল এবং সে সুযোগে পীর ও গাজীদের দ্বারা তাদের মুসলমান ধর্মে আনয়ন করা হয়েছিল। এই প্রকারেই ব্রাহ্মণ জমিদার দ্বারা নিগৃহীত অনেক পীরালী ব্রাহ্মণ চব্বিশ পরগণাতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সময়ে মুসলমান হন, সেজন্যে এতদিন পর্যন্ত এরা একটি পৃথক 'মেল' করে বিবাহাদি করেছেন।

এ'কথা অস্বীকার করা যায় না যে উভয় ধর্মের লোকদের রাজনীতিক সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও কালে অর্থনীতিক, সামাজিক ও ধর্মের সম্মিলন হয়েছিল। অর্থনীতিক একতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সামাজিক সামঞ্জস্য কালে হয়েছিল। ক্রমে 'নিজে বেঁচে থাক এবং অপরকেও বাঁচতে দাও' (live and let live) নীতি সামাজিক ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। সমাজবিজ্ঞানে একে বলে 'ভাবের গৃহীকরণ' (Domestication of Ideas); অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবগুলো ঘরোয়া হয়ে পারস্পরিক সহনশীল হয়ে উঠে। উভয় সম্প্রদায়ই তখন পরস্পরের বিশ্বাস, সংস্কার মেনে চলেছে। সামাজিক ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। আজও অনেক স্থলে এ'ভাবের সহনশীলতার তিরোধান ঘটেনি।

শেষে রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান একত্রে মিলে মুঘলের প্রতিকূলাচারণ করেছিল। এই সম্মিলিত যুদ্ধে হিন্দুই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমন কি মুঘলযুদ্ধের শেষাংশেও আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম ওসমান যখন বাঙ্গলার সুবাদার, তখন পশ্চিমবঙ্গের এক তাঁবেদার জমিদার শোভাসিংহ বিদ্রোহ করেন। ইহাকে বাগ্দী বিদ্রোহও বলা হয়। আজও হুগলী জেলায় বাগ্দী তরুণদের মধ্যে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত আছে। শোভাসিংহ শক্তিবৃদ্ধির জন্য মেদিনীপুরের পাঠান সর্দার রহমৎখাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই সময় কিছুদিনের জন্য রাঢ় দেশ মুঘলের হস্তচ্যুত হয়। গড়বেতা অঞ্চলেও

শোভাসিংহের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শোভাসিংহ কোন কারণবশতঃ বর্ধমানের জমিদারকে আক্রমণ করেন। জমিদার খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে কৃষ্ণনগরে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন (ক্ষিতীশ-বংশাবলী)। রাজকুমারী কয়েদ হন। শোভাসিংহ তাঁর উপর অত্যাচার করতে গেলে তিনি ছুরিকাঘাতে শোভাসিংহকে হত্যা করেন, পরে কাটোয়ার যুদ্ধে রহমৎ খাঁ নিহত হন। বিদ্রোহী সৈন্যদলও ছত্রভঙ্গ হয়।

কিন্তু কথা এই, পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দী চাষীরা কেন অস্ত্রধারণ করেন? হয়ত আওরঙ্গজেবের হিন্দু-দলন নীতিই এর কারণ। আকবরের সময় থেকে হিন্দুচাষী যে সুবিধা ভোগ করছিল আওরঙ্গজেব তাহা রহিত করে হিন্দুচাষীর খাজনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং জিজিয়া কর ধার্য প্রভৃতি ব্যাপারে উত্যক্ত হয়ে হিন্দুচাষীরা শোভাসিংহের নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল। বর্ধমানের রাজা ছিল মুঘলের খাজনা আদায়কারী ব্যক্তি, কাজেই তার উপর এই প্রকোপ পড়ে। আর এই সঙ্গে পাঠানদের সহযোগীতা? পাঠান ভারতে কখনও হারান রাজ্যের কথা ভুলেনি। তাই ভারতের সর্বত্র হিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুঘলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল।

এই বিদ্রোহপর্বের প্রহসন হতেছে, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ মুঘলের পক্ষ নিয়ে শোভাসিংহের প্রাসাদ লুণ্ঠন করেন ও রহমৎ খাঁর পত্নী লালবাঈকে অপহরণ করে নিয়ে যান। লালবাঈয়ের নামে লালবাঁধ, বাড়ী প্রভৃতি আজও তার সাক্ষ্য প্রদান করে। কালে লালবাঈয়ের একটি পুত্র হয়। কথিত আছে, ব্রাহ্মণেরা তাকে "হিন্দু" করতে অস্বীকার করে। আর লালবাঈ রাজাকে প্ররোচিত করেন, সমগ্র রাজ্যকে মুসলমান করে দেওয়ার জন্য। প্রেমান্ধ-রাজা শেষে ব্রাহ্মণের জাতি মারবার ফিকির করে। আহারের সময় মুসলমান পরিবেশক আহার্য লইয়া হাজির! ব্রাহ্মণেরা যেস্থলে আহারে বসেছিলেন সে জায়গাটা আজও "ভোজনটিলা" বলে দেখান হয়। ব্রাহ্মণেরা ভয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে "রাণীমা, রক্ষা করুন" বলে আর্তনাদ করতে থাকেন। রাজা তখন মিনারে অবস্থিত ছিলেন। রাণী তিরন্দাজদের হুকুম দেয় "রাজাকে মার"।

রাজা আহত হয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েন। তিনি হরিণের খোঁয়াড়ে পড়েন ও তথায় মৃত হন। মিনারে তার রক্তাক্ত হাতের চাপ আজও আছে বলে তাঁর বংশধরেরা দেখান। পরে রাণী রাজার মৃতদেহের সহিত সহমৃতা হন। "পতিঘাতিনী সতী"র দাহস্থল এখনও দেখান হয়। প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে

লালবাঈয়ের প্রাসাদ ধ্বংস করে। কেহ কেহ বলেন লালবাঈ সপুত্র নিহত হন; কেহ বলেন, তিনি পুত্র সমেত পলায়ন করে নিরুদ্দেশ হন।

এইস্থলে মন্তব্য এই: রহমৎ খাঁ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীকে শোভাসিংহের প্রাসাদে রেখে গিয়ে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় শোভাসিংহের ও রঘুনাথ সিংহের যুদ্ধের গীতি (ballad) প্রচলিত আছে।

বর্তমান সময়ে "দুই জাতি তত্ত্বের" ধুঁয়া তুলে শাসকজাতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে প্রাচীন ভারত বিভক্ত করে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। এই বিভাগে বাঙ্গলা প্রদেশের ক্ষতি হয়েছে বিশেষভাবে। এই মতের লোকেরা বলেন, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে আচার, ব্যবহার, স্মৃতি, ঐতিহ্য, আইন প্রভৃতি দ্বারা পৃথকীকৃত লোকসমষ্টি। অতএব তারা দুটি পৃথক 'নেশন'। মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি এক সময়ে প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ছিলেন বলতেন, 'হিন্দু ও মুসলমান পৃথক হয়ে প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে আছে'। এ'কথা তিনি একজন আমেরিকান সংবাদপত্রসেবীকে বলেছিলেন। তা'তে শেষোক্ত ব্যক্তি বলেন—'It is terrible' অর্থাৎ এটা এতটা ভীষণ অবস্থা! তার প্রত্যুত্তরে জিন্না বলেন 'It is terrible but it is true', অর্থাৎ এটা ভীষণ হলেও সত্য ঘটনা। এর অর্থ এই বোঝা যায়—যেন হিন্দু ও মুসলমান ভারতের সর্বত্র তরবারী খুলে যোধ্যমান ভাবে সর্বদাই পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এ'কথা কি সত্য? ইতিহাস এ'কথার কি সাক্ষ্য প্রদান করে? আমরা অন্যত্র এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এ'স্থলে গুটিকতক কথা বলে এ'প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। মধ্যযুগে যেসব নূতন ধর্মের উত্থান ঘটেছে সেগুলোতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মভাবের ছাপ পড়েছে।[১] আমেরিকাবাসী এম, টাইমাস[২] নাম্নীয় এক অনুসন্ধানকারী বলেন, হিন্দুধর্মে মুসলমান ধর্মের প্রভাব অপেক্ষা মুসলমান ধর্মে হিন্দুধর্মের ছাপ বেশী পড়েছে এবং এ'সব কারণবশতঃ ভারতীয় মুসলমানধর্মকে 'ভারতীয় ইসলাম' বলে নামকরণ করেছেন। বহু ধর্মসম্প্রদায় আছে যা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থিত। তিনি এই প্রকারের ১৬টি সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করেছেন।

বাঙ্গলাতে অনেক ধর্ম সম্প্রদায় আছে যা হিন্দুধর্মমণ্ডলী থেকে বহির্গত হয়ে পৃথক মণ্ডলী গঠন করেছে। অনেক মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্যবর্গ আছে

১। লেখকের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'—২য় এবং ৩য় খণ্ড।

২। T. Titus—Indian Islam.

আবার সম্প্রদায় বিশেষে হিন্দুগুরুর মুসলমান শিষ্যও আছে। অবশ্য কেতাবী ধর্ম ধর্মশাস্ত্র মধ্যেই নিহিত আছে, কিন্তু সাধকশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মরমী সাধক সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটিতে অবতারবাদ গৃহীত হয়, একটিতে পূর্ব-জন্মবাদ, অন্য একটিতে অদ্বৈতবাদ গৃহীত। আবার হঠযোগ অভ্যাস সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। 'দাবীস্থান' গ্রন্থ বলে—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'যোগ-শিক্ষা' হিন্দু, পার্শী এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোহিস্থানের পর্বতে নাগা সাধুরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে 'যোগ-শিক্ষা' দিতেন।[৩]

এক্ষণে বাঙ্গলায় আসা যাক। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে ধর্ম সাধকদের মধ্যে সাধনার একতা আছে। বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ভাবের আদান-প্রদান হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়েছে। বর্তমানে একশতের অধিক মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ১০২ জন কবির রচিত বৈষ্ণব পদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ চারিশত। যখন একদিকে ব্রাহ্মণদের অসহনীয় গোঁড়ামী অন্যদিকে তান্ত্রিকদের বিভৎসতা, আর তার প্রতিপক্ষে বিজেতা রাজশক্তির সহায়তায় মুসলমানধর্ম প্রচারবাদের প্রচণ্ড অভিযানের ফলে স্রোতের ন্যায় হিন্দু সাম্যবাদীয়রা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করল (এটা বার্বোসার উক্তি)। তখন দ্বন্দ্ববাদের প্রতিক্রিয়ারূপে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের বন্যা বাঙ্গলা ভাসাল। এ'বন্যায় কেবল হিন্দু ভাসে নাই, মুসলমান এবং বৌদ্ধধর্মের অবশিষ্টাংশ নাথধর্মীয়দেরও সে বন্যায় গা ভাসাতে হয়েছিল। ইহা সত্য যে ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর বৌদ্ধদের আর সংবাদ পাওয়া যায় না। তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজে, না হয় বিজেতাদের ধর্মগ্রহণ করে আত্মগোপন করল। এদের মধ্যে নূতন ও পুরাতন উভয় মুসলমানই আছেন। উত্তর বাঙ্গলায় ও পূর্ব বাঙ্গলায় বেশীরভাগ মুসলমানই হয় বৌদ্ধ না হয় নাথধর্মীয় যুগীবংশ সম্ভূত ; আজও তার নিদর্শন এদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের মুসলমান পালাগায়কেরা আজও মহীপাল প্রভৃতি পালরাজাদের গাথা গেয়ে থাকেন। ত্রিপুরার মুসলমান কৃষক আজও সন্ধ্যাবেলা বলেন ঃ "দিন গেল আলেজোলে, সন্ধ্যাকালে নাও তিন নাথের নাম।" এও শোনা যায় যে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষক হিন্দু প্রতিবেশী দ্বারা তিন-নাথের (মীননাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ) পূজা দিয়ে থাকেন। হিন্দু-অস্পৃশ্য মুসলমান হয়েও

৩। Sindh : The Land of Saints and Sufis.

অস্পৃশ্য আছেন, নাথধর্মীয়-যুগ 'জোলা' (তাঁতি) হয়েও মুসলমান সমাজে পতিত। তার জন্য তাঁরা "মোমীন-আন্দোলন" করছেন।

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাদের নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এসব পদকর্তা ধর্মভাবে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিনা তা' আমাদের নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁরা যে বৈষ্ণব-কৃষ্টির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—তা' অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় বলেছেন—"একদিন এই প্রেমেরই চিত্তহারী সুমধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন লহরীতে জাত্যাভিমান, ধর্মাভিমান, সম্প্রদায়িকতার স্বাতন্ত্র্য ভাসিয়া গিয়া জগতে এক অভিনব ধর্মস্রোত বহিয়াছিল। কাফের-পীড়ক বিজেতা মুসলমান পর্যন্ত আত্মধর্মাভিমান ভুলিয়া সেই "সুজন বন্ধু নবঘনশ্যাম প্রাণনাথের প্রেমধর্মকেতনের ছায়ায় বসিয়া শান্তি অন্বেষণ করিয়াছিল। ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। যেসকল মুসলমান বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত সুজন ভাবাবিষ্ট হইয়া পদাবলী রচনা করিতেন।" এসব কবিদের ভেতর কেহ কেহ—"নিজেদের হরিরাধার ভক্তসেবক...বলতে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচবোধ করেন নাই। এ'ক্ষেত্রে তাঁরা পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী মুসলমান ধর্মের অনুশাসনকেও লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।"[১]

এরূপে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও সেভাব প্রকট হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উর্ধ-বাহু নৃত্য এবং দশাপ্রাপ্ত হওয়া কন্সষ্টানটিনোপলের "মৌলভী" সম্প্রদায়ের দরবেশদের নৃত্যের সঙ্গে এত সৌসাদৃশ্য আছে যে তার ঐক্য অস্বীকার করা যায় না। লেখকেরা তিন ভ্রাতাই বিভিন্ন সময়ে কন্সষ্টানটিনোপলে Dancing Darvises-দের নৃত্যে বৈষ্ণবদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।[২] সনাতন গোস্বামীর "ভাগবৎভক্তিচরণামৃত" নামক পুস্তকে বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় সুফীআসক (প্রেম) ও মাসুফের (প্রেমিকা) ভাবই পাওয়া যায়। এই

১। মুন্সী আবদুল করিম : "নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি"—আলো (১৩০৬)। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য দ্বারা উদ্ধৃত।

২। লেখকের 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব'।

ভাববিনিময়ের কাজে দ্বন্দ্ব-নীতির নিদর্শনস্বরূপ কবি হাছনরাজার পদটি উদ্ধৃত করা গেল—

"আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা,

*   *   *

তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে, হাছনরাজা বাঙ্গালী গো ।।

*   *   *

হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুল্লা-মুন্সীয়ে দেয় বাধা ।।
হাছনরাজা বলে আমি, না রাখিব জুদা
মুল্লা-মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা ।।"

লেখক দু'বার দু'জন ফকিরের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। প্রথমটি কুমিল্লা সহরের অভয়াশ্রমে লেখকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন—বাঙ্গলা বইএ পড়েছি "ভগবান নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ। এটা কেউ উপলব্ধি করেছেন কি?" ফকির সাহেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বোঝা গেল তিনি অদ্বৈতবাদপন্থী। তাঁর মুরসীদ (গুরু) থাকেন জৌনপুরে, বাঙ্গলায় অনেক মুরিদ (শিষ্য) সম্প্রদায় আছেন। অপর জনের সঙ্গে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়ার কাছে আলাপ হয়। তিনি বললেন "যে গুরুর রহমে আল্লাকে পেয়েছি সে গুরুকেই মানি।" তাঁর মুখ থেকে বৌদ্ধ সহজযানী সররুহপাদের "গুরুই একমাত্র সত্য" এই তথ্যই ধ্বনিত হল! এ থেকে বোঝা যায় হিন্দুর বিভিন্ন প্রাচীন ভাবধারা কিভাবে অন্তঃসলিলারূপে বাঙ্গলায় তথা ভারতের মুসলমান সমাজেও প্রবাহিত হচ্ছে।

উভয় ধর্মের ঘাত, প্রতিঘাত ও সংঘাতের দ্বারা যে সমন্বয় ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা' সুপণ্ডিত ডঃ এনামুল হক মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ'প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো। "বাঙ্গলা ভাবপ্রবণ দেশ। দরবীশেরা যখন বাঙ্গলা দেশে আসিয়া ঐসলামিক ভাবপ্রবণতার আমদানী করিলেন, তখন বাঙ্গালীর সুকুমার হৃদয় সহসা খুলিয়া গেল, তাঁহারা ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবপ্রবণতার সহিত ঐসলামিক ভাবপ্রবণতা মিশ্রিত হইল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের কবিতায়, আউল-বাউলের উদাস সঙ্গীতে, ফকীর ও জিকির সম্প্রদায়ের মর্মের বাণীতে বাঙ্গলাদেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ...বঙ্গের এই যে ভাব-মিশ্রণ, ইহাতে দেশ লাভবান হইল কি ক্ষতি স্বীকার করিল, সে বিচার-ফল ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে।"[১]

১। ডঃ এনামুল হক: "বঙ্গে সুফীপ্রভাব," পৃঃ ১৮৩—১৮৪ (১৯৩৫)।

তিনি আরও বলেছেন "এই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ইসলাম কোন দিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে আঁটঘাটবাধা শাস্ত্রীয় ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া যে সকল সূফী ইসলামের সহিত এ'দেশীয় চিন্তাধারার যোগ ঘটাইলেন, তাঁহারাই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের হৃদয় অধিকার করিলেন। ইহাতে ফল হইল এই যে, বাঙ্গলার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নূতন ইসলাম জন্মলাভ করিল, যাহাকে "লৌকিক ইসলাম" বলিয়া নাম দেওয়া যায়। বাঙ্গলার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দুধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর্য, অনার্য ও বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।"[১]

ডঃ হকের মতে এই সংমিশ্রণের ফল হল—"বাঙ্গালীর চিন্তার মুক্তি। ইহার সর্বপ্রধান প্রকাশ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উদ্ভব।...ইসলাম ধর্মের গ্রাস হইতে নিজ ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া বাঙ্গালী 'ধর্ম ও সমাজ' সম্বন্ধে নূতন-ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলেন।...এই সময় হইতেই, তাঁহারা নিত্য নূতন বিষয়ে নূতনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।...কোন ধর্মমত বা মহাজনের বাণীকে খারাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান অথবা সাহস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই, সকল ধর্ম ও মতবাদের বিশ্বজনীন দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়া এবং সঙ্কীর্ণ ও অনুদার মতগুলিকে বাদ দিয়া একটি সর্বজনবোধ্য মহামানব ধর্ম সৃষ্টি করার স্বপ্নে এই স্বাধীনতা-প্রয়াসী চিন্তাবীরগণ বিভোর হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে বাঙ্গলাদেশে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময়ের মধ্যে ধর্মকে সহজভাবে উপলব্ধি করিতে উন্মুখ এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিল।" এর মধ্যে ডঃ হক আটটি সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করেছেন যাদের ভেতর মুসলমানদের আধিক্য এবং ছ'টি সম্প্রদায়ের নাম করেছেন যাদের ভেতর হিন্দুধর্মের প্রাধান্য।

ডঃ হক আবার বললেন—"খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐসলামিক পারি-পার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাবে নিরক্ষর শ্রেণীর ভিতর যে মর্মন্মুখী চিন্তা বিকশিত হইয়া উঠে তাহাই হইল, 'বাউল মত'।"

মুসলমান যুগে যে উভয় সম্প্রদায়ের ভাব বিনিময় হয়েছিল এবং দ্বন্দ্ববাদের ধারা ধরে উভয় সম্প্রদায়ের ভাবধারার একটা সম্মিলন হয়েছিল তা' অস্বীকার

১। ডঃ এনামুল হক : "বঙ্গে সূফীপ্রভাব," (১৯৩৫)।

করা যায় না। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঙ্গলায়ও হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির সম্মিলন ঘটেছিল। এমন কি চারুকলা ও স্থাপত্য কাজেও সে সম্মিলন আশ্চর্য-ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্থপতিবিদ্যাবিদ্ পারসি ব্রাউন বলেছেন—"Yet inspite of these inconsistencies, in the course of time, a method of approach became manifest and ground common to both was gradually formed. In the sphere of the building art specially some communion of ideas was generated."—এর অর্থ এই যে, যতই বিপরীত ভাব থাকুক না কেন, পরস্পরের সান্নিধ্যের একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়েই যায় এবং উভয়ের জন্যে একটা সাধারণ ভিত্তি গড়ে উঠে। বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে ভাবের একতা সৃষ্টি করা হয়। বাঙ্গলার মুসলমান স্থপতিকার্য যে এ' প্রদেশের বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবান্বীত হয়েছিল তা' স্থপতিকার্য বিশারদ ব্রাউন মহোদয় স্বীকার করেছেন। তিনি বাঙ্গলার 'জোড়-বাঙ্গলো ছাতের' প্রথার উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের কদমরসুলের মসজিদে (১৬৫৭ খ্রীঃ) ফতেখাঁর সমাধি-মন্দির তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রকার স্থপতি কার্যের আলোচনা করে ব্রাউন মহোদয় বলেছেন "পনর থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে যে স্থপতি-কার্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা' অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন এবং এমন একটি পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে যা বাতাবরণের কাছে নতশির হয়ে দেশজ অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে।" এই প্রকারে বাঙ্গলা দেশ বিজেতাদের বিজিত করিল। এই উপায়ে বাঙ্গলার প্রাদেশিক মুসলিম স্থপতি-কার্যের উদ্ভব হতে আরম্ভ করল। এই প্রাদেশিক মুসলমান স্থপতি-কার্যের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পাণ্ডুয়াতে রাজা গণেশের পুত্র যদু ওরফে সুলতান জেলালুদ্দিন মহম্মদের (১৪১৪-৩১) 'একলাখি' নামক কবরে। ইহাই শেষে বাঙ্গলার বেশীরভাগ স্থপতি-কার্যের আদর্শ হয়। ইহাতেও 'জোড়-বাঙ্গলোর' ন্যায় ন্যুব্জাকারের কার্নিস দৃষ্ট হয়। এই প্রকারেই ব্রাউনের মতে স্থপতি-কার্যে আধা দেশজ প্রকারভেদের বিবর্তন ঘটে। বাঙ্গলায় এই জোড়-বাঙ্গলো পদ্ধতির কার্নিস যেখানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথায় এর প্রচলন হয়েছে। আগ্রা ও দিল্লীর মুঘল প্রাসাদের আমদরবারের কার্নিস বাঙ্গলার এই প্রকার স্থপতি-কার্যের নিদর্শন। এ'বিষয়ে ভিন্সেন্ট স্মিথও স্বীকার করেছেন যে পারসিক গম্বুজ (dome) ও বাঙ্গালী ন্যুব্জ (bent) কার্নিস এবং হিন্দুস্তম্ভ (column) মিলিয়ে এক মিশ্রিত পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছে।[১]

১। Vincent Smith : *A History of Fine Art in India and Ceylon.* 2nd ed. (1930.)

পুনঃ বীরভূমের মুঘলযুগের মুসলমান রাজাদের রাজধানী বীরনগরের মস্‌জিদগুলো পোড়া ইঁট দ্বারা প্রস্তুত। মস্‌জিদগুলোতে প্রত্যেক ইঁটে 'পদ্মফুল' চিত্রিত রয়েছে। শুনা যায়, উত্তরবঙ্গের কোন কোন মস্‌জিদের ইঁটেও এই পদ্মফুলের চিত্র আঁকা দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের আর একটি ঘটনা, সত্যপীরের পূজাপদ্ধতি। বাঙ্গলায় হিন্দু ও মুসলমান কবিরা সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছেন। হিন্দুরা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ বলে পূর্ণিমা রাত্রে পূজা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মকাল অবধি হিন্দুর শ্রাদ্ধকালে সত্যপীরের পাঁচালী পুরোহিত ঠাকুররা পাঠ করতেন। বাদশাহ হোসেনশাহ তার উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের ভেতর সদ্ভাব আনার জন্যে এই পীরের পূজার প্রচলন করতেন বা তার জন্যে উৎসাহ দিতেন—এই কিংবদন্তী কথাও অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে! ডঃ এনামূল হক বলেন যে—"এমন দিন ছিল, যখন বাঙ্গলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সত্যপীর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান কবিগণ এই পীরকে অবলম্বন করিয়া একটি বিরাট পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্যকে 'সত্যপীর সাহিত্য' নামে অভিহিত করা যায়।" অধিকন্তু মুসলমান পীরেরা বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানের কাছে আজও শ্রদ্ধার পূজা পাচ্ছেন।

শেষের কথা হতেছে সঙ্গীতের সম্মিলন। সঙ্গীত ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রথমে আমীর খস্রৌ ভারতীয় সঙ্গীত মধ্যে পারসীক সুর (মোকাম) মেলান। পরে সম্রাট আকবর আরও বিদেশজাত সুর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করান। এ'জন্যই উত্তরের (হিন্দুস্তান) ও দক্ষিণের (কর্ণাটি) সঙ্গীতের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন ঃ ভারতের বিভিন্ন কৌমদের মধ্যে যাহা লোক-সুর ছিল তাকে 'দেশজ' সঙ্গীত বলা হত। কিন্তু সঙ্গীতকারেরা এ'সব সুরকে আর্য্যীভূত করে 'মার্গ' সঙ্গীতে উন্নীত করেন। এ'প্রকারে 'বঙ্গাল' বা 'গৌড়' সুর বাঙ্গলার জাতীয় রাগ ছিল। এই সুর মার্গগীতে উন্নীত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাভাবে গীত হ'ত।

"বঙগাল (বাঙ্‌গাল) রাগের উল্লেখ ৫ম-৭ম খৃষ্টাব্দে মতংগ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা'রও পূর্বে কশ্যপ বঙ্‌গালী রাগিনীর রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ "দিব্যরূপিনী বঙগালী রাগিনী বঙ্‌গালদেশ সম্ভবা।"[১]

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঃ 'রাগ ও রূপ', পৃঃ ২২৭।

পরে দামোদর, বঙগালী রাগের ধ্যান বর্ণনা করেছেন : "বঙগালী বক্ষে পুষ্প ধারণ করেন। বামহস্তে উজ্জ্বল ত্রিশূল, দেহ ভস্মে আচ্ছাদিত, জটাজাল দৃঢ়বদ্ধ ও তাঁর প্রাতঃকালীন সূর্যের মত রক্তবর্ণ। সিন্ধুনদী তীরে তিনি শিবের ধ্যান করছেন।"

এস্থলে দ্রষ্টব্য যে গুপ্তযুগের সমসাময়িক কাল থেকে এবং বাঙ্গলার পালযুগের আগে যখন বিভিন্ন রাজ্য বাঙ্গলায় সংগঠিত হয়েছিল সে সময়ে বাঙ্গলা রাগ 'দিব্যরূপিণী'; আর নান্যদেব কশ্যপের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন : "বঙালিকা সকললোকমনোহরা স্মৃতে,—তথাচ কশ্যপঃ"। এ'বর্ণনা আমরা পাই যখন বাঙ্গলা নিখিল ভারতীয় সমাজের চাপ থেকে বাহির হয়ে নিজেকে স্ফূর্তিলাভ করতে চেষ্টা করছে।

তৎপর পালবংশের অধীনে বাঙ্গলাদেশ গৌড়সাম্রাজ্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ করার পর বাঙ্গলার রাজ গৌড় নামে খ্যাত হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সমকালে দামোদর তাঁর "সংগীতদর্পণ"[১] গ্রন্থে বাংগাল-রাগকে ভৈরবীরূপে সাজিয়েছেন।

এই বঙগাল বা গৌড় বা গৌরী রাগের এই নূতন রূপ আমীর খস্রোর পরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর পরে কল্পিত হয়। 'রাগশিল্পী' সংস্কৃতে এই বর্ণনা দিয়েছেন : 'বীরে চ রৌদ্রে তু তুরুস্ক-গৌড়ো'। এর অর্থ—বীর ও রৌদ্র রসে এই রাগ গাইতে হবে। তারপর বক্ষ্যমান বর্ণনাতে তার রূপ দেওয়া হয়েছে—

"তুরুষ্কগৌড় আরুহ্য হয়পৃষ্ঠেঽরুণদ্যুতিঃ।
শঙ্খঘণ্টোপণীতশ্চ সোষ্ণীষঃ কবচাবৃতঃ॥"[২]

এর অর্থ—প্রভাতের ঊষার ন্যায় তুরস্ক গৌড়ের গাত্রবর্ণ, অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, পাগড়ী মাথায় ও কবচাবৃত শরীর।

এ'স্থলে রাজনীতিককারদের কাছে বাঙ্গলা বা গৌড় রাগ রৌদ্ররূপী যোদ্ধা। ইহা গৌড়ের সেইরূপ যেরূপে বাঙ্গলা এক ডালার যুদ্ধ করেছে, পুনঃ পুনঃ হিন্দু-বাঙ্গলা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, দিল্লীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবার বিপক্ষে লড়েছে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের ধারায় সম্মিলনের পথে। তাই একটি নূতন সমন্বয় হয়ে 'তুরস্ক-গৌড়' রাগের সমুদ্ভব।

সঙ্গীত-শিল্পী সংস্কৃত ভাষাতেই তৎকালীন বাঙ্গলার এ'রূপ দিয়েছেন। বাঙ্গলা তখন কৃষ্টির একটি সমন্বয় পর্বে প্রবেশ করেছে।

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'রাগ ও রূপ', পৃঃ ২২৯।
২। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সঙ্গীতসারসংগ্রহ।

বাঙ্গলায় স্থাপত্য-কারুকার্যে ও সঙ্গীতে সম্মেলন (synthesis) এভাবেই চলতে থাকে। এখন সামাজিক দিক দিয়ে দেখা যাক, কি প্রতীক তার পাওয়া যায়। এক কথায় দেখি তুর্কের (হিন্দিতে 'তুরুক' জায়সীর 'পদ্মাবৎ'; গ্রাম্য বাঙ্গলায় তুড়ুক—বৈষ্ণব সাহিত্যে) ঘোড়া বাঙ্গলার গাঙ্গে ভেসে গেছে। মুসলমান অভিজাতেরা ধুতি পরতেন, পায়ে চটি, গায়ে লম্বা পিরান আর মাথায় পাগড়ী দিতেন (বার্বোসার বর্ণনা)। আর তাঁরা বাঙ্গলায় কথা কইতেন; বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকত্ব করতেন, বাঙ্গলায় কবিতা লিখতেন ও গান গাইতেন।

অন্যদিকে দেখা যায় হিন্দু ও তার পুরোহিতবংশীয় ব্রাহ্মণ দাড়ি রাখছে এবং ফারসী পড়ছে, "উপানদহেট পাদ বিস্মৃত হয়ে এই সময়ে মোজা (high-boot) অর্থাৎ বুট জুতা পায়ে ধারণ করছে (জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল'; নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ')। প্রাচীন পদদ্বয় আবৃত করবার বস্ত্রকে আর 'জঙ্গিকা' বা 'জঙ্গাল' (হর্ষচরিত; অমরকোষ) না বলে ফার্সী নামে 'ইজার'রূপে গৃহীত হয়েছে (পদ্মপুরাণ)।

চালে ও পলে (মাংস) সিদ্ধকরা খাদ্য যা বৈদিক সাহিত্যে "পলৌদন" ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে "ওদন মাংস" এবং অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাতন বাঙ্গলায় 'পলান্ন' (কাশীরাম দাসের মহাভারত) নামে পরিচিত ছিল, তা এযুগে ফার্সী 'পলাও' বা 'পোলাও' নামে হিন্দুর পাতে পরিবেশন করা হতে লাগল। শূল্য মাংস এখন শিক-কাবাব, উল্লুপ্ত মাংসের (কিমা) বড়া এখন "সামী-কাবাব", ব্যঞ্জন এখন ফার্সী 'তরকারী' নাম ধারণ করে বাঙ্গলায় পরিচিতি লাভ করে![1] স্মৃতির সংযাবু পরে মোহনভোগ, বর্তমানে আরবী হালুয়া নামে পরিচিত।

কিন্তু শতাব্দী কয়েক ধরে এত সহনশীলতা ও সম্মিলনের চেষ্টা বিফল হল কেন? এর উত্তরে জাতীয়তাবাদী উর্দ্দু কবি আকবর মহোদয় বলেছেন: "মোল্লাকো পুচ্ছ" ![2] উনবিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধ শতকের পরে সমগ্র ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে যে রাজনীতির পরিচালনা চলতে থাকে তাতেই সাম্প্রদায়িক হলাহল উঠতে আরম্ভ করে। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে এই উদ্‌গার ক্রমে "নয়ামুসলমানদের" দ্বারা দুই-জাতিতত্ত্ব রূপে প্রকটিত হয়ে উঠে, আর তার ফলেই ভারত বিভাগ।

১। সংস্কৃত ব্রীহি (খাদ্য) ফার্সী Vries, আরবী Birinj এখন "বিড়িয়ানী" বলে পরিচিত। Hehn: Kultus des astens।

২। নগেন্দ্রনাথ বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দেবীবরের "মেলবন্ধন"।

পরিশিষ্ট

॥ মুসলমান যুগ ॥

"বাহারীস্তান" ও বারোভুঁইয়া

বিগত জগৎব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার হ'তে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৯২১ খ্রীঃ ফার্সীতে লেখা 'বাহারীস্তান-ই-ঘায়েবী' নামক এক পুঁথির সন্ধান পান ; উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'প্রতাপাদিত্যের পতন' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক মির্জা নাথন নামে একজন মুঘল কর্মচারীর লেখা। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গলার ইসলাম খাঁর সুবাদারীর সময় মুঘল সৈন্যদলে ক্ষুদ্র সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন ভুঁইঞা রাজাদের দমন ও 'মুঘল-শান্তি' বিস্তারকল্পে বহুদিন তথায় ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখা এবং কিয়দংশ শোনা কথার উপর নির্ভর করে।

বাহারীস্তানের উক্ত বিবরণ অধ্যাপক সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হবার পর ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নূতন আলোকসম্পাত হয়। যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ হয়। এতদিন প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে দেশের লোকের যে ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন হয় এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর। তিনি স্বাধীনতার সৈনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বার্থপর। তিনি বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সুবেদার ইসলাম খাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা-বাক্য খেলাপ করেন। কেদার রায়কে খাড়া কর, ইত্যাদি রব উঠে।

ইহার পর ১৯২৫-২৬ খ্রীঃ ঢাকা হতে এক প্রত্নতাত্ত্বিক মৌলিক গবেষণা করে মাসিক পত্রিকায় লিখলেন যে প্রতাপাদিত্য একজন সামান্য লোক, ডাকাতি করত ইত্যাদি। কলিকাতার বাবুরাই তাকে এতবড় করেছে, শ্রীপুরের কেদার রায়কে খাড়া কর।

সর্বশেষে ১৯৩৬ খৃঃ ডঃ এম, ইসমাম বোরা নামক একজন আসামবাসী সেই প্রদেশের গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে বাহারীস্তান নামক পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে তার টীকা সমেত প্রকাশ করেন। অবশ্য এই পুস্তক 'বারো-ভুঁইঞা' সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রদান করে। তিনিও বলেন মুসা খাঁ, ওসমান খাঁ, কেদার রায়কে খাড়া করো। প্রতাপাদিত্য বাঙ্গলার স্বাধীনতার সৈনিক নয়। এতদ্ব্যতীত পূর্বেই অধ্যাপক সরকার ১৯২৬ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে

"প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ" নামক প্রবন্ধে বলেন যে তিনি একটি নূতন হস্তলিখিত পুঁথি পান, তাহা আবদুল লতিফ নামক এক পর্যটকের লেখা। ইনি বাঙ্গলা ভ্রমণকালে প্রতাপাদিত্যের মুঘল গভর্ণমেন্টের কাছে বশ্যতার কথা লিখেছেন। অতএব প্রতাপের মুঘল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করার বিষয়ে সন্দেহ ওঠেনা।

যুদ্ধ-বিগ্রহ হারজিতের কথা, কার কপাল ভাঙ্গল, কেহ বা লুটে-পুটে ধনী হল তার বর্ণনা আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু বাহারীস্তান নিয়ে যখন এত মাতামাতি চলছে এবং প্রতাপাদিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "History of Bengal" দ্বিতীয় খণ্ডে অধ্যাপক সরকারও প্রতাপের দোষ দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—আমাদের দেশে বারো ভুঁইয়াদের নিয়ে একটা ভুল প্রাদেশিক দেশপ্রেমিকতা আছে তখন এস্থলে বাহারীস্তানের অন্তর্গত বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংবাদ দেওয়া আমাদের প্রয়োজন, কারণ এ পুস্তকের অনেক তথ্যের সঙ্গে বাঙ্গলার সামাজিক সম্বন্ধ আছে।

স্বদেশী-আন্দোলন যুগের বাঙ্গলা যখন নিজেকে পুনরাবিষ্কৃত করল তখন বারো ভুঁইঞাদের কথা লোকের শ্রুতিগোচর হতে লাগল। এ'সময়ে ঐতিহাসিক ৺নিখিলনাথ রায় বারো ভুঁইঞাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষা হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ১৩১৩ সালে "প্রতাপাদিত্য" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এ'পুস্তকের উপক্রমণিকায় উক্ত আছে যে 'বাহারীস্তান' আবিষ্কৃত হবার পূর্বের ধারণা যা সকল বাঙ্গলা ও হিন্দী পুস্তকে রয়েছে তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। ইহার অর্থ, মানসিংহের দ্বারা প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে আগ্রা প্রেরিত হন ; পথিমধ্যে তিনি মারা যান।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বাংলা, সংস্কৃত এবং জয়পুরের হিন্দী 'বংশাবলী' গ্রন্থ মধ্যে সর্বত্রই উল্লেখ আছে যে, মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের যুদ্ধ হয়েছিল। হিন্দী পুস্তকে আরও বলা হয়েছে, মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। আর এই সঙ্গে "শিলাদেবী" নামে মূর্তি কেদার রায়ের রাজ্য হতে নিয়ে গিয়ে অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন[১]।

বহুপূর্বে ১৮০২ খ্রীঃ রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রকাশিত হয়। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মানসিংহের পরে ইসলাম খাঁ বাঙ্গলার

১। নিখিলনাথ রায় : প্রতাপাদিত্য।

সুবাদার হন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন। বসুর পুস্তকের কিছু সংবাদ বাহারীস্তানের সংবাদের সঙ্গে মেলে। কিন্তু মানসিংহের সঙ্গে কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্য ও জনশ্রুতি মধ্যে বিশেষভাবে গ্রথিত আছে। তাহলে উভয় সংবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

সম্রাট আকবর একবার মানসিংহকে বাঙ্গলা জয় করবার জন্য 'সুবাদার' করে পাঠান। সেসময় তিনি ঈশা খাঁ, মসনদ আলি, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার[১]-আকবর নামক অধ্যায়ে পাই। মানসিংহ যেমন আফগানদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তেমনি সুন্দরবনের বিদ্রোহও থামিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সুন্দরবনে কোন আফগান জমিদার ছিল না। তখন চণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপের রাজা ছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

এতদিন ইংরেজ লিখিত ভারতের ইতিহাসে বলা হয়েছে আকবরের সময়ে বাঙ্গলায় আফগান বিদ্রোহ হয় ; কিন্তু বর্তমানে উপরোক্ত পুস্তকে স্বীকার করা হয়েছে, মুসলমান বিদ্রোহীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বড় বড় হিন্দু জমিদারেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে কিংবা নিজেদের জমিদারীর ভিতর পাৎসাহী কর্মচারী ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। পুনঃ এই পুস্তকে বলা হয়েছে, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় পাঠান শাসন ভেঙ্গে গেলে অরাজকতা আরম্ভ হয়। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে মুঘল শাসন একটা কমবেশী অস্ত্রধারী শাসন ছিল। কারণ পুরাতন হিন্দু রাজাদের ও আফগান রাজপুত্রদের ক্ষমতা তখনও ভঙ্গ হয় নাই। ইসলাম খাঁ-ই বাঙ্গলার সমস্ত স্বাধীন রাজাদের বিনষ্ট করেন এবং আফগানশক্তির অবশিষ্ট ধ্বংস দ্বারা "মোগল-শক্তি" আরোপ করে বাদশাহী শাসন সমস্ত বাঙ্গলায় প্রবর্তন করেন।

এতদ্বারা স্থিরীকৃত হয়, মোগলদের সঙ্গে বারভুঁইয়াদের যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যে দুইটি স্তর আছে। প্রথমতঃ মানসিংহের প্রথম সুবাদারীর কাল। এ সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিং পিতার প্রতিনিধিরূপে কাজ করতেন। ইনিই একবার পাঠানদের দ্বারা কয়েদ হন, কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর জামীন হয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তারপর হতে বীরহাম্বীর মোগলপক্ষীয় হন। কথিত আছে, বীরহাম্বীর জগৎসিংহকে স্বীয় কন্যা দান করেন।

জগৎসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর তরুণ পুত্র মহাসিংহ সেই পদ পান। এই

১। *Cambridge History of India :* Vol. IV পৃঃ ১১৯-১৪৫।

সময়ে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আনন, কেদার রায় প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির সহিত একবার করে মুঘলদের যুদ্ধ হয়। বাঙ্গলা পুস্তক ও হিন্দী "বংশাবলী" তারই প্রতিধ্বনি করছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহ পুনরায় সুবেদার হয়ে বাঙ্গলায় দ্বিতীয়বার আসেন; কিন্তু কয়েকমাস পরে পাত্‌সাহ কর্তৃক তাঁকে ফিরিয়ে লওয়া হয় এবং ইসলাম খাঁকে সুবাদার করা হয়। এ সময়ে ইহতিমাস খাঁ ও তাঁর পুত্র মির্জা নাথান নূতন সুবাদারী পল্টনে ছিলেন। মির্জা নাথান,[১] সুবাদার ইসলাম খাঁ ও পরের সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের শাসনকালে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল তা দেখে শুনে স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ পুস্তকে আমরা দেখি ইসলাম খাঁ পাত্‌সাহের বিপক্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধিতা দমন করেন। তাঁর সময়ে ঈশা খাঁ ও তাঁর ভ্রাতারা এবং তাঁর পক্ষের বারভুঁইয়ারা, আফগান ওসমান খাঁ, প্রতাপাদিত্য, ভূষণার সত্রাজিত, বাকলার রামচন্দ্র, কোচরাজ্যের (কামরূপ) রাজা পরীক্ষিত, আসামের অহম রাজা, ত্রিপুরার রাজা, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য, হিজলীর বাহাদুর খাঁ, আর পশ্চিম বাঙ্গলার বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের মুসলমান রাজা, বরদার (বর্তমানে গড়বেতা) দলপৎ, চন্দ্রকোনার চন্দ্রভান প্রভৃতি জমিদারেরা রাজসাহীর চিলজোয়ারের জমিদার পীতাম্বর (পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) ও তাঁর আত্মীয় অনন্ত প্রভৃতি পাৎসাহী শাসনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহাদের মধ্যে মূসা খাঁ, ওসমান খাঁ ও প্রতাপাদিত্য প্রধান ছিলেন। ইহার বাহিরে আরাকানের সহিতও যুদ্ধ হয়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুঘল সুবাদার ইসলাম খাঁর বেশীর ভাগ সময়ই "ভীরু" অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গলার হিন্দুকে দমন করতে অতিবাহিত হয়। বিনা বলপ্রয়োগে কেহই মাথা হেঁট করেন নি। মানসিংহ থেকে ইসলাম খাঁর সুবাদারীর শেষ সময় পর্যন্ত বাঙ্গলার বনিয়াদী স্বার্থের সহিত মুঘল স্বার্থের সংঘর্ষে কেটেছিল। ইংরেজ লেখকগণ এতদিন এ ঘটনাকে "আফগান বিদ্রোহ" বলে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়ে অন্ধ করে রেখেছিল।

দীর্ঘকালব্যাপী এ যুদ্ধের স্বরূপ কি তা' পূর্বেই উক্ত হয়েছে; ইহা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদেশীয় স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত। ইহা হিন্দু ও মুসলমানের

১। 'নাথান' নামটি প্রাচীন ইহুদীদের নাম। 'নথ' থেকে নাথান হয়নি। এরূপ অনেক ইহুদী নাম আরব এবং তজ্জন্য মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে; ইউরোপে Nathan, the Wise নামক গল্প সুপ্রসিদ্ধ।

স্বার্থের বিবাদ নয়, ইহা মুঘল ও পাঠানের যুদ্ধ। উভয়পক্ষেই হিন্দু ও পাঠান ছিল। মুঘলপক্ষে পশ্চিমের হিন্দু ও বাঙ্গলার হিন্দু ছিল। আর বাঙ্গলার আফগানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে হিন্দুও লড়ে এবং প্রাণও দিয়েছিল। তেমনি বাঙ্গলার হিন্দুর পক্ষেও পাঠান ছিল এবং হিন্দুর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে প্রাণদান করেছিল। মূসা খাঁ ছিলেন মহারাজ কালিদাস গজদানী ওরফে সোলেমান খাঁর পৌত্র এবং ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলার পুত্র। মির্জা নাথান বলেন, তাঁর তাঁবে একটা বারভুঁইয়া জমিদার দল ছিল।[১] অন্যপক্ষে ভুঁইয়াদের নামের খানাসীর জমিদার মাধব রায়, সাহাজাদপুরের জমিদার রাজা রায়, চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায়, বাকলার রামচন্দ্র, চিলজোয়ারের পীতাম্বর এবং অনন্ত, ভুলুয়ার অনন্তমাণিক্য। ইহারও বাইরে থাকেন ভূষণার সত্রাজিত রায় ও যশোরের প্রতাপাদিত্য। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর,[২] পঞ্চকোটের রাজা এবং বীরভূমের মুসলমান রাজাও এক সময় মুঘল শাসন মানেন নি।

সাধারণতঃ বারভুঁইয়াদের এই তালিকা দেখা যায়। কিন্তু মির্জা নাথান পুনঃপুনঃ মূসা খাঁর তাঁবে বারভুঁইয়ার উল্লেখ করেছেন। হয়ত তাঁর সঙ্গের জমিদারদের তিনি এই সংজ্ঞায় আখ্যাত করেছেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র ও ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য এবং ভূষণার সত্রাজিত মূসা খাঁর তাঁবে ছিলেন না।

এ ভুঁইয়াদের মধ্যে কোন সন্ধি বা 'সমঝোতা' ছিল কি? মির্জা নাথান এ বিষয়ে নীরব। তবে কেদার রায় যে ঈশা খাঁর এক পুত্র দায়ুদ খাঁর সহিত সহযোগিতা করত তা' নিখিলনাথ রায় বলেছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও তা-ই বলেন। আর মুঘলদের বিপক্ষে যেসব মুসলমান ও হিন্দু একত্রে রক্তমোক্ষণ করেছেন[৩] তাদের বিষয়ে মির্জা নাথান বলেছেন[৪] "মূসা খাঁর সহিত ইসলাম খাঁর জলযুদ্ধে মাধব রায়ের পুত্র এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাতা কামানের গোলাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন (নাথানের ভাষায় 'নরকে পাঠান হয়'—হিন্দু কিনা!)। পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে শোকার্ত মাধব রায় ও বিনোদ রায় প্রতিশোধ নেবার জন্য নৌকাযোগে শত্রুর দিকে ধাবমান হন। নৌকা থেকে নেবে তারা পাৎসাহী ফৌজের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করতে

১-২। Ethis : History of India, Vol. VI.
Blochman : Ain-i-Akbari.
৩। Hindusthan Standard.
৪। Borah : Islam.

থাকে। এই কালে পাত্‌সাহী সিপাহীরা তাদের ঢাল দিয়ে মুখ আচ্ছাদন করে নিজেদের বাঁচাতে থাকে। এ ভীষণ যুদ্ধের বিষয়ে মির্জা নাথান একটা কবিতা লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধের ঝন্‌ঝন্‌ আকাশে পৌঁছায়,
বাঙ্গালীর রক্ত জৈস্তন[১] নদীর ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে"।।

এই ছিল দীর্ঘকালব্যাপী মুঘল ও বাঙ্গালীর যুদ্ধ।

এরূপ মুঘলপক্ষে যেসব বাঙ্গালী-হিন্দু ছিলেন তাঁরাও অসীম সাহস দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মূসা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধকালে সত্রাজিত রায় অসীম সাহস দেখান। মির্জা নাথান বলেছেন ঃ He displayed his courage by offering a brave resistance. The Afghans gave hard battle to the followers of the Raja. সত্রাজিত বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দ্বারা তাঁর সাহস দেখিয়েছিলেন। আফগানেরা রাজার সৈন্যদের ভীষণ যুদ্ধ প্রদান করেছিলেন।[২]

এ'যুদ্ধ মুঘল রাজশক্তির পূর্বদিকে সম্প্রসারণ নীতির জন্য। নাথান বলেন, বাঙ্গলায় মুঘলদের আদর্শ ছিল পাৎসাহ ও কিবলা, অর্থাৎ মুঘল সম্রাটের অধীনে ভারতকে মুসলমান শাসনাধীন করা। অন্যপক্ষে, বাঙ্গলার দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর, সব ভৌমিকেরা স্বাধীন হলেন। মাথার উপর কাকেও কর দিবার লোক ছিল না, একচ্ছত্র কেহই হ'তে পারেন নি। বারভূঁইয়ার তালিকা থেকে বোধগম্য হয়, ভাটি অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গ) মুসলমান জমিদারের সংখ্যা ছিল বেশী। কিন্তু এ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণ বাদ গিয়েছেন।

অনুমান হয়, মাৎস্য-ন্যায়ের এই সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে ভৌমিকদের একটা "সমঝোতা" হয়েছিল। ৺সতীশচন্দ্র রায় তাই মনে করেন।[৩] হিন্দু-মুসলমান জমিদারেরা মুঘলদের বিপক্ষতা করেছিল। কিন্তু প্রবল চাপের ফলে সত্রাজিত প্রভৃতি পরাজিত হয়ে মুঘল দলে গিয়ে রাজস্থানের রাজপুতদের ন্যায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে বিবর্তিত হন। এদের মধ্যে সত্রাজিতের খুব নাম ডাক হয়। সব যুদ্ধেই তাঁর ডাক পড়ে। শেষ আসামের যুদ্ধে তিনি অহমদের সঙ্গে মুঘলদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেন। বোধ হয়, বাঙ্গলার সব শেষ হয়ে গেছে দেখে তার চোখ খোলে। ধরা পড়লে মুঘলেরা ঢাকায় তাঁকে ফাঁসী দেয়। এরূপে এক বীর বাঙ্গালীর জীবনাবসান হয়।[৪]

১। আমদরিয়ার পুরাতন নাম।

২। সতীশচন্দ্র রায় ঃ যশোহর ও খুলনার ইতিহাস।

৩-৪। সতীশচন্দ্র রায় ঃ যশোহর ও খুলনার ইতিহাস।

"বাহারীস্তান" পড়লে এ তথ্য স্পষ্ট চক্ষে পড়ে, বাঙ্গলা বিনা যুদ্ধে মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করেনি। দক্ষিণে সাগর দ্বীপ, হিজলী পশ্চিমে পাঁচেট; উত্তরে কামটা (কুচবিহার) ও কামরূপ, পূর্বে ত্রিপুরা, বাঙ্গলার এই সীমার মধ্যে প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি মুঘলদের যুদ্ধ করে জয় করতে হয়। বিনা অস্ত্র প্রয়োগে কেহই শির অবনত করেন নি। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একই যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গলার জন্য রক্তমোক্ষণ করেছেন।

তবু একতার বড় অভাব দৃষ্ট হয়। একতাবদ্ধ সমগ্র বাঙ্গলা যুদ্ধ করেনি। 'মাৎস্য-ন্যায়"ই বিরাজ করছিল। যে একজাতীয়তার প্রভাবে সকলে একত্রিতভাবে কার্য করে তার বড় অভাব বাঙ্গলায় তখন দেখা যায়। হিন্দুর বিপক্ষে হিন্দু গিয়েছে, মুসলমানদেব বিপক্ষে মুসলমান গিয়েছে। এক আদর্শ ইহাদের ছিল না। তখন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে এই মাৎস্য-ন্যায় রহিত করে একজাতীয়তার আগুনে সকলকে দ্রবীভূত করেননি। এ'র পূর্বে যিনি উঠেছিলেন, তিনি তো আচণ্ডালে প্রেমদান করতেই ব্যস্ত ছিলেন। বাঙ্গলা একজাতীয়তার আস্বাদ পেল না। মুঘল-শক্তি বাঙ্গলাকে হীনবীর্য করে দিল। তৎপরে এলো ইংরেজ-শক্তি। ইহার স্বরূপ গান্ধীজীর কথায়— Peace of the grave। (কবরের শান্তি)! বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে ঘনঘোর ঘটায় অন্ধকার নামল! অতীত আজ বিস্মৃতির অতলতলে!

প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গ ঃ বাহারীস্তান প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নূতন আলোক-পাত করছে বটে, কিন্তু এ সকল তথ্যের পশ্চাতে কোন্ ঐতিহাসিক বস্তু-তান্ত্রিকবাদের ঘাত-প্রতিঘাত হয়ে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়, তার কোন বিবরণ মির্জা নাথান দেননি। তাঁর পুস্তক মির্জা মনহাজ-উদ্দীনের পুস্তকের ন্যায়। বক্তিয়ার পুত্র এল, লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেল আর "নোদিয়া" দখল হল। নাথান কেবল যুদ্ধের ও মুঘলদের জয়ের কথাই বর্ণনা করে গেছেন। তিনি সন্ তারিখ বিশেষভাবে দেন নি; দু-এক স্থলে রণতরীর সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর পুস্তক একটি "রোজনামচা"র ন্যায়। ইহা জুলিয়ুস সিজারের "সল জয়" করার রিপোর্টের ন্যায় Veni (আমি আসিলাম), Vedi (আমি দেখিলাম), Vici (আমি জয় করিলাম)। তবে মুঘল বিজয়ের সময় কার সঙ্গে যুদ্ধ হল, তার পরিণাম কি, এসব তথ্য অমূল্য। আর এ পুস্তক তৎকালীন বাঙ্গলার রাজনীতিক অবস্থা বিষয়ে নূতন আলোক প্রদান করে। নাথানের পুস্তকে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের কিঞ্চিৎ চিত্র প্রদান করা হয়েছে। আমরা এ পুস্তক মধ্যে বাঙ্গালী জীবনের অনেক তথ্যই পাই। কেবল প্রতাপাদিত্যের বর্ণনা তুলে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করা

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কাজ নয়। এ পুস্তকে বর্ণিত বাঙ্গালী জীবনের কেবল পরোক্ষ দিক দেখলে চলবে না। প্রত্যক্ষ দিকও দেখতে হবে। Race Capacity বা Incapacity অর্থাৎ মূল জাতিগত কার্যকারিতা শক্তি বা অক্ষমতা দেখতে হবে। বাঙ্গালী মধ্যযুগে কি করেছিল, কতটা করবার তার শক্তি ছিল, কতটা জাতিগত শক্তি ছিল, কোন দোষে সে পড়ে গেল, এসব তথ্যের অনুসন্ধান এ পুস্তকের সংবাদ হতে বের করে বাঙ্গালী জাতির দেখা প্রয়োজন। কেবল জনপদগত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহ্নিতে ইন্ধন প্রদানে এ পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

প্রতাপাদিত্যের উত্থান ও পতন বাঙ্গলার সমাজের সহিত নিবিড়ভাবে বিজড়িত; তজ্জন্য প্রতাপাদিত্যের সম্পর্কিত সংবাদ এস্থলে আলোচিত হতেছে।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে মির্জা নাথানের সংবাদের সারাংশ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলে দিয়ে গিয়েছেন, তজ্জন্য তার সম্পূর্ণ পুনঃরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর কুলীখাঁর মৃত্যু হ'লে বাঙ্গলার সুবাদারী পদ ইসলাম খাঁকে প্রদান করেন। তিনি উপযুক্ত কায়দায় একটি সৈন্যদল এবং বড় নৌবহর নিয়ে বাঙ্গলায় যাত্রা করেন। পরে বাঙ্গলার অবস্থা শুনে তিনি বাদশাহী দরবারে এই মর্মে দরখাস্ত পেশ করলেন যে একজন খাঁটি লোককে দেওয়ান পদ প্রদান করা দরকার। যেসব কর্মচারী অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যারা এ প্রদেশের চাকরীতে থাকার অনুপযুক্ত তাদের দরবারে ফিরিয়ে নিতে হবে।

ফলে সৎ ও অভিজ্ঞ আবুল হাসানকে "মুত্তাকিৎ-খাঁ নাম দিয়ে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হল। ইহতিসাম খাঁকে (মির্জা নাথানের পিতা) নৌ-বহরের 'মীর-বহর' বা নৌ-সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল। বাঙ্গলায় যাবার সময় তাঁর উপর হুকুম হল, পাটনা রাজধানী থেকে প্রত্যেক জায়গায় মির্জা রাজা মানসিংহের লোকজন ও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আর বাঙ্গলা ও রোট্‌াস থেকে যেসব কামান আনান হয়েছিল তা' বাঙ্গলায় কার্যকালে ব্যবহার করতে হবে। বাঙ্গলা জয়ের বহর কি বিরাট! এ তথ্যের সঙ্গে ঘটককারিকার উক্তি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করবার জন্য অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং রাম রাম বসুর উক্তি—যে হিন্দুস্থানের সৈন্যদলের তিন হিস্যা বাঙ্গলায় নিয়ে আসা হয়, পুনঃ বাঙ্গলায় নুনের অভাব বলে রাজকুমার

সুলতান জাহান্দরের জন্য চার লক্ষ মণ নুন সঙ্গে দেওয়া হল। ১৬০৭ খৃঃ ৩০শে জুন ইহতিসাম খাঁ পুত্র ও আত্মীয়দের নিয়ে বাঙ্গলা যাত্রা করেন।

ইসলাম খাঁ ও প্রতাপাদিত্যের দূত ঃ ভাটি অঞ্চলে আক্রমণের জন্য ইসলাম খাঁ যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন আকবর নগরে (রাজমহল) অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে রাজা প্রতাপাদিত্যের দূত সেখবদী কুমার সংগ্রামাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বহু উপঢৌকন সহ ইসলাম খাঁর নিকট উপস্থিত হন। কিছুদিন পরে সেখ বদী এ চুক্তির পর এই সর্তে ফিরতে অনুজ্ঞা পান যে যথেষ্ট রণসম্ভার নিয়ে আলাইপুরে (পদ্মার উপরে রাজসাহী জিলা, পুটিয়ার ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব) রাজা স্বয়ং এসে পাৎসাহী দরবারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।[১]

আবদুল লতিফের বিবরণ ঃ এস্থলে অধ্যাপক সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত আবদুল লতিফের ভ্রমণ বিবরণে কিঞ্চিৎ পৃথক বর্ণনা আছে। মির্জা নাথান বলছেন, আবদুল লতিফ তাঁর বন্ধু ছিলেন।[২] ইনি বলেছেন, 'নওয়ারায় উঠিয়া আমরা গঙ্গার পথে আকবরনগর (রাজমহল) হতে নৌরাঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াস্ পরগণা পর্যন্ত গেলাম।...গৌড়, তাঁড়া, মালদা ও পাণ্ডুয়া শহর বামে রহিল ; আমরা তথায় নামলাম না।'

"২রা জানুয়ারী ১৬০৯ খৃঃ নবাব ইসলাম খাঁর দূত মির্জা আলীর সহিত উস্‌মান আফঘানের দূত সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করল। উস্‌মান বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করে এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য উপহার পাঠাবেন এরূপ মর্মে এক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখেছিলেন। নদী পার হবার সময় মহমুদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার রাজা শত্রুজিৎ ওরফে সাহাজাদা রায়ের ভ্রাতা কয়েকটি হাতী নিয়ে নবাবের সহিত দেখা করলেন এবং যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের দরখাস্ত পেশ করলেন। এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলীয়ান রাজা আর বঙ্গদেশে নেই। তাঁর যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে। তাঁর পুত্র কয়েকটি হাতী ও অন্যান্য উপহার নিয়ে রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করেছিল এবং তাঁর নিকট হতে অভয়বাণী পেয়ে (দেশে) ফিরে যায়। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করে পাঠান, আমি কি নিজে আসব ? আলাইপুর গ্রামে ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ এসে দেখা করে আঠারটি হাতী উপহার দিলেন ; ফতেপুর হতে ৩০শে মার্চ কুচ করে

১। Borah : Baharisten. Vol. I. p. 14.
২। Borah : Baharisten. Vol. I. p. 21.

রাণাতাণ্ডাপুর পৌঁছলেন। এখানে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সালিম খাঁ, পাঁচেটের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের[১] ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্য পুত্র, একুনে ১০৯টি ছোট-বড় হাতী নিয়ে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। "বাজুই রাস্তার অন্তর্গত বজ্রপুর নামক গ্রামে ২৬শে এপ্রিল রাজা প্রতাপাদিত্য নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ৬টি হাতী, মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু, প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন দিলেন। কয়েক-দিন নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকবার পর বিদায় নিলেন। "যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা পৃথ্বী ('ভারতী'ও পড়া চলে) কাশীতে একটি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন; ইহা মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভেঙ্গে ফেলতে হুকুম দেন; কিন্তু মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়।"[২]

এখন নাথানের বর্ণনায় ফিরে যাওয়া যাক্। তিনি বলেছেন, "তৎপর আত্রেয়ী নদীতীরস্থ সাহাপুর থানার উল্টা ধারে ইসলাম খাঁ সদলবলে এসে উপস্থিত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে—কি প্রকারে রাজা প্রতাপাদিত্যের দূত সেখ বদী সংগ্রামাদিত্যকে (রাজার ছেলে) ইসলাম খাঁর কাছে এনেছিলেন এবং কি অবস্থায় তিনি সংগ্রামাদিত্যকে পাৎসাহী কর্মের জন্য রেখে এবং প্রতাপাদিত্যকে পাৎসাহী সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ অধ্যক্ষ মধ্যে গণ্য হবার জন্য তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য এস্থলে আনীত হন এবং ইসলাম খাঁ অন্য জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এবং বাঙ্গলার জমিদারদের মধ্যে উক্ত রাজার উচ্চস্থান থাকার জন্য, তাঁকে অপরিসীম সম্মান প্রদান করলেন আর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে উৎসাহ দিলেন। প্রথম দিন তিনি ১টি ঘোড়া, একটি মহার্ঘ পোষাক, রত্নাদিখচিত তরবারীর কোমরবন্দ খেলোয়াৎ পেয়ে রাজভক্ত কর্মচারীতে পরিণত হন।"[৩]

ভাটিতে প্রতাপাদিত্যের যাবার হুকুম: "ইহার পর বর্ষা নামলে পাৎসাহী কর্মচারীদের পরামর্শে ইসলাম খাঁ ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রেখে ঘোড়াঘাটের দিকে অগ্রসর হয়ে মূসা খাঁ এবং বারভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে কুচ করতে মনস্থ করলেন। এজন্য তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত যুক্তি করলেন যে

১। ইঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন; 'ভক্তিরত্নাকর'।

২। যদুনাথ সরকার—'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ', প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬ সন।

৩। বাহারীস্তান—১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা ২৯)।

শেষোক্তের নিজের রাজত্বে ফিরবার পরই তিনি তাঁর পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ৪০০ রণতরীর সহিত পাঠাবেন। ইহা পাৎসাহী নৌ-বেড়ার সহিত যোগদান করে ইহতিমান খাঁর সহিত থাকবেন। আর ইসলাম খাঁর ভাটির দিকে কুচের সময়ে রাজা নিজে অগুাল (আড়িয়াল?) নদী দিয়ে মুসা খাঁ ও বিশ্বাস-ঘাতক জমিদারদের বিপক্ষে লড়বার জন্য ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য, তার পুত্রের নৌকা সমেত ৫০০ রণতরী আর ১০০০ মণ বারুদ নিয়ে আসবেন। উপরোক্ত চুক্তি অনুসারে ইসলাম খাঁ রাজা প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে নেন এবং তাঁর মাসোহারা বাবদ শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজস্ব প্রদান করেন (অবশ্য ইহা তখনও মূসা খাঁর রাজ্য!)। তিনি প্রতাপাদিত্যকে সম্মানজনক পোষাক, একখানি তরবারী, একটি রত্নখচিত কোমরবন্ধ, একটি রত্নখচিত কর্পূরদানী, ভাল উচ্চদরের ইরাকী ও তুর্কী ঘোড়া, একটি পুরুষ হাতী, দুটি স্ত্রী-হাতী এবং একটি পাৎসাহী কাড়া-নাকড়া উপহার দিলেন। এরপর রাজা শত্রুজিৎও তাঁর দেশে প্রেরিত হন এবং ইহাও স্থির হয় যে ভাটি অঞ্চল আক্রমণ-কালে তাঁর উপর যে হুকুম হবে তা তিনি তামিল করবেন।"[১]

এস্থলে আমাদের বক্তব্য যে আবদুল লতিফের মতে রাজা প্রতাপাদিত্যের ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৭০০ রণতরী ছিল। ইহার মধ্যে ইসলাম খাঁর সহিত চুক্তি অনুসারে তিনি ২০,০০০ পদাতিক ও ৫০০ রণতরী ভাটি অঞ্চলে পাঠাতে বাধ্য ছিলেন। তা হলে দেশরক্ষা করবার জন্য অবশিষ্ট কি ঘরে রহিল? এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের উক্তি খুব বেশী অত্যুক্তি নহে। অবশ্য তাঁহার বর্ণিত সংখ্যা দুইশত বৎসর পরে লোকমুখে অতিরঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক।

প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা: "ভাটি অঞ্চল জয় হবার পর রাজা প্রতাপাদিত্য নিজের কার্যের হিসাব নেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার ভেবে, তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য খুব অনুতাপ করতে লাগলেন। তিনি পাৎসাহী সরকারের জন্য ৮০ খানা নৌকাসহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে পাঠালেন এবং পূর্বকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাও চাইলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁ ইমারৎ তত্ত্বাবধায়ককে এসব নৌকা মোট বহন করিয়ে নষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হুকুম দিলেন। প্রতাপাদিত্যকে শাস্তি দেওয়া ও যশর রাজ্য জয় করবার জন্য ঘিঁয়াস খাঁর অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল ও অসংখ্য রণতরী প্রেরণ করেন। (ঘিঁয়াস খাঁর উপাধি ইনায়েৎ খাঁ। কিন্তু 'বাহারীস্তান' পুস্তকে ঘিয়াস খাঁ নামই সর্বত্র লেখা হয়েছে। মুঘলেরা পাঁজি দেখে যুদ্ধযাত্রা করত।

১। বাহারীস্তান—১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা ৩০)।

ফার্শি বাহারীস্তানে যশর বানান আছে। ইংরেজী অনুবাদে Jasr লেখা আছে। ঐ বানানই এখানে অনুসৃত হ'ল।) ঘিঁয়াস খাঁ শুভদিনে যুদ্ধযাত্রা করেন। অন্য লোকসমূহ মধ্যে মির্জামাক্কি ও মির্জা নাথানকে সঙ্গে নেন, এ'সঙ্গে দক্ষিণের হিজলী থেকে বাহাদুর সা হিজলীওয়ালা প্রভৃতি যোগদান করেন। এরাও ইসলাম খাঁ ও লছমী রাজপুত্রের বাছাই করা একশত অশ্বারোহী সৈন্য, বহু সংখ্যক মনসব্দারের দল ও অন্যান্য কর্মচারী ৫০০০ গাদা বন্দুকধারী সৈন্য, ইহতিমান খাঁর অধীনে ৩০০ পূর্ণভাবে সজ্জিত পাৎসাহী নৌ-বেড়া, কামান এবং মূসা খাঁ মসনদ-ই-আলাও তার ভাইদের এবং অন্যান্য জমিদারগণের রণতরীসমূহও এ'সঙ্গে ছিল। এককথায় শত্রুর বিপক্ষে অফিসারদের বিভিন্ন তাঁবু থেকে পাৎসাহী ফৌজ যুদ্ধযাত্রা করে।"[১]

নিম্নের তালিকায় পাৎসাহী সৈন্যদলের পুরা সংখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু তুলনা করে দেখা যায়, ওসমান খাঁ এবং মূসা খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধের তোড়জোড় ও প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষেই বা তাহা কত!

	কামান	বন্দুকধারী পদাতিক	রণতরী	অশ্বারোহী	হাতী
ওসমান খাঁর বিপক্ষে	—	২০০০	৪০০	১০০০	৩০০ (প্যারা ১২৮)
মূসা খাঁর বিপক্ষে	৫০	১০০০	১৩৫		(প্যারা ৫১)
প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে	—	৫০০০	৩০০ + মূসা খাঁ ও বারভুঁইয়াদের রণতরী ৭০০ (প্যারা ৫৬)	১০০০	(প্যারা ১২৬)

অন্যদিকে মূসা খাঁর বিপক্ষে মুঘল-যুদ্ধসজ্জার কোন তালিকা মির্জা নাথান দেননি। তবে তিনি সাহাজাদাপুরে যে নৌ-বেড়ার প্রদর্শনী হয়েছিল তার বর্ণনা ৪৯ প্যারায় দিয়েছেন। পোতাধ্যক্ষ হয়ে যে নৌ-বেড়া ও কামান-সমূহ এনেছিলেন, তার সংখ্যা ১৩৫ খানা নৌকা (প্যারা ৫১)।

পুনঃ মূসা খাঁ ও তাঁর বারভুঁইয়ার নৌ-বেড়ার সংখ্যা ছিল ৭০০ (প্যারা ৫৬)।

এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে রণদুর্মদ আফগানদের বিপক্ষে যুদ্ধের তোড়জোড় অপেক্ষা 'ভীরু' অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীর 'গেঁইয়া ভুঁইয়া'র ধ্বংস

১। বাহারীস্তান—১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা ১২৬)।

সাধনে পাৎসাহা গভর্ণমেন্টের কি ভীষণ আয়োজন হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত, পাছে ওসমানের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোন যোগাযোগ হয় সেই আশঙ্কায় সুবাদার ওসমানকে আটকাবার জন্য তাঁর বিপক্ষে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন (প্যারা ১০৩—১২৩)।

ওসমানখাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ ঃ "মূসাখাঁ বুঝলেন যে মুঘলদের বিপক্ষে লড়লে তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী ইহজগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। এজন্য তিনি মুঘলদের সহিত সন্ধি করে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কথা হল তিনি সুবাদারের দরবারে থাকবেন (তিনি ইসলাম খাঁর শাসনকালে বরাবর নজর-বন্দী ছিলেন)। আর তার ভ্রাতা মামুদ খাঁ জমিদারদের নিয়ে ঘিয়াস্ খাঁর অধীনে ওসমান আফগানের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করবেন (প্যারা ১০৩)। ওসমানের বিপক্ষে নিম্নলিখিত সৈন্যদল প্রেরিত হল ঃ সেখ ইসলামের অধীনে বাছা-বাছা ১০০০ অশ্বারোহী, নৌ-বেড়ার বন্দুকধারীদের ছাড়া আরও ৫০০০ বন্দুকধারী, বারভুঁইয়ার নৌ-বেড়া, ভারী কামানযুক্ত আরও ৩০০ পাৎসাহী রণতরী এবং ৩০০ অভিজ্ঞ রণহস্তী।" (প্যারা ১০৪)

খামখেয়ালীভাবে যুদ্ধের পর ওসমান ও তার আফগান দল লাউর পর্বতের পথে শ্রীহট্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (১১৭)। এ'প্রকারে ওসমান পূর্বে আটক রইলেন। ওসমানের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোন যোগাযোগ রাখবার আর রাস্তা রইল না। বাকি থাকল মধ্যখানে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্র।

বাকলা বিজয় ঃ "বাকলা" চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) রাজা রামচন্দ্র। ঘিয়াস খাঁকে পূর্ব হতে আনয়ন করে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে পাঠাবার পর ইসলাম খাঁ বাকলা জয় করতে মনস্থ করেন। সেজন্য সৈয়দ হাকিমের অধীনে অনেক লোকজন দিয়ে রামচন্দ্রের বিপক্ষে পাঠান—একটি বড় নৌ-বেড়া, ৩০০০ বন্দুকধারী, ২০০ হাতী এবং অন্যান্য আরও রণসম্ভার। এ'দলে রাজা সত্রাজিত ছিলেন (কেহ কেহ শক্রজিত বানান দেন, কিন্তু ইংরাজীতে Satrajit বানান আছে)।

এদিকে রাজা রামচন্দ্রের মাতা পুত্রের মুঘল সৈন্যের বিপক্ষতাচরণের আপত্তি করেছিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে পাৎসাহী সৈন্যদের বিপরীত দিকে এক কেল্লা নির্মাণ করেন। সাতদিন ধরে চলে খুব বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম। কিন্তু কেল্লা যখন আক্রান্ত হল এবং শত্রুসৈন্য অগ্রসর হতে লাগল তখন রাজমাতা. পুত্রের কার্যের প্রতিবাদে বিষ-পানে প্রাণত্যাগ করবার ভয় দেখালেন। এমতাবস্থায় রাজা তখন পাৎসাহীদের

সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি ও সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা জানান। ইসলাম খাঁকে এ'বিষয়ে লেখা হলে, তিনি রাজা সত্রাজিতের সঙ্গে রাজা রামচন্দ্রকে ঢাকায় পাঠাবার হুকুম দেন। আর সৈন্যদলকে এদিকে (পূর্ব-দিকে) প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে চাপ দিবার জন্য বলেন।

এ-হুকুম অনুযায়ী সৈয়দ হাকিম ও তাঁর সৈন্যদল যশোরাভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা সত্রাজিৎ রাজা রামচন্দ্রকে ইসলাম খাঁর নিকট নিয়ে যান। যেটুকু সম্পত্তি রামচন্দ্রের নৌ-বেড়া রক্ষার জন্য দরকার ততটুকু ভূমি ইসলাম খাঁ তাঁকে দিলেন। বাকী সম্পত্তি কড়োরি ও জায়গীরদারদের দেন। রাজা রামচন্দ্র, মূসাখাঁ ও অন্যান্য জমিদারের ন্যায় ঢাকায় নজরবন্দী হয়ে থাকেন। রাজা সত্রাজিৎ বহু সম্মান পেয়ে সৈয়দ হাকিমকে সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন। তারপর মুঘলসৈন্য যশোরের দিকে এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটি দিয়া অগ্রসর হতে লাগল।" (১২৯)।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা: এক্ষণে ঘিয়াস খাঁ এসে পাৎসাহী দলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। রাস্তায় মহাদেবপুর বা ঘোয়াল (কৃষ্ণনগর হতে ২০ মাইল উত্তরে ভৈরবের তীরে) নামক স্থানে মুঘলসৈন্য পৌঁছল। তথায় তিনি দেখলেন, পাৎসাহী কর্মচারীরা ও মির্জামক্কি এখনও এসে উপনীত হননি। 'কিছু না করে খুড়ার 'গঙ্গাযাত্রা করার' ন্যায় বাঘাগ্রাম (বোধ হয় ত্রিবেণীর পরপারে অবস্থিত) সেনাপতি লুণ্ঠন করালেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। অধিবাসীদের পীড়ন করার পর তারা তথায় দুর্গ তৈরী করে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু এ লুণ্ঠনের সময় মির্জা সৈফুদ্দিন বহু সংখ্যক সুন্দরী স্ত্রীলোকও লুণ্ঠন করেছিল। ঘিয়াস খাঁ তাদের কতকগুলিকে নিজের জন্য চায়; কিন্তু মির্জা তা প্রত্যাখ্যান করে (১৩০)।" পরে সৌফুদ্দিন জায়গীরচ্যুত ও কয়েদ হয় (১৩১)।

উদয়াদিত্যের কেল্লা নির্মাণ: "যশর রাজ্যের কাছে ঘিয়াস খাঁ উপস্থিত হলে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে সালকা (ইছামতী নদীর কাছে, বুরানহাটীর ২২ মাইল উত্তরে) নামক স্থানে খাজা কনওয়ালের (কমল)[১] নেতৃত্বে ৫০০ রণতরী, ১০০০ অশ্বারোহী, ৪০টি 'মস্ত' হাতী সেনাপতি জমাল খাঁ-র (উড়িষ্যার আফগান রাজা কতলুখাঁ-র পুত্র) অধীনে পাঠিয়ে দেন। উদয়াদিত্য সুরক্ষিত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন (১৩২)।

জল-যুদ্ধ: প্রথমে প্রতাপপক্ষীয় নাবিকরা যুদ্ধে যোগ দেয়নি। মির্জা

১। খাজা কামাল বা কামাল বাঙ্গলায় "কমল খোজা" বলে বর্ণিত হয়েছেন।

নাথান নদীর উভয়তীরে দুটি দুর্গ নির্মাণ করার হুকুম দেন। যখন কেল্লা আধা নির্মাণ হয়েছে তখন হঠাৎ খাজা কমলকে অগ্রবর্তী করে উদয়াদিত্য তাঁর নৌ-.বড়া নিয়ে হাজির হন। অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব করেছিলেন খাজা কমল। তাঁর সঙ্গে পিয়ারা, কোসা বা কুসা (Kusa), বলিয়া (Balia) পাল (Pal) ঘুরাব (Ghurab), কামান সজ্জিত নৌ-বাহিনী (Floating battery), কামানবাহী পোত (Gun-boat), মাছুয়া (Machua), পস্তা (Passta) এবং জালিয়া (Jalia-Gallia) প্রভৃতি রণতরী ছিল। উদয়াদিত্য অন্য প্রকারের নৌকা নিয়ে মধ্যে ছিলেন। তিনি কামাল খাঁ-কে কেল্লা রক্ষা করতে বললেন। এককথায়, আশ্চর্যজনক গোলমাল বা শব্দ উঠলে তাঁর লোকেরা নৌকায় উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় (১৩৪)।[১]

উদয়াদিত্যের নৌ-বেড়া ছিন্ন-ভিন্ন ঃ শত্রুর নৌকা মির্জা নাথানের নৌ-বেড়াকে ঘিরে ফেলে। মির্জা নাথান অশ্বারোহী নিয়ে নিজের লোকদের সাহায্য করতে চান কিন্তু জলা জমি দেখে ফিরে গিয়ে শত্রুর নৌ-বেড়া আক্রমণ করেন।...কিন্তু মির্জা নাথান এমন জায়গায় এসে উপস্থিত যে খাজা কমলের নৌ-বেড়া তাঁর পেছনে, আর উদয়াদিত্যের নৌকাসমূহ তাঁর সম্মুখে ও পাশে। খানিকক্ষণ লড়াইয়ের পর নাবিকদের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল হয়; আর এই গোলমালে শত্রুর নৌ-বেড়া পরাজিত হয় এবং খাজা কমল কামানের গোলাতে নিহত হয়। এজন্য শত্রুর লোকদের আর দৃঢ় সঙ্কল্প নিবার সাহস ছিল না (১৩৫)।

অন্যপক্ষে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতে উল্লিখিত আছে, নৌ-সেনাপতি সাতদিন ও সাতরাত্রি না খেয়ে যুদ্ধ করে গুলির আঘাতে মারা যান। ডাঃ বোরাই স্বীকার করেছেন[২] যে থানা সালিকা বা সালিখাতে মুঘলদের প্রথম আটকান হয়।

উদয়াদিত্যের পলায়ন ঃ যদিও শত্রু তাদের তীর ও গুলি শিলাবৃষ্টির ন্যায় ছুঁড়ছিল, উদয়াদিত্য খাজা কমলের মৃত্যুর পর মুখে কালা দিয়ে পলায়ণ করেন। যদিও জমিদারী নৌকাসমূহ শত্রুর নৌকা লুঠ করছিল, মির্জা নাথানের অধীনের ৪ খানা খাস পাৎসাহী কোষা এবং আর দুখানা যাহা মূসাখাঁ ও বাহাদুর গাজীর নৌ-অধ্যক্ষদের ছিল তাহাও উদয়াদিত্যকে ধরবার জন্য ছুটল। মির্জা নাথান নদীর কিনারা দিয়ে দৌড়াল।

১। ইহা কি প্রাচীনকালের নৌ-যোদ্ধাদের "হী—হী" নামক রণধ্বনি?

২। বাহারীস্তান—২য় খণ্ড ; ফুটনোট পৃঃ ৮২১

উদয়াদিত্য ধরা পড়ে আর কি, এমন সময় প্রভুভক্ত ফিরিঙ্গি পরিচালিত ১ খানি পিয়ারা, ৪ খানা ঘুরাব এবং ১ খানা মাছুয়া নোঙ্গর ফেলে পাৎসাহী নৌকাগুলিকে আটক করে। অবশেষে মির্জা নাথান ও লছমী রাজপুত কিনারা দিয়ে তথায় আসে। এ-নৌকাগুলিকে তীর ছুঁড়ে কাবু করা হয়। এককথায় উদয়াদিত্য নদীর এমন একটা সরু জায়গায় আছেন যেখানে পলায়মান নৌকাসমূহের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় উদয়াদিত্য তীর ছুঁড়তে থাকেন। দু'খানা পাৎসাহী কোষা পাশে এসে দাঁড়ায় এবং মির্জা নাথান তীর পথে এসে উদয়াদিত্যকে ধরবে এমন সময় উদয়াদিত্যের নিজের কোষার নাবিকেরা প্রভুকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা দ্বারা তাদের প্রভুভক্তি দেখায়। তাদের নৌকা যখন দাঁড় টেনে ও বৈঠা ধরে দ্রুত গতিতে বেয়ে কোষার পেছন দিকে মহলগিরি নৌকায় স্পর্শ করে, সে মুহূর্তে মির্জা নাথানের কোষা দু'টি মহলগিরি নৌকার পশ্চাৎভাগ স্পর্শ করেছে। মহলগিরির নাবিক ও সৈন্যেরা পাৎসাহী কোষা আসায় ভয় পেয়ে কতক তীরে দৌড়ে পালায় আর কতক নদীতে লাফিয়ে পড়ে। হঠাৎ উদয়াদিত্য তার দুই স্ত্রীর হাত ধরে তার কোষায় লাফিয়ে পড়ে। মুহূর্তে নাবিকেরা অন্যান্য পলায়মান নৌকা অতিক্রম করে আগে চলতে লাগল, মির্জা হাত কচলাতে কচলাতে পিছু দৌড়াল কিন্তু ধরতে পারল না (১৩৬)।

এ জলযুদ্ধকে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বাঙ্গলার 'সালামিস্' যুদ্ধের ন্যায় বলেছেন। পারসীকদের ন্যায় এবং স্পানিস "আর্মাডা"র মতন প্রতাপাদিত্যের বেশী সংখ্যক নৌকাই পরাজয়ের কারণ হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় মনে হয় না যে দু'চার ঘণ্টায় এ যুদ্ধের শেষ হয়েছিল। খাজা কমলের মৃত্যুর পর উদয়াদিত্য ভগ্নোৎসাহ হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু যুদ্ধের আসল বর্ণনা আমরা এতে পাই না। রামরাম বসু কি কিছু অতিরঞ্জিত করে বলেছেন?

সালিখার কেল্লা দখল: উদয়াদিত্যের নৌ-বেড়ার মধ্যে ৪২ খানা তাঁর সঙ্গে পালায়। বাকী নৌ-বেড়া ও কামানগুলি মির্জা নাথানের হাতে পড়ে। উদয়াদিত্যের পরাজয়ের পর জামাল কেল্লা খালি করে হাতীগুলি নিয়ে পালায় (১৩৭)।

ঘিয়াসখাঁ বুধনে আসেন: দখলীকৃত কেল্লায় এক রাত্রি কাটাবার পর ঘিয়াসখাঁ সসৈন্যে বুধন কেল্লায় আসেন। বুধ বা বুরহন হয়ত বুরন হাটি। ইহা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের তিন মাইল পূর্বে—ইছামতী নদী ইহার পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত।[১]

১। বোরা বলেন, বোধ হয় ইছামতীর কোন ঘাট ছিল।

মির্জা নাথান রণক্লান্তির জন্য নিজের নৌকায় বিশ্রাম করছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর ভ্রাতার পদাতিকদল পাঠিয়ে দেন। এ সৈন্যদল না জেনে ৪০০০ বৃদ্ধা ও যুবতীদের বন্দী করে নিয়ে আসে; কিন্তু মির্জা নাথান এসব রায়তদের নির্ভয় আশ্বাস দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা পরিবারবর্গ নিয়ে নদী পার হয়ে বুধনে আসেন। মির্জা শুনে তাদের (সৈন্যদলকে) খুব ধমকান এবং কড়া অনুসন্ধান করে সকলকে খালাস করে দেন।

অধার্মিক সৈন্যেরা এ অসহায় ব্যক্তিদের বস্ত্রাদি সব কেড়ে নিয়ে গেছে। তথায় অন্য কাপড় না থাকায় মির্জা নাথান তাদের প্রয়োজন মত ইজার, বিছানার চাদর এবং পরিবার কাপড়ও দান করেন এবং তাদের ফিরে যাবার জন্য ও পথ খরচ বাবদ নগদ অর্থ দেন (১৩৮)।

প্রতাপাদিত্যের সন্ধির বৃথা চেষ্টা ঃ যখন প্রতাপাদিত্য দেখলেন যে পাৎসাহী ফৌজ বুধন থেকে আরও অধিক অগ্রসর হয়ে পড়েছে এবং উদয়াদিত্যকে পরাজিত করে বুধন কেল্লা (যে কেল্লা তাদের আটকাবার জন্য তৈরী করা হয়েছিল) দখল করে ফেলেছে, দ্বিতীয় সৈন্যদল বাকলা জয় করে সৈয়দ হাকিম, মির্জানুরুদ্দীন, রাজা সত্রাজিৎ ও অন্যান্য অফিসারদের অধীনে যশরাভিমুখে এসে পড়েছে তখন তিনি বুঝলেন যে কোমর বেঁধে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। সেজন্য যশর দুর্গ (ধুমঘাট) থেকে বহুদূরে এক কেল্লা নির্মাণ করতে লাগলেন। এ প্রচেষ্টা পাৎসাহীদের নিকট লুকাবার জন্য এবং কেল্লা তৈয়ারী করবার সময় পাবার জন্য পাৎসাহীদের এক মিথ্যা সন্ধির প্রস্তাবে ব্যাপৃত রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি যশর নদী (ভৈরব) ধরে বুধন কেল্লায় আসেন এবং মির্জা নাথানের নিকট দূত মারফত খবর পাঠালেন ঃ "যেহেতু তোমার পিতা আমায় পুত্র বলেন, যেহেতু আমি নিজেকে ভ্রাতা বলে মনে করি, আমাকে ঘিয়াসখাঁর নিকট নিয়ে যাবার জন্য তোমায় অনুরোধ করছি।" তৎপর মির্জা নাথান ঘিয়াসখাঁ-এর অগ্রগমন বন্ধ করে এ প্রস্তাবের কথা বললেন। ঘিয়াসখাঁ একজন জ্ঞানী দূত মারফত বলে পাঠালেন, "আমি ধাপ্পাবাজীতে (tricks) রাজী হতে পারি না। যদি তোমার কথার সত্যতা রাখ, তাহ'লে আমার সঙ্গে কাল দেখা করবে; তা না হ'লে আমি পরশু যশরাভিমুখে কুচ্ করব এবং তোমার অতিথি হব। তুমি সেখানেই আমার সাক্ষাৎ পাবে।" যদিও প্রতাপাদিত্য একপ্রকারের চালাকী খেলে দু'একদিনের সময় নিতে চেষ্টা করেন, দ্বিতীয় দিনে দূত ফিরে এসে সংবাদ দিল যে প্রতাপাদিত্যের কথার সত্যতা নেই। তাঁর উদ্দেশ্য সময় নিয়ে নিজেকে

শক্তিশালী করা। এ'মতে তৃতীয় দিনে পাৎসাহী দল কুচ করে খারাওয়ান' ঘাটে পৌঁছলেন (১৪১)।

এস্থলে দেখা যায়, ইহতিমান খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের পুত্র ও পিতৃবৎ সম্বন্ধ থাকাতে এককালে তাঁর উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। ইহতিমান খাঁর আসল নাম—মালিক আলি। আকবরের সময়ে তিনি ২৫০ অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি কিছু দিন আগ্রার কোতোয়াল হন। দিল্লীর দরবারে যে প্রতাপাদিত্যের প্রথম যৌবনকাল কাটে তা' মিথ্যা নয়।

প্রতাপাদিত্যের আত্মরক্ষার চেষ্টা : প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর (যমুনার একাংশকে এই নামে ডাকা হয়) কাগারঘাটা খাল (যশবের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত) মধ্যে সালকার দুর্গের মতন আর একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। অসংখ্য রণতরী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নদীতে থাকে এবং দুর্গের মধ্যে বড় কামান, বৃহৎ সৈন্যদল, হাতীর দল ও অনেক পদাতিক সৈন্য নিয়ে প্রতাপাদিত্য স্বয়ং অবস্থান করতে থাকেন।

নাথান প্রতাপাদিত্যের কেল্লা দখল করেন : ঘিয়াস খাঁ এ বিষয় অবগত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় মির্জা নাথানকে পূর্বের লড়াইয়ের মতন নদীর দক্ষিণকূলে যেতে বললেন এবং নিজের সৈন্যদের লড়তে বললেন। ঘিয়াস খাঁ নিজের সৈন্য নিয়ে বাম দিকে লড়তে মনস্থ করলেন। ঘোর বৃষ্টি সত্বেও রাত্রিযোগে মির্জা নাথান নদী পার হলেন এবং প্রত্যুষে সৈন্যদল উভয় তীর দিয়ে কুচ করলে। নৌ-বেড়া তাদের মধ্যে চলল। তাদের প্রতিজ্ঞা রাজা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ দখল করবে-ই। শত্রুর নৌ-বেড়া ভাগীরথী যাহা যশরের দিকে প্রবাহিত তার মুখে খাড়া ছিল। ইহা পাৎসাহী কামানের এবং দু'ধারের সৈন্য দলের বন্দুকের গুলির আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের দিকে হটে গেল। পাৎসাহী নৌ-বেড়া ও অনুগত জমিদারগণের রণতরীসমূহ নদীর মুখের কাছে আসল। যতই তারা দুর্গের নীচের নদীতে আসবার চেষ্টা করতে লাগল ততই তারা অপারগ হল, কারণ দুর্গের উপর থেকে কামানের ভীষণ গোলাবৃষ্টি হতে থাকে। ভাগীরথী নদীই ঘিয়াসের সৈন্যদের অগ্রগমনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মির্জা নাথান ও লছমী রাজপুত তাদের সব প্রভুভক্ত সঙ্গীদের নিয়ে কাগারঘাটা খালের কাছে গিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করল! যদিও তার ২০০ অশ্বারোহী ও ১০ হাতী একটা বদলার কাদা মাটিতে আটকে যায়, আর উপর থেকে কামানের গোলা ও তীর শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাদের উপর পড়ছিল, যাতে মৃত্যুর দূতের বাজার বড়

গরম হয় (অর্থাৎ শত্রু ভীষণ ভাবে মরে)। তথাপি তারা তাদের প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ কার্যে পরাঙ্মুখ হয়নি। তাঁর সমস্ত শক্তি খাল পার হতে নিয়োজিত করে নাথান নিজের নৌ-বেড়াকে হুকুম দিলেন, "যখন আমি হাতীদের ইস্পাতের বর্ম পরিয়ে তাদের পিঠে চড়ে খাল পার হব তোমরা তখন তোমাদের নৌকা নিয়ে নদীতে দৌড়াবে ; কারণ হাতীদের পার হবার সময় শত্রুর নৌ-বেড়া তোমাদের জয় করতে পারবে না"। এক কথায়, যখন মির্জা নাথান ও তার প্রভুভক্ত যোদ্ধাগণ তাদের হাতী নিয়ে শত্রুর দুর্গের উল্টা দিকে ঢুকলেন সে সময় মির্জা নাথানের অফিসাররা পাৎসাহী নৌ-বেড়া নিয়ে প্রতাপাদিত্যের রণতরীসমূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রু মির্জা নাথানের আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল, তাহা তাদের নৌ-বেড়ার সাহায্যে আসতে পারল না।

এভাবে পাৎসাহী সৈন্য শত্রুর নৌ-বাহিনী জয় করে। মির্জা নাথান তাঁর হাতীগুলি নিয়ে খাল পার হয়েই ঐগুলিকে শত্রু দুর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। মির্জা নাথানের লোকেদের পরিচালিত পাৎসাহী নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র দুর্গের নীচে একস্থানে উপনীত হয়। যদিও মৃত ও আহতদের দেহের বিরাট বিবাট স্তূপ সৃষ্টি হয়েছিল তথাপি, অদৃষ্টের লিখন, প্রতাপাদিত্য আর প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে পলায়ন করলেন, মির্জা নাথান দুর্গ দখল করে বিজয়-ভেরী ঘোষণা করলেন। বিজয়ের এ সংবাদ ইসলাম খাঁর নিকট পাঠান হয় (১৪২)।

মির্জা নাথানের এ যুদ্ধ বর্ণনা একটু নাটকীয় ধরণের। তিনি কেবল নিজের বাহাদুরীর কথাই বর্ণনা করেছেন। পাৎসাহী সৈনাদল কি ঘিয়াসের অধীনে "চিত্রার্পিতে"র ন্যায় রণ-লহরী গুণতেছিলেন ? আর প্রতাপাদিত্যের স্থলবাহিনীই বা কি করছিল ? নাথানের কেবল ১০টা হাতীই কি দুর্গ ভেদ করল ? দুর্গাভ্যন্তরেও তো হাতী ছিল ! বর্ণনায় এ প্রকার অনেক ফাঁক আছে। তবে নাথান বর্ণিত প্রবল বৃষ্টির কথা "অন্নদামঙ্গল" এবং ক্ষিতীশ বংশাবলী গ্রন্থে আছে। অন্যদিকে চন্দ্রদ্বীপ ঘটককারিকায় বর্ণিত হয়েছে —শেষযুদ্ধ স্থলপথেই হয়েছিল। যা'হোক, ইহাই প্রতাপাদিত্যের শেষ যুদ্ধ। ঘটককারিকা মতে, এযুদ্ধে তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট সেনানী হত হন।

জামাল খাঁর পাৎসাহী দলে যোগদান ঃ প্রতাপাদিত্য ভগ্নহৃদয় ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে যশরে ফিরে গিয়ে উদয়াদিত্যের সঙ্গে মিলিত হন। জামাল খাঁ এ'সময় যশরে ফিরে যাননি। তাঁর পরিবারবর্গ ও মালপত্রাদি কাগারঘাটায় ছিল। তিনি রাজাকে পরিত্যাগ করে পাৎসাহী দলে ভিড়লেন (১৪৩)।

প্রতাপাদিত্যের পিতৃবন্ধু কতলু খাঁর পুত্র যে জামাল খাঁকে বিপদকালে প্রতাপাদিত্য আশ্রয় দিয়ে বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত করেছিলেন তিনিও দুঃসময়ে শত্রুপক্ষে যোগদান করলেন।

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ ঃ 'ঘিয়াস খাঁ যখন সদলবলে কাগারঘাটায় তাঁবু গাড়লেন তখন রাজা প্রতাপাদিত্যের গুপ্তচরেরা তাঁকে খবর দিল সৈয়দ হাকিমের সৈন্যদল এসেছে।' তিনি তাঁর পুত্র উদয়াদিত্যের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন "যখন আমরা পাৎসাহী সৈন্যদ্বারা দু'ধারে পরিবেষ্টিত হয়েছি, যখন পাৎসাহী অফিসারেরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, 'হার্মাদ' ফিরিঙ্গিরা যারা শান্তির সময়েও যশররাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে ছাড়ে না, তখন তারাও অধিকতর সাহসী হয়ে আমাদের রাজ্য ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে। ফলে আমাদের কোনও সুবিধা হবে না। এমতাবস্থায় ভাল হবে আমি যদি স্বেচ্ছায় পাৎসাহী অফিসারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম খাঁর সম্মুখে হাজির হই। দেখি, কি হয় এবং আমার ভাগ্য কি করে! এর পর যদি ভাগ্য সাহায্য করে আমাদের রাজ্য রক্ষা করবার চেষ্টা করা যাবে।"

এরপর দু'জন কর্মচারী (পেশদাস্ত) নিয়ে কোষায় চড়ে ঘিয়াস খাঁর তাবুতে এসে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। এ'দিনই কাগারঘাটাতে পাৎসাহী তাঁবু গাড়া হচ্ছিল। ঘিয়াস খাঁ সেখ মোমীন নামে তাঁর এক আত্মীয় ও সৈয়দ মামুদ যিনি ইসলাম খাঁর অধীনে বারভুঁইয়াদের নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তাদের রাজাকে অভ্যর্থনা করতে পাঠালেন। তাঁরা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে করমর্দন করে খুব সম্মানের সহিত ঘিয়াস খাঁর নিকট নিয়ে আসেন। খাঁও তাঁকে অতি ভদ্রভাবে গ্রহণ করেন এবং বসবার আসন প্রদান করেন। খানিকক্ষণ পরে একটি ঘোড়া ও উপযুক্ত সম্মানের পোষাক খেলোয়াত প্রদান করা হয় এবং তাঁর নিজের তাঁবুতে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হয়। রাজা মির্জা মাক্কি ও মির্জা নাথানের শিবির দর্শন করেন। তাঁরাও তাঁকে ঘোড়া ও সম্মানীয় পোষাক খেলোয়াত দেন। রাজা প্রীত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যান। স্থির হয় যে উদয়াদিত্যের কাছে তাঁর অফিসারদের রেখে তিনি ঘিয়াস খাঁর সঙ্গে জাহাঙ্গীর নগরে যাবেন। আর যতদিন না সুবাদারের কাছ থেকে ভবিষ্যতের জন্য আর কোন হুকুম আসে ততদিন পাৎসাহী অফিসারেরা কাগারঘাটা তাঁবুতে থাকবেন। যদিচ সকলেই এ বন্দোবস্তে রাজী হয় কেবল ইয়াতি খাঁর পুত্র মির্জা মাক্কি আপত্তি করেন। তখন ঘিয়াস খাঁ মির্জা নাথানকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে মির্জা মাক্কি এই ব্যবস্থায় রাজী হয়। চতুর্থ দিনে রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে ঘিয়াস খাঁ জাহাঙ্গীর

নগর যাত্রা করেন। তিনি জমিদারদের সব নৌবহর তথায় রেখে যান এবং সাবধানতার জন্য ৪০ খানা পাৎসাহী নৌকা নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন (১৪৪)।

এতৎ সম্পর্কে আমরা বাঙ্গলা পুস্তকসমূহে দেখি যে প্রতাপাদিত্য রণস্থলে কয়েদ হয়েছিলেন। ঘটককারিকা, অন্নদামঙ্গল, ক্ষিতিশ-বংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে ঃ "তাঁকে খাঁচায় পুরে কয়েদ করা হয়, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কালে রাঘব রায় (বসন্তরায়ের পুত্র কচু রায়) অতর্কিতভাবে এসে শেষোক্তের হাত কেটে দেয় ; তাতেই তিনি কয়েদ হন।" অন্যপক্ষে রামরাম বসু বলেছেন "এক কালীন সসৈন্য যাইয়া উজির সহিত দেখা করিলে উজির তাহাকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন তোমার কি কর্তব্য—লড়াই কি কয়েদ ?" রাজা কহিলেন, "না, আমরা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল উপস্থিত। অতএব আমি কয়েদ হইব।"

পাৎসাহী সেনানীরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এ'স্থলে সুন্দর বাঙ্গলো নির্মাণ করে বাস করতে লাগল। একটি বাঙ্গলো নির্মাণ করতে ১৫০০৲ টাকা খরচ পড়ত। যেসব গ্রামবাসী গিয়েছিল মির্জা নাথান তাদেরকে ফিরিয়ে এনে এ'স্থলে বসালেন এবং নিজের জন্য একটি সুপারী গাছের তেতলা আবাসস্থল নির্মাণ করান। সম্ভ্রান্তেরা এই বাড়ী দেখতে যেতেন ; খানাপিনা ও নাচ গাওনার সমারোহ চলতে লাগল (১৪৫)।

বাঁকুড়ার মন্দির ঃ যশরের লোকদের সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাড়ী ছিল কটকী ব্রাহ্মণদের বাক্কুড়া গ্রামে। এরা রাজার ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাঁদের মন্দির কতকটা বাঙ্গলো ধাঁচে নির্মিত হয়েছিল। বেড়াতে গিয়ে মির্জা নাথান ইহা দেখতে পান। তৎপর তিনি জানতে চান যে এই মন্দিরকে সরিয়ে নিতে কতদিন কত ছুতোর ও মাঝি-মাল্লা লাগবে। কিন্তু যখন জানা গেল যে এক-মাস ধরে ৩০ জন ছুতোর দিনরাত খাটলে বাঙ্গলোটি খুলে নেওয়া যায়। তারপর ৪০০০০ মাঝি-মাল্লা দরকার হবে একে সরাতে ; কিন্তু এরূপ সুন্দর কারুকার্য স্থানান্তরের সময় আর থাকবে না। ইহা কি সুন্দর বাড়ী। ইঁহার থামগুলির উচ্চতা, চালার সৌন্দর্য ও সুন্দর কারুকার্য কেহ বর্ণনা করে বলতে পারেন না (১৪৬)।

প্রতাপাদিত্য কটকের ব্রাহ্মণদের গোপালপুরের পূজা করবার জন্য এনেছিলেন। কালীগঞ্জের কাছে কালিন্দী নদীর তীরে বাক্কুড়া গ্রাম অবস্থিত। কথিত আছে, গোবিন্দদেবের মূর্তি উড়িষ্যা থেকে প্রতাপাদিত্য আনয়ন করেন।

বোধ হয়, উড়িষ্যাবাসীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। "সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী" নামক কবিতা পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তিযশ ঘোষিয়ে ধরণী ॥

০ ০ ০ ০

জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম।
জিনি মহারাষ্ট্রিয়গণ রাখিলেন নাম ॥

এই পাটনা সম্ভবতঃ 'পত্তন' হবে এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বিগ্রহমূর্ত্তি নিয়ে সম্ভবতঃ যুদ্ধ হয়েছিল। এ থেকেই বিহারের পাটনা জয় করা প্রবাদ সৃষ্ট হতে পারে।

অন্যদিকে মির্জা নাথানের সাক্ষাতে আমরা কটক হতে আনীত কটকী ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাক্সুড়ার মন্দিরে পূজা করার কথা পাই। এতদ্বারা ইতিহাসও সমর্থিত হচ্ছে।

যশর লুণ্ঠন ঃ "একদিন কুমার উদয়াদিত্যের দূতেরা নাথানের নিকট আসে। মির্জা রাগ করে তাদের বলে 'তোমরা মির্জা মক্কিকে থলে ভরা সোনা, সোনার টাকা ও দামী কাপডচোপড় দিচ্ছ ; কারণ সে তোমাদের দেশ লুণ্ঠন করে ; আর তোমরা আমাকে আম-কাঁঠাল দিয়েও খবর নেওনা। আমার সদয় হৃদয় ও মানবতা-ভাবই আমার দোষ। আচ্ছা, কাল আমার পালা ; তোমরা দেখবে, দেশ লুণ্ঠন কাকে বলে।' তিনি নৌ-বেড়া ও পদাতিক সৈন্যদের সর্দারদের বললেন 'আমরা মধ্যরাত্রেই লুণ্ঠন আরম্ভ করব।' তারা দূতদের সবিশেষ অনুনয়-বিনয়েও কর্ণপাত না করে মধ্যরাত্রেই ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে এবং সেদিন এমন লুণ্ঠন করে যে যশরে প্রথম আক্রমণের সময় থেকে এমন লুঠ দেখা যায় নি। উদয়াদিত্য তাঁর দূতদের উপর বিরক্ত হয়ে বললেন 'কেবল মির্জা মক্কির সহিত মেলা-মেশা করা ঠিক হয়নি।......"

"......তোমরাই আমার রাজ্যে এই অবস্থা এনেছ। এতদ্বারা মির্জা-নাথান ভয়ের কারণ হয়ে উঠল (১৫২)।"

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর রাজধানী ভীষণভাবে লুণ্ঠিত হয়। ঘটক-কারিকা ও রামরাম বসু তাই বলেছেন ; মির্জা নাথানের কথায় বোঝা যায়, লুণ্ঠন অনেকবারই হয়েছিল।

বাঙ্গলায় অফিসার বদল ঃ "ঘিয়াস খাঁ জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হয়ে ইসলাম খাঁকে অভিবাদন করলেন। প্রতাপাদিত্যকে হাজির করবার পর ইসলাম খাঁ তাঁকে কয়েদখানায় রাখলেন এবং যশরের শাসনভার ঘিয়াস খাঁর

হস্তে ন্যাস্ত করলেন। খাজা মহম্মদ তাহির বক্স যশরের আয়ের হিসাব দেখবার জন্য নিযুক্ত হলেন এবং খাজনার খাতা সরকারী রেকর্ড অফিসে আনবার জন্য হুকুম দেন। মির্জা মক্কি বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন। মির্জা নাথানকে সুবেদারের দরবারে ডাকা হয়, মির্জা ইউসুফ যশরের ফৌজদার হন।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, প্রতাপাদিত্য সুবাদার কর্তৃক কয়েদ হন। তারপর মির্জা নাথান প্রতাপাদিত্যের আর কোন সংবাদ দেননি। প্রতাপাদিত্য কয়েদ হয়েছিলেন, সকল বাঙ্গলা পুস্তকে এ সংবাদ উল্লিখিত আছে। জাহাঙ্গীর নগরে কয়েদ হবার পর তাঁর ভাগ্যে হল কি? আর ইসলাম খাঁর হুকুমের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়—চণ্ডিকান বা যশর রাজ্যের আর অস্তিত্ব রইল না। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের খাসে গেল। যশরের লোকেরা পরাজিত রাষ্ট্রের জাতির ন্যায় ব্যবহার পেতে লাগল! রাজ্য যাতে শেষে ছারেখারে না যায়—এই উদ্দেশ্যে প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ বৃথা গেল! তাঁর উপর শেষ যবনিকা পতন হল!

তাহিরের যশর হতে প্রত্যাবর্তন ঃ খাজা মহম্মদ তাহির যশর রাজ্যের আয়ের হিসাব খাতা নিয়ে ইসলাগ খাঁর কাছে আসেন। এই খাতা রায়তদের সন্তোষজনক ও পাৎসাহী কোষেব সুবিধাজনকভাবেই গৃহীত হয়। এ হিসাবের খাতা চৌধুরী ও কানুনগোদের দস্তখত সহ ইসলাম খাঁর হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। তৎপব ইহা মুতারিদ খাঁর দপ্তরে পাঠান হয় যাতে এই (নূতন) বন্দোবস্ত রাইয়ৎ ও জায়গীরদারদের উপর জারী করা হয় (১৬৩)।

এ সংবাদে আমরা পাই যে যশর রাজ্য কেবল পাৎসাহী দখলে খাস করা হয় নি, ইহা টুকরা টুকরা করে জায়গীরদারদের মধ্যে বিলি করা হয়! প্রতাপাদিত্যের 'যশর রাষ্ট্র' আর রইল না; প্রজাবর্গ ও জায়গীরদারেরা সাক্ষাৎভাবে পাৎসাহী সরকারের অধীন হল।

এখানে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হল (ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গলের কথা) যে রাঘব রায় (কচু রায়) মানসিংহ দ্বারা যশর রাজ্য পাৎসাহী ফরমান মাধ্যমে পান ও 'যশোর রাজ' উপাধিতে ভূষিত হন—সে তথ্য এ'সব সংবাদ দ্বারা খণ্ডিত হচ্ছে।

তবে বসন্ত রায়ের পুত্রেরা আজও নিকটবর্তী স্থানে জমিদাররূপে বাস করছেন। ধূমঘাটে তাঁদের 'নূর-নগরের রাজা' বলে অভিহিত করা হয়।

নূতন পাৎসাহী ফরমান ঃ ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলায় এসেই পাৎসাহী দরবারে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে কোঁচদের দুই রাজা ও প্রতাপাদিত্যের পুত্রেরা,

যাদের ইসলাম খাঁ এবং পরবর্তী সুবাদার কাসিম খাঁ পাৎসাহী দরবারে পাঠিয়েছে তাদের পাৎসাহী অনুগ্রহ প্রদান করা হ'ক এবং সুবাতে (বাঙ্গলা) তাদের রাজ্যে (territories) পুনঃস্থাপিত করা হউক। এতদ্বারা যশরের এবং কোঁচদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি লাভ করবে এবং ফিরিঙ্গি ডাকাতদের সঙ্গেও সম্বন্ধ ভাল হবে। এই দরখাস্তের জোরে ইহ জগতের ও আধ্যাত্মিক জগতের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (কুচবিহার)—রাজভক্ত জমিদারশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে এবং যেহেতু দু'তরফই পাৎসাহী দরবারে হাজির হয়েছেন, পাৎসাহ লক্ষ্মীনারায়ণকে তাঁর রাজ্যে অতি সম্মানের সহিত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা পরীক্ষিত (কামরূপ হিস্যা) ৭,০০,০০০৲ টাকা পেশকাশ (peshkash) প্রদান করলে তাঁকে তাঁর রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার হুকুম হয়। তৎপর তাঁকে মির্জা কোয়াম ইমাদুদ্দৌল্লার সমভিব্যাহারে মির্জা ইব্রাহিমের কাছে বলে পাঠান হল যে উপরোক্ত টাকা আদায় হলে তাঁকে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে (৫৬৪)।

এস্থলে আমরা সংবাদ পাই যে প্রতাপাদিত্যের পুত্রেরা পাৎসাহী দরবারে প্রেরিত হয়েছিল। নিশ্চয় তাঁরা তথায় নজরবন্দীরূপেই কয়েদ ছিল। আরও আমরা সংবাদ পাই যে তাদের স্বীয় রাজ্যে বা সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে যশরের সহিত ও ফিরিঙ্গি-বোম্বেটেদের সহিত পাৎসাহী সম্পর্কের উন্নতি হবে। এতদ্বারা আমরা বুঝি যে মুঘলাধিকারে যশরে নানা গোলমাল হচ্ছিল; পাৎসাহী কর্মচারীরা উহা ঠাণ্ডা করতে পারছিল না। সেইজন্যই কি তাঁরা সুবাদার প্রতাপাদিত্যের পুত্রদের অধীনে যশোরকে 'স্বায়ত্ত-শাসন' দিতে চেয়েছিলেন? বাঙ্গলার প্রবাদে বলে যে মুঘল অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে লোকেরা উদয়াদিত্যের অধীনে অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং কুসলী ক্ষেত্রের ময়দানে তিন-চার দিন যুদ্ধ হয়, (সতীশচন্দ্র রায়—যশোর খুলনার ইতিহাস থেকে যদুনাথ সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত)। প্রবাদ আছে যে মুঘল অত্যাচারে যশর যখন প্রপীড়িত হয় তখন প্রতাপাদিত্যের পুরনারীরা জাহাজে চড়ে জলমগ্ন হয়ে আত্মবিসর্জন করেন। লোকে এখনও নাকি সেইস্থান দেখায়।

এ'স্থলে লক্ষণীয় যে নিখিলনাথ রায় তাঁর পুস্তকে গুহবংশের তালিকায় প্রতাপাদিত্যের অনেক পুত্র ছিল বলেছেন। সতীশচন্দ্র রায় বলেন তাঁর তৃতীয় পুত্রকে বলপ্রয়োগে মুঘলেরা মুসলমান করে।[১] যশরে এই অশান্তির জন্যই কি প্রতাপাদিত্যের পুত্রেরা নির্বাসিত হন? ডাঃ বোরা এবং ঢাকা

১। যশোর খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal, Vol. II পুস্তকের মতে মির্জা নাথানের উপরোক্ত লেখন হতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রতাপাদিত্যের পুত্রেরা স্বীয় রাজ্যে কোঁচ রাজাদের ন্যায় পুনঃস্থাপিত হয়েছিলেন। আমরা কিন্তু মির্জা নাথানের পুস্তকে ইহার কোন সমর্থন পাই না। পাৎসাহ কেবল দুই কোঁচ রাজাকে তাদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই নাথানের পুস্তকে আছে।

বাঙ্গলার প্রবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের মন্তব্য সমর্থন করে না। প্রতাপাদিত্য বা তাঁর বংশের সম্পর্কে মির্জা নাথানের ইহাই শেষ উক্তি।

ইব্রাহিম খাঁর যশর যাত্রা ঃ যখন বাহাদুর খাঁ হিজলীতে গোলমাল আরম্ভ করে সে সময় যশর থেকে খবর আসে যে আসফ খাঁর পুত্র সুরাব খাঁ দিন রাত মদ খেয়ে ঢোল হয়ে থাকে এবং যশর রাজ্যের বিষয়ে কোন যত্ন নেন না। প্রতিদিনই ফিরিঙ্গিরা যশর রাজ্যে লুঠ করছে এবং গ্রামসমূহ হতে ১৫০০ স্ত্রী-পুরুষ কয়েদ করে নিয়ে গেছে। দেওয়ান বক্সী ও ওয়াকী নবী হাসান মাসাদী শাসনের জন্য যে ভাল উপদেশ দেয় তা তিনি অগ্রাহ্য করেন। সেজন্য প্রথমে যশরে গিয়ে সেই রাজ্যের অবস্থার সুবন্দোবস্ত করা ; দ্বিতীয়তঃ বাহাদুর খাঁ হিজলীওয়ালাকে শাসনের জন্য ইব্রাহিম খাঁ যশর রওনা হলেন। তিনি অভিজ্ঞ জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পথ চলতে লাগলেন, কিন্তু রাস্তায় নদী-নালা থাকায় ইব্রাহিম খাঁকে পথ ভুলে পাঁচ দিন এক নালা থেকে অন্য নালায় ঘুরতে হয়েছিল। এ'সব স্থলে কোন বাসিন্দা বা ব্যবসায়ীদের যাতায়াতও ছিল না। অনেক কষ্টে যশর থেকে ··হিজলীর দিকে কাগরা-ঘাটায় পৌঁছলেন (৬৮৯)। অত্যাচারে এ'স্থান লোকশূন্য হয়েছিল ?

বাহাদুর খাঁর আত্মসমর্পণ ঃ যশরে পৌঁছিয়েই একদল অফিসারের সঙ্গে ভাটির মুসাখাঁ ও তাঁর বার ভুঁইয়াদের বাহাদুর খাঁর বিপক্ষে পাঠান।...সুরাব খাঁকে ভর্ৎসনা ও দোষ বর্ণনা দ্বারা অপমানিত করা হয়। আটদিন পরে মির্জা-নাথানও তথায় এসে পৌঁছেন। খাঁ মির্জার উপর অনেক নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করেন। মির্জা তাঁকে যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা করেন। খাঁ প্রত্যেকদিন রণতরীসমূহের মহড়া দেখে ডাঙ্গায় প্রত্যহ ৪ ঘড়ি পর্যন্ত তীর ছোড়া অভ্যাস করতেন। বেশীর ভাগ পাৎসাহী অফিসারেরা তীর ছোড়াতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। এতদ্বারা দর্শকদের মধ্য হতে চিৎকারধ্বনি ও বিজ্ঞদের প্রশংসা উত্থিত হত ; বন্ধুরা সমবেত হলে তিনি শাসনকার্য ও রাজস্ব

বিষয়ের কার্যে ব্যাপৃত হতেন, লোকের কর্মে অবহেলা করতেন না।...বাহাদুর খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাঁকে ৩০০,০০০৲ টাকা জরিমানা করা হয়। তৎপর পূর্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সে তার বাড়ী ও বিষয় রাখতে অনুমতি পায় (৬৯০)।

এ বর্ণনাতে আমরা দেখি যে ভাটির মূসাখাঁ ও তাঁর বারভুঁইয়ারা মুঘল সুবাদারের সঙ্গে হিজলীর বাহাদুর খাঁকে দমন করবার জন্য এসেছিলেন।

যশরে নূতন ব্যবস্থা ঃ ইব্রাহিম খাঁ সুরাব খাঁকে বরখাস্ত করে আর একজন সর্দার নিযুক্ত করে জাহাঙ্গীর নগরে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। শেষে যশরের সর্দারগিরি (ফৌজদারী) মির্জা নাথানের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি খাঁকে অনুরোধ করলেন "নবাব যেন সুরাব খাঁকে মার্জনা করেন এবং তাঁর পদে বহাল রাখেন; আর যে-সংখ্যার রণতরী সে চায় তা যেন দেওয়া হয়। এর পর যদি সে আরও নৌকা চায়, তার জবাবদিহি আমার।" তাঁকে ৬০০ খানা সম্ভারপূর্ণ তরী দেওয়া হল এবং যশরের জিম্মাদার হবার জন্য তাঁর কাছ থেকে চুক্তিনামা নেওয়া হল। ইহা পাৎসাহী দরবারে পাঠান হয় (৬৯১)।

শেষ খবর ঃ যশর সম্পর্কে শেষ সংবাদ এই যে সাহজাহান বিদ্রোহী হয়ে বাঙ্গলায় এলে বাংলা ও কুঁচের সব থানার বন্দোবস্ত করেন (৭৭৫)।

বহু পরে ইব্রাহিম খাঁর নিজামতের সময় নুরুল্লাখাঁ যশরের ফৌজদার ছিলেন।

যশরের উপর মির্জা নাথানের বর্ণনার শেষ যবনিকা পতন এখানে হ'ল। অবশ্য এ পুস্তক ও আবদুল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে পুরাতন ধারণাও দূর করবে, যতদিন না অপর কোন প্রামাণিক পুস্তক আবিষ্কৃত হয়। ইহাও দ্রষ্টব্য যে ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গল বর্ণিত রাঘব রায় (কচু রায়) যুদ্ধান্তে যশররাজ্য পায়—এ পুস্তক তাহা সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করছে।

প্রতাপাদিত্য যে উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তা সফল হয়নি। যশর রাজ্য একজন সর্দারের (ফৌজদার) অধীনে পাৎসাহী খাস করে নেওয়া হয়। নাথানের বর্ণনাতেও দেখা যায়, যশর নানা অত্যাচার ও লুঠপাটে ছারেখারে গিয়েছিল। কিংবদন্তী ইহার সমর্থন করে।

প্রতাপাদিত্যের রাজনীতিক চাল ঃ মির্জা নাথান প্রদত্ত বর্ণনা হতে এ তথ্য স্পষ্ট পাওয়া যায় যে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর কাছে পাৎসাহের আনুগত্য স্বীকার করে। ভাটি অঞ্চলের যুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য করবেন

বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পালন করেন নি। পরে মাফ চাওয়া সত্ত্বেও তাঁর রেহাই হয়নি। তাঁকে ধ্বংস করতে মুঘল সুবেদার বদ্ধপরিকর হন। ইহার কারণ কি? প্রতাপাদিত্য অধীনতা স্বীকার করে কার্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন। বিশেষতঃ একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী হিন্দু ভুঁইয়া এরূপে পাশ কেটে যায়, তা মুঘল পাৎসাহীর উপেক্ষার বাইরে। তার ক্ষমা নেই। অতএব তাঁকে ধ্বংস করা চাই। এ'জন্যই তাঁকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নীতির অনুসরণ করা হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শিখরাজ্য ধ্বংস দ্বারা।

প্রতাপাদিত্য কেন প্রতিজ্ঞা পালন করেন নি তদ্বিষয়ে অধ্যাপক সরকার বলেন, তিনি জানতেন ভাটির ভুঁইয়াদের ও ওসমানকে পরাজিত বা বিনষ্ট করার পর মুঘলের সেই শক্তি তাঁর ঘাড়ে হুড়মুড় করে পড়বে। অতএব "যাক শত্রু পরে পরে"—তিনি নিরপেক্ষ রইলেন। কিন্তু এ যুক্তি আমাদের সমীচীন বলে মনে হয় না। তিনি কি এতই নির্বোধ যে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে"-এর ন্যায় যুদ্ধ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রণ-লহরী গুনতে লাগলেন?

কোন লেখক এ বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন[১]। হতে পারে ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রথম থেকে একটা পারস্পরিক সর্ত ছিল। ইঁহার প্রমাণ ঈশাখাঁর নেতৃত্ব ভাটি অঞ্চলের বারভুঁইয়ারা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে আইন-ই-আকবরীতে "মারজয়ান-ই-ভাটি" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভূষণার যুদ্ধে আহত হয়ে কেদার রায় ঈশাখাঁর কাছে যান[২]। ঈশাখাঁর পুত্র দায়ুদের সঙ্গে কেদার সহযোগিতা করেছিলেন, ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীরের সহিত কতলুখাঁর সহযোগিতা ছিল[৩]। হয়ত ভুঁইয়া-সংঘ মধ্যে এরূপ বোঝাপড়ার জন্যই প্রতাপাদিত্য মুঘলদের সক্রিয় সাহায্য দেননি। মির্জা-নাথানই মুঘল শিবিরে বসে ভুঁইয়াদের পূর্বেকার কথাবার্তার বিষয়ে কি খবর রাখতেন?

শেষ কথা, ইহা শ্রেণী-স্বার্থের কথা। সমশ্রেণী ও সমস্বার্থের লোকদের বিপক্ষে প্রতাপাদিত্য কি প্রকারে যাবেন? ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা-নুযায়ীই এ কার্য সংঘটিত হয়েছিল। ভূষণার সত্রাজিৎ রায় একজন ছোটখাট ভূ-স্বামী। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বীয় স্বার্থেই মুঘলের তরফদারী

১। মাসিক 'মহম্মদী'।
২। History of Bengal—Vol. II
৩। নিখিলনাথ রায় 'প্রতাপাদিত্য'।

করেছিলেন। অবশেষে ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। তদ্রূপ সাহাবাজপুরের জমিদার রাজা রায়। ইঁহার জমিদারী মুঘল ভকুমক্ খাঁকে জায়গীর বলে প্রদান করা হয়। জায়গীরদার তাঁর জায়গীরে এলে রাজা রায় তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে নজরানা প্রদান করেন এবং স্বীয় পুত্র রঘুনাথকে জামীন স্বরূপ রেখে যান। জায়গীরদার তাঁকে জোর করে মুসলমান করে ও নিজের খানসামারূপে নিযুক্ত করে। এ সংবাদ শুনে ইসলাম খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীরা বিরক্ত হন। সুবাদার ভকুমক্ খাঁকে কড়া চিঠি লেখেন এবং পরে সেই জায়গীর কেড়ে নেন[১]।

মুঘলদের তরফদারী করায় হিন্দু ভুঁইয়াদের এই লাভ! এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য যে প্রবাদানুযায়ী ৺সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর "প্রতাপাদিত্য চরিত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যুদ্ধান্তে প্রতাপাদিত্যের দুই পুত্রকে মুসলমান করা হয়।" পুনঃ পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে এমন বংশ আছেন যাঁরা কেদার রায়ের বংশজাত বলে পরিচয় প্রদান করেন।

আবার সিলেটের রাজা সবিত রায়ের যে দুই পুত্র দিল্লীতে জামীন স্বরূপ ছিলেন তাঁদেরকে জোর করে মুসলমান করা হয়। এই দুই পুত্রের বংশধরেরা এখন বানিয়াচুঙ্গের "দেওয়ান" গোষ্ঠী বলে পরিচিত[২]।

সুবেদারের কাছে প্রতাপাদিত্যের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করার যে-যুক্তি অধ্যাপক সরকার দিয়েছেন তা' যদি সত্য হয় তা'হলে স্বীয় স্বার্থের জন্য প্রতাপাদিত্যের মুঘলের পক্ষে যোগদান করা উচিৎ ছিল। তা'হলে, যেহেতু তাঁকে একজন মুঘল সেনানী বলে গণ্য করা হয়েছিল তদ্দ্বারা তিনি মানসিংহ ও জয়সিংহের ন্যায় একজন বড় মুঘল সেনাপতিরূপে ইতিহাসে প্রকাশ হতেন। কিন্তু তিনি (প্রতাপাদিত্য) সে-পথ গ্রহণ করেন নি। স্বাধীনতাকামী স্বদেশবাসীর বিপক্ষে তিনি যান নি। অন্যপক্ষে মূসাখাঁর বারভুঁইয়ার দল, সত্রাজিত, বাহাদুর খাঁ হিজলীওয়ালা ও অন্যান্যেরা তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করার কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করেনি। স্বাধীনতার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা তাঁর মনের পর্দায় ছিল, ইহা কি উহার বিকাশ নয়? মুঘলের বিপুল ক্ষমতা দেখে চাপে পড়ে তিনি মুঘল সুবাদারের কাছে পাৎসাহের আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তার উল্টাটি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন।

১। বাহারীস্তান—২য় খণ্ড।
২। অচ্যুত চৌধুরী—শ্রীহট্টের ইতিহাস।

ঐতিহাসিক নজীর ঃ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা এ বিষয় নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে নানা ব্যঙ্গ করেছেন। "বঙ্গাধীপ" আনুগত্য স্বীকার করেছেন; তিনি স্বাধীনতার সৈনিক ছিলেন না, ইত্যাদি বলে তারা তাঁকে টিট্‌কারী দিয়েছেন। তাঁর বিষয়ে পূর্বেকার (ভ্রান্ত!) শ্রদ্ধার ভাব দূর করতে তারা ব্যস্ত! কিন্তু তারা তাঁকে খেলা করবার আগ্রহাতিশয্যে ইতিহাসের নজীর ভুলে যান! তারা ভুলে যান যে রাজনীতি একটা ঋজু পথ ধরে যায় না —ইহার গতি বক্র, অর্থাৎ আঁকাবাঁকা পথেই চলে। মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহও দিল্লীর সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করবার উদ্দেশ্যে দুইবার মনস্থ করেছিলেন। প্রথমবার, মানসিংহ যখন গুজরাট হয়ে দিল্লীতে ফিরবার পথে মহারাণা প্রতাপের অতিথি হন এবং খানাপিনার পর রাণা দিল্লীতে আকবরের কাছে আসতে স্বীকৃত হন[১]। পরে এই স্বীকৃতি পালন না করার জন্য অর্থাৎ দিল্লীতে হাজির না হওয়ার জন্যই আকবর মেবার আক্রমণ করেন[২]। পুনঃ অরণ্যে পলাতক রূপে জীবন-যাপন করার সময় সন্তানদের দুঃখদুর্দশা দেখে তিনি আত্মসমর্পণ করার মর্মে আকবরকে পত্র দেন। এ সংবাদ তো টডের রাজস্থানেই আছে।

আবার শিবাজী এক সময়ে মোঘলের বিপক্ষে লড়েছেন; কিন্তু পরে পুনঃ সেই সৈন্যদলে যোগদান করে বিজাপুরের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন[৩]। ইহার পর জয়সিংহের পরামর্শে পাৎসাহী সনদের জন্য দিল্লীতে যান। ইহা সর্বজনবিদিত। ইহাই রাজনীতি। উপরোক্ত ধারানুযায়ী প্রতাপাদিত্য বাঙ্গলার স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সৈনিক ছিলেন না বলা একেবারেই চলে না। শুধু ইচ্ছা করলেই তো তিনি মুঘলের বড় 'খয়ের খাঁ' হতে পারতেন। ইহার পূর্বে ঈসাখাঁ ওসমান প্রভৃতিও বৈশ্যতা স্বীকার করেছিল। আর কেদার রায় সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার নিজেই বলেন, Next year Mansingh marched to the Dacca district and induced Kedar Rai, the Zamindar of Sripur (South Dacca) to promise loyalty of Akbar[৪].

অন্যদিকে জয়পুরের "বংশাবলী" যার বাংলা অনুবাদ নিখিলনাথ রায় তাঁর পুস্তকে দিয়েছেন তাতে উক্ত আছে যে মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত

১। আকবরনামা।

২। Cambridge History of India—Vol. IV. Akbar, p. 115.

৩। ঐ—পৃঃ ২৫৪

৪। History of Bengal—Vol. II, p. 213.

করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন, দেবীর শীলামূর্তি নিয়ে যান এবং কেদার রায়ের রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন।

অবশ্য এ বিষয়ে ঐতিহাসিক শেষ কথা এই যে নৌ-যুদ্ধে কেদার রায় বন্দী হন এবং মানসিংহের নিকট নীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান।

বাহারীস্তানে পর্যাপ্ত সংবাদ নেই ঃ "বাহারীস্তান" পাঠ করলে আমরা বারভূঁইয়াদের সম্পূর্ণ সংবাদ পাই না। ইহাতে কেবল ঈসাখাঁর পুত্র মূসাখাঁ, ওসমান আফগান ও প্রতাপাদিত্যের শেষকালের যুদ্ধের সংবাদ পাই। এসব কিন্তু বারভূঁইয়াদের সম্বন্ধে সব সংবাদ নয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও ইহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে। আমাদের মনে হয়, প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ইতিহাসে দুইটি স্তর আছে। প্রথম, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে মানসিংহ সুন্দরবনে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এ সংবাদ ইংরেজ ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন। মানসিংহের সঙ্গে যে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে দেশে অনেক 'পাথুরে প্রমাণ' আছে। এ যুদ্ধে যেসব হিন্দু (যথা—কৃষ্ণনগর ও চাঁচড়ার রাজবংশদ্বয়) মুঘলদের নানা প্রকারে সাহায্য প্রদান করেছিল। তাঁদের স্থাপয়িতাদের বাড়ীতে এখনও মানসিংহ-প্রদত্ত পাট্টা রক্ষিত আছে[১]। উক্ত পাট্টা বলেই তাঁরা জমিদার হন।

পুনঃ প্রবাদ আছে যে প্রতাপাদিত্যের অধীনে আটঘর ভূঁইয়া ছিল—চন্দসীর মিত্ররা ও চাঁচড়ার রাজা এবং আরও অন্যান্যেরা। এরা প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষতাচরণ করে। ভিতর থেকে এরূপ শত্রুতার ফলেই তাঁর পরাজয় ঘটে। প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং আরও প্রবাদ যে তিনি নিজ নামে টাকাও বাহির করেছিলেন[২]।

আবার প্রতাপাদিত্যকে হারাবার জন্য মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কি সব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন পুস্তকে তাহা সংগৃহীত হয়েছে[৩]। অনেকে স্বীয় স্বার্থে মুঘলের সঙ্গে জুটেছিল! অনেকেই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে মুঘলের তরফদারী করে উন্নীত হয়েছিলেন বলে কথিত হয়। যশোর থেকে হুগলী পর্যন্ত বর্তমানের অনেক জমিদার বংশ এ প্রকারে নিজেদের আভিজাত্য অর্জন করেছিল।

১। (i) Blochmann's 'Ain-i-Akbari'. (ii) Elliot—History of India, Vol. IV. Takmila-i-Akbarnama.

২। নিখিলনাথ রায়—প্রতাপাদিত্য।

৩। A. K. Roy—History of Calcutta (1901).

তবে বাঙ্গালী লেখকেরা তাদের পুস্তকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটক-কারিকাসমূহ, অন্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ক্ষিতিশ বংশাবলী প্রভৃতি সকলেই এখানে ভুল করেছেন যে মানসিংহের সহিত প্রতাপের শেষ যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে তিনি ধৃত হয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ হন। আমাদের অনুমান, মানসিংহের প্রথমবার বাঙ্গলার সুবাদারী করবার সময়ের যুদ্ধের সহিত প্রতাপাদিত্যের শেষ যুদ্ধকে মিশিয়ে এই ভুলটি হয়েছে। প্রথমবার মানসিংহের বাইস আমীরের সহিত যুদ্ধ হয়। ঈশ্বরীপুরে তাদের কবর প্রভৃতি অনেক পাকা প্রমাণ আছে। এই কবরসমূহ ও উপরোক্ত দলিলাদি প্রথমবারের যুদ্ধের "পাথুরে প্রমাণ"। দ্বিতীয় যুদ্ধ, কয়েক মাসের জন্য মানসিংহ তৃতীয়বার সুবাদার নিযুক্ত হন। তারপর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে কুতুবুদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ইসলাম খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হন। এই ইসলামখাঁ-ই বাঙ্গলায় "মুঘল শায়ে" আনয়নের জন্য সব বারভুঁইয়া অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য প্রভৃতিকে হয় বাধ্য করেন, না হয় ধ্বংস করেন। দুইশত বৎসর পরে বাঙ্গালী লেখকেরা এই ভুলটি করেছেন ! কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর রামরাম বসু ঠিকই সংবাদ দিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষ অস্বীকার করা যায় না। এখানেও একটা গল্প আছে যে প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের ভাব হচ্ছে, তিনি একটি মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে মানসিংহের পুত্রের সহিত বিবাহ দেন (ঘটক কারিকা)।

আসল ঘটনার বহু পরে ঘটককারিকাসমূহ প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে। তাতেই নানা ভুলভ্রান্তির উদ্ভব হয়। 'পত্তন' কি প্রকারে পাটনা হল তা আগেই বলা হয়েছে। পুনঃ ইসলাম খাঁ শ্রীপুর ও বিক্রমপুর প্রতাপাদিত্যকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল। তাতেই সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক শ্রীপুরের অধিপতি কেদাররায়ের পরাজয়ের কাহিনী সৃষ্ট হয়।

প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের কারণ ঃ সুবেদার ইসলাম খাঁ কেন প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস অনিবার্য্য ভাবে ধার্য্য করেন, তাহাই ঐতিহাসিক প্রশ্ন। মূসাখাঁ বহুবার বিদ্রোহী হয়েছে এবং ওসমান খাঁও তাই। এমনি তাঁর সঙ্গে শেষ যুদ্ধের পূর্বে মুঘল সেনাপতি অতি ভদ্রতাপূর্ণ এক চিঠি লিখে তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে অনুরোধ করেন।[১] কিন্তু ওসমান তা' প্রত্যাখ্যান করে "মুঘলমারী" যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। পুনঃ মূসাখাঁ পরাজিত ও কড়া নজরবন্দী হয়ে থাকা সত্ত্বেও গোপনে বিদ্রোহে উস্কানী দেন। তজ্জন্য তিনি তিরস্কৃত ও

১। 'রিয়াজু-ই-সালাতিন' পুস্তকেও ইহা উল্লিখিত আছে।

ভর্ৎসিত হন ; তত্রাচ তাঁকে মাপ করা হয়। শেষে তিনি মুঘলের বড় খয়ের খাঁ হয়ে উঠেন। সুবেদারের দরবারে তাঁর বড় খাতির হয়।

পুনঃ হিজলীর বাহাদুরখাঁ বিদ্রোহী হলে, পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, ফলে তাঁর বাড়ী ঘর জমিদারী বহাল থাকে। অন্যদিকে বাক্‌লার রামচন্দ্রের বেশীরভাগ জমিদারী কেড়ে নেওয়া হয়। আর তাঁকে জাহাঙ্গীর নগরে প্রথমে রাখাও হয় কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বেলা ভিন্ন ব্যবস্থা হল! তাঁহার মার্জনা নেই। তাঁর রাজত্ব যা' বর্তমান কালের প্রায় ৫-৬ জেলার সমপরিমাণ হবে তা' সম্পূর্ণভাবে মুঘল সরকারে খাস করে যশর এক ফৌজদারের শাসনাধীন হয়।

প্রতাপাদিত্যের শেষ কি হ'ল তদ্বিষয়ে মির্জা নাথান নীরব! কিন্তু বাংলা পুস্তকসমূহে বলা হয়েছে যে তাঁকে খাঁচায় পুরা হয় এবং উহার মধ্যে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যকে খাঁচায় পুরা হ'ল কেন? পালিয়ে যাবার ভয় ছিল কি? না, তুর্ক তাতার জাতিসুলভ রূঢ় বর্বরতার নজীর এ ঘটনার মধ্যে আমরা পাই। তৈমুরলঙ্গ তুর্কীর সুলতান বায়াজিদকে যুদ্ধে কয়েদ করে খাঁচায় পুরে লোককে দেখিয়েছিল। রুষে কৃষক বিদ্রোহের নেতা পুগায়েফ্‌কে কয়েদ করে খাঁচায় পুরে সেন্ট্ পিটারস্‌-বার্গে পাঠান হয়েছিল। চীনেও এক সম্রাট এক বিদ্রোহীকে এ প্রকারে খাঁচায় পুরেছিল। ইহা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায়।

আবদুল লতিফ বলেছেন, প্রতাপাদিত্য বাঙ্গলার ভুঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ও ক্ষমতাশালী। মির্জা নাথানও বলেছেন যে তিনি অতি মাননীয় রাজা ছিলেন। জেসুইট্ পাদরীরা কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য সমান ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন বলেছেন।

শেষকথা, প্রতাপাদিত্যের বংশ দুই পুরুষ ধরে মধ্য-বাঙ্গলার হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান নিয়ে একটা পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মুসলমান প্রভৃতিকে ভূমি দান করে এই রাজ্যে বসবাস করান হয়। খৃষ্টান পাদরীদের গির্জা নির্মাণ করতে দেন এবং পিতা-পুত্রে উহা দেখে প্রশংসা করেন। মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ করে দেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার, আবলম্ব সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় সর্বভারতীয় খ্যাতিমান পণ্ডিতগণ রাজসভায় থাকতেন। প্রতাপাদিত্য নানাশ্রেণীর কুলীন বসিয়ে "যশর সমাজ" গঠন করেন। কায়স্থদের রীতি অনুযায়ী রাজবংশ গোষ্ঠিপতি হয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরাও এস্থানে এসে তর্কে পরাস্ত হতেন (ঘটক কারিকা)। ফিরিঙ্গীদের দ্বারা নৌ-সেনা সুশিক্ষিত করা হ'ত।

কামান, বন্দুক প্রস্তুত করা হ'ত। বাঙ্গালীদের যুদ্ধবিদ্যা শিখবার একটা স্থান হয়েছিল।

চাঁদ কেদারের রাজত্ব তখন অতীতের গর্ভে চলে গিয়েছে। পাঠানেরা হিন্দু রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করে একযোগে রাজত্ব করছিল। হিন্দু-বাঙ্গলার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল যশর। হিন্দু-বাঙ্গলা এই যশরের মুখ চেয়ে ছিল। আর এক কথা, সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী এসব হিন্দু রাজাদের মুখ চেয়ে ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ধর্মের আশ্রয়স্থল ছিল এসব স্থান! এজন্যই কেদার রায়ের পুরোহিত তাঁকে লড়তে উৎসাহিত করে।[১] রামচন্দ্রের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাও তদ্রূপ করে।[২] সেজন্য মুঘল সাম্রাজ্যবাদ এহেন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বরদাস্ত করতে পারে না। মানসিংহ যেমন কেদার রায়ের রাজ্য ভেঙে পাঁচ টুকরা করে দিয়েছিল ইসলামখাঁ সেই একই কারণে যশরকে অতীতের বিস্মৃতির মধ্যে ফেলে দিল! বাঙ্গালার জাতীয়তাভাব যাহাতে কোন প্রকার আশ্রয়স্থল না পায় ঠিক তদুদ্দেশ্যেই এই অবলুপ্তির ব্যবস্থা!

আজ ধূমঘাট ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত, জাহাজঘাটা, ফিরিঙ্গি নৌ-সৈন্য থাকার সৈন্য-নিবাস (Spanish Barraca-সৈন্যের তাঁবু), লোহাগড়া (কামান ঢালাই করার স্থান), কুশলীক্ষেত্র (সৈন্য কুচ্‌কাওয়াচ করবার স্থান) প্রভৃতি আজ নামেই পর্যবসিত! পঞ্চক্রোশা ধূমঘাট আজ বিস্মৃতির অতলতলে বিলীন হয়ে গেছে! যশর রাষ্ট্র বিলুপ্ত করা মুঘলশান্তির আশু প্রয়োজন ছিল।

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ ঃ ঐতিহাসিক সরকার বলেছেন, প্রতাপাদিত্য কিরূপ স্বাধীনতার সৈনিক? He tamely submitted, অর্থাৎ তিনি নিরীহ-ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অন্য আর কি গতি ছিল? কারণ মির্জা নাথান নিজেই প্রতাপাদিত্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে যশর রাজ্য তা না হলে ধ্বংস হ'ত। মন্দের ভালর ন্যায় ইহাই তো শেষ পন্থা।

প্রতাপাদিত্য যদি পরের যুগের লোকদের বাহবা পাবার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতেন তা'হলেও অবশেষে ধরা তিনি পড়তেনই। অধিকন্তু মুঘলের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপাড়নে দক্ষিণ-বাঙ্গলা ছারে-খারে যেত। এতদ্ব্যতীত মগ ও ফিরিঙ্গিদের এ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি তো ছিলই। সেজন্য মানবতার দিক দিয়ে প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ উচিতই

১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেদার রায়।

২। বাহারীস্তান—২য় খণ্ড।

৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেদার রায়।

হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর মহদন্তকরণের পরিচয়ই পাই। ব্যক্তিগত অহমিকার বদলে আমরা তাঁর লোক-কল্যাণ ইচ্ছা ও বুদ্ধিই বলবৎ ছিল দেখি।

ভাটি অঞ্চলে মুঘলের হয়ে লড়াই না করে যেমন তিনি মুসাখাঁ, সত্রাজিত প্রভৃতির ন্যায় স্বদেশবাসীর বিপক্ষতাচরণরূপ কলঙ্ক থেকে মুক্ত রয়েছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গলার লোকদের বাঁচাবার জন্য তিনি নিজেকে বলি দিয়েছিলেন। ইহাতে tamely submission-এর কথা কি প্রকারে উঠে? পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক নিখিল রায় বলে গেছেন, প্রতাপাদিত্য ও বার-ভুঁইয়াদের…

যদি মহারাণা প্রতাপ কিম্বা শিবাজীকেও সুন্দরবনের মধ্যে রাখা যেত, তা'হলে তাঁরাই বা কতটা কি করতে পারতেন? যশর রাজ্যের পশ্চাতে পর্বতমালা ও মরুভূমি প্রভৃতি ছিল না। বাতাবরণ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে বড় বা ছোট করে দেখায়।

প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে আয়োজনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, আফগান সর্দারদের পরাজিত করবার আয়োজন অপেক্ষা 'ভারু' অপবাদগ্রস্থ বাঙ্গালী-দের "গাঁইয়া-ভুঁইয়া"কে মারবার জন্য কি ভীষণ তোড়জোড়ই না করা হয়েছিল! আর আয়োজন হয়েছিল ভিতর থেকে তাঁকে ধ্বংস করবার জন্য! মির্জা নাথান হয় তা জানতেন না, বা তা বলেন নি। মিনহাজের ন্যায় তিনিও 'এল, দেখল, জয় করল' প্রণালী অনুসরণ করেই পুস্তক লিখেছেন।

প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে যে সামাজিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা' মানসিংহের নামের সহিত বিজড়িত রয়েছে। প্রথমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে খাড়া করা হয়।[১] তাঁর অনেক ব্রাহ্মণ কর্মচারী ভেতর থেকে ষড়যন্ত্র করছিল[২]। তাঁর সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; তাঁর জ্ঞাতিরা বিপক্ষে ছিল (ঘটক কারিকা)। এমন কি তাঁর গুরু-পুরোহিতও তাঁর বিপক্ষতাচরণ করেছিল (বুঝিয়া আহত গুরুপুরোহিত মিলে মানসিংহ সনে—ভারতচন্দ্র)। তাঁর স্বধর্ম ও স্ব-সমাজের লোকও তাঁর বিপক্ষে শত্রুর ভাড়াটিয়া হয়ে অস্ত্রধারণ করেছিল। এ ষড়যন্ত্র যেন হিন্দুর ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করছে। সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আরবদের সঙ্গে জুটেছিলেন! মহারাণা প্রতাপ মানসিংহের নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি পেয়েছিলেন,

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। A. K. Ray—History of Calcutta, (1901).

শিবাজী ও জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহের নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি পেয়েছিলেন, প্রতাপাদিত্য কিন্তু সেই প্রকারের সহানুভূতিটুকুও পর্যন্ত শত্রুদলের হিন্দুদের কাছ থেকে পাননি। এ'যুগের মনোভাবই যেন "ছিন্ন-ভিন্ন করে দে মা লুটেপুটে খাই !"

বারভুঁইয়াদের পতন বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্তরীণ দৌর্বল্যই প্রকাশ করে। ব্যক্তিকে দোষ না দিয়ে সমষ্টি বা জাতির দোষত্রুটি নির্ণয় করার চেষ্টা করাই আজকালকার সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের রীতি।

বারভুঁইয়াদের ইতিহাসে স্থান ঃ সেন রাজাদের বিলুপ্তির পর জাতীয় জীবনের গভীর অমানিশার মধ্যে বারভুঁইয়াদের ইতিহাস যেন আঁধারে আলোক প্রদান ক'রে তৎকালীন সমাজের চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। আমরা শিখেছিলাম, লক্ষ্মণসেন খিড়কীর দরজা দিয়ে পালাল; সিরাজদ্দৌলা পলাশীর রণক্ষেত্র থেকে পালাল, আর "ইংরেজ শান্তি" (Pax Britanica) প্রদান করে অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। ইংরেজ শাসন দৈবী (Providential), এ'কথা বিজ্ঞেরা এবং রাজনীতিকেরাও বলতেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গলার অতীত খোঁজা আরম্ভ হল। বারভুঁইয়ারা আবিষ্কৃত হলেন। চাঁদ, কেদার, প্রতাপ, ঈশা খাঁর কথা নানা ছন্দে পুস্তকে বাহির হতে লাগল। ইহাতে তুলনার বাড়াবাড়ি হলেও আসল ইতিহাসের ক্ষতি হয় না। টডের রাজস্থানের ইতিহাসও debunk করা হয়েছে। অধ্যাপক কানুনগো বিখ্যাত হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ debunk করে দেখিয়েছেন যে, কেবল প্রায় ১৫০ জন সৈনিক এ যুদ্ধে মরেছিল; আর যুদ্ধে হাকিম নামক একজন পাঠান সর্দার সদলবলে রাণা প্রতাপের সঙ্গে মুঘলের বিপক্ষে লড়েছিল। ঐতিহাসিক ভুল-ভ্রান্তির নিরসন হলে আসলটা অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং সেই আসলটার অসম্মান করা বাঞ্ছনীয় নয়। সেটা জাতিগত গুণ বা দৌর্বল্যেরই পরিচায়ক।

জাতীয় মনস্তত্ব ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষকালের ও উনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত আমাদের বাঙ্গলার রাজনীতিক ইতিহাস একবারে তমসাবৃত। ইতিহাস কিছুকাল জানা ছিল না।

আর সাধারণ ভারতবাসী বাঙ্গালীর বিষয়ে মেকলের মন্তব্য পাঠ করে মতামত গঠন করত। বাঙ্গালী যোদ্ধা নিয়ে ব্যঙ্গ-চিত্র সমন্বিত পুস্তকও প্রকাশ হয়েছে।

বাঙ্গলার এই বাস্তব অন্ধকার যুগে এল স্বদেশী আন্দোলনের বান। আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী নিজের অতীতকে খুঁজতে লাগল। যথার্থই পরলোকগত

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলে গেছেন, ইহা বাঙ্গলার "১৯০৬ সালের গৌরবান্বিত বিপ্লব।"

বাঙ্গলার এ' পুনরুত্থানের যুগেই বারভুঁইয়ারা, মল্লভূমির বিস্মৃত কৃষ্টি, বাঙ্গলার বিলুপ্ত চারুশিল্পকলা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হতে লাগল। এ সকলের সমবায়েই বাঙ্গলার তরুণদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জেগে উঠে এবং বিরাট গুপ্ত আন্দোলন সৃষ্টি করে।

পূর্বে আমরা রঘু ডাকাত, আশানন্দ ঢেঁকী প্রভৃতির গল্প শুনে মনের বীর রসের ক্ষুধা মিটাতাম। কিন্তু বাঙ্গলার মরা গাঙ্গে যখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এল তখন বারভুঁইয়ারা আবিষ্কৃত হয়ে তরুণ বাঙ্গালীর মনে জাগায় উৎসাহের উদ্দীপনা, অতীতের স্মৃতি জেগে উঠে তার মানসপটে, তার মনে জ্বালায় আবার আশার আলোক। এ মনস্তত্ত্ব অস্বীকার করা চলে না। বারভুঁইয়ারা যতই ক্ষুদ্র হউক, যতই ভুঁই-ফোঁড় হউন—তাঁরা বর্তমান "কাপুরুষ" অপবাদপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ। বাহারীস্তানে কেবল তাঁদের পূর্বজদের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা আছে। নিখিলনাথ রায়ের ভাষায়, বাঙ্গালী এক সময়ে মুঘল আফগান মঘের সঙ্গে অসি-ক্রীড়া করেছে। এ'সব তথ্য বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামী বাঙ্গলার তরুণদের কাছে তাদের কর্মে প্রেরণার উৎস। তাই প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি নাটক এত জনপ্রিয়। টডের রাজস্থান পড়ে জাতীয়ভাব সংগ্রহের প্রয়োজন আর হয় নি।

বিপরীত সমালোচনা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গলার ইতিহাস" (ইংরাজী) দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বর্ণনা আছে। তাতে গৌড়ে তুর্কী ও হাবসী ভাগ্যান্বেষীদের এবং পরে মুঘলদের জয়ের কথা আছে। ইহাতে বাঙ্গালীদের বিশেষ কোন সংবাদ নেই। বইটি পড়লে মনে হয়, এ পুস্তক যেন সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তি মাত্র! "মুঘল শান্তি" বাঙ্গলার কি উন্নতি-সাধন করেছে, তারপর "ইংরেজ শান্তি" বাঙ্গলা তথা ভারতের কি উপকার করেছে! আর বাঙ্গলার বিশিষ্ট লোকেদের বিষয় সম্পাদক অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার এই বলে শেষ করেছেন: Nearly all of them upstarts ...Pratapaditya and Kedar Rai Isa Khan and Anwar Gazi were not tribal heads nor scions of any old and decayed royal house. They were at best bloated Zamindars. ইহার অর্থ, বারভুঁইয়ারা কোন কৌমের 'সর্দারও নন বা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজগোষ্ঠীর লোকও নন। তাঁরা কেবল "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" জমিদার মাত্র।

সামন্তযুগীয় এ যুক্তি কি বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস ব্যাখ্যাকালে খাটে? তা'হলে শিবাজী, মাধোজী সিন্ধিয়া, রণজিৎ সিং কি? আর ঋক্‌বেদের কালের রাজা পৃথুশ্রবণ থেকে মাধোজী সিন্ধিয়া পর্যন্ত অনেক "রাজচক্রবর্তী" রাজার উৎপত্তির ইতিহাস কি? পুনঃ তুর্কী মুঘল আফগান্ ভাগ্যান্বেষীরা কি ভূঁইফোড় ছিল না? ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Nothing succeeds like success." ভুঁইয়ারা কৃতকার্য হন নি, অতএব শ্লেষের পাত্র হয়েছেন।

বাহারীস্তানেব শিক্ষা : এ পুস্তকের সত্যতা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা নির্ধাবণ করবেন। 'রিয়াজু-স-সালাতিনে' মির্জা নাথানের ও তার বাপের (ইহতিমাম খাঁ) নামোল্লেখ নেই। ঘিয়াস খাঁ ওরফে ইনায়েৎ খাঁয়েরও নামোল্লেখ নেই। এ পুস্তকে কেবল ওসমান খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এ পুস্তকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরিত সুজাত খাঁর অধানে মুঘল সেনানাদের মধ্যে ইহতিমাম খাঁর নামোল্লেখ নেই। তবে জাহাঙ্গীরের 'তবুক' পুস্তকে তাঁর নাম আছে।

কিন্তু 'বাহারীস্তান' পুস্তকে একদিকে আমরা যেমন বাঙ্গালীব কর্মদক্ষতার প্রমাণ পাই তেমনই অপরদিকে জাতীয়কর্মে অক্ষমতার পরিচয়ও পাই। বাহারীস্তান এবং মধ্যযুগীয় বাঙ্গলা পুস্তকসমূহ পাঠে দেখা যায়—কোঁচ, গারো, বাগ্দী, ডোম, হাড়ী, তিপ্রা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সিপাহী হ'ত। কুচবিহারের চিলারায় একজন দ্বিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন।

ঘটক কারিকায় আমরা দেখি, প্রতাপাদিত্যের সিপাহী ও সেনাপতিরা বেশিরভাগ তথাকথিত বাঙ্গালী ছিলেন। বাহারীস্তানে পাই যে মূসাখাঁর নৌ-সেনাপতি আদিল খাঁ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। পদাতিক সেনাপতি ছিলেন রমাই লস্কর ও জানকী বল্লভ। আমরা দেখি, বাঙ্গালী ওসমান খাঁ হাড়ী জাতীয় সিপাহী ছিল[১]। এরূপ নূতন অবস্থায় বাঙ্গালী মন এত আগেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। রাজারা কামান, বন্দুক, রণতরী প্রস্তুত করতেন। স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠন করতেন। প্রতাপাদিত্য বৈদিক বিধানানুযায়ী যথাযথভাবে 'রাজ্যাভিষেক' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাজা হয়েছিলেন। পণ্ডিতদের দ্বারা রাজসভার শোভা বর্ধন হ'ত। এই মধ্যযুগে আমরা বিষ্ণুপুরের "জোড় বাঙ্গলা" ও দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির নির্মিত হতে দেখি। আবার চিন্তাক্ষেত্রে বাঙ্গালী "নব্য-ন্যায়" উদ্ভব করেছিল। মধুসূদন সরস্বতী অস্ত্রধারী নাগা সন্ন্যাসীদল—হিন্দু Knight-Templars গঠন করেছিলেন। চৈতন্যদেব

১। যদুনাথ সরকার—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা মুঘলমারীর যুদ্ধ বর্ণনা।

ভারত পরিক্রমা করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। নূতন সাহিত্যও সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় অকর্মণ্যতা এই নবভাবে উদ্দীপিত হয়ে এক-জাতীয়তা গঠন করতে বাঙ্গালী তৎকালে অক্ষম হয়। ধর্মক্ষেত্রে ভেদাভেদ উঠলেও কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজে একতা আনয়ন করতে পারেনি। ভুঁইয়ারা একতা সম্পাদন করে কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে কার্য করতে অপারগ ছিল।

অধ্যাপক সরকার মহাশয় 'মুঘল শান্তির' প্রশস্তি গেয়েছেন। কিন্তু মুঘল-যুগে বাঙ্গলায় আর মৌলিকতার উদ্ভব হয়নি। রাজনীতিক্ষেত্রে শেষ দীপ নির্বাপিত হয়েছে ভূষণার রাজা সীতারামের পতনে। অধ্যাপক সরকার ইহাকে বাঙ্গলার শেষ হিন্দুরাজ্য বলে অভিহিত করেছেন।[১]

কিন্তু তারপর সব অন্ধকার! শাসকজাতির অনুকরণে বাঙ্গালীর চরিত্রেও অবনতির চরমাবস্থার উদয় হয়।

মুঘলযুগে বাঙ্গালীর শৌর্যবীর্যের যেমন অবসান হয় অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হয়। চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগরের দল আর বিদেশে গিয়ে শুক্তার বদলে মুক্তা নিয়ে ঘরে ফিরে নি। সে সব তখন বিস্মৃত অতীতের গল্প হয়ে গেছে! উহার পরিবর্তে উত্তরভারত হতে ক্ষেত্রীজাতীয় ও রাজস্থান হতে জৈন ধর্মাবলম্বীরা এসে বাঙ্গলায় কারবার করতে থাকেন। ক্রমে তাহাদের মধ্যে কেহবা জমিদার (পাতসাহের খাজনা আদায়কারী), কেহবা ব্যবসা করে মূলধন Finance-Capitalist হলেন অর্থাৎ মূলধন খাটানোর কর্মে নিযুক্ত হলেন। এই অবাঙ্গালী মূলধনীদের কার্যের কেরামতিতে পলাশীর যুদ্ধের প্রহসন হয়। (এ বিষয়ে 'রিয়াজু-স-সালাতিন' গ্রন্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। আর বাঙ্গলার বৈশ্যশ্রেণীরা? তাঁরা আজকালকার মতন দেশের অভ্যন্তরীণ আড়ৎদারীতে নিযুক্ত থাকেন।

সমাজে পরাজয়ের প্রভাবঃ এহেন মুঘলবিজয় যা' বাঙ্গলার রূপই পরিবর্তন করে দিলে তা' নিশ্চয়ই সমাজে প্রতিফলিত হবে। প্রথমে একটা রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-জমিদার দল সৃষ্ট হল! কায়স্থদের পতন হ'ল। ঘটক-কারিকার গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্যের ইঙ্গিতে কেশব ভট্টের মুখ দিয়ে যে দম্ভের কথা বাহির করেছেন তাহা কি আর বাঙ্গালী কায়স্থের পক্ষে প্রযোজ্য হয়? পুনঃ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ ব্যাধ রাজা কালকেতুর মুখ দিয়ে ভাঁড়ুদত্ত কায়স্থকে বলিয়েছেন ঃ

১। History of Bengal, Vol. II.

"কায়স্থনামসিঃ ধর্মঃ স্বর্গস্তপোব্রতাধিকঃ।
গৃহ্ণামি দেহি ভং দেহি অসিঃ প্রাণস্তুসিধনঃ॥"
(ঘটক কারিকা)।

'হয়ে তুই রাজপুত বলিস্ কায়স্থ সূত।
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ॥'

কিন্তু রঘুনন্দনের মত—কলিতে দুই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর বর্ণ নাই (শুদ্ধিতত্ত্ব)। আজ এই উক্তির বলে কায়স্থ ও বৈশ্য শ্রেণীরা শূদ্রত্বে অবনমিত হলেন। বাঙ্গলার রাজপুতদের ভূমিদান দিয়ে হুগলী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বসবাস করাবার ফলে তারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করতে থাকে, যদিচ বাঙ্গলার স্মৃতিতে তাদের এ দাবী স্বীকার করা হয়নি (বৃহস্পতির উক্তি)। নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে এ শ্রেণীকে "জাতমরা রাজপুত" বলা হয়েছে। কিন্তু মুঘল বিজয়ের পরে এই জাতি সম্মানীয় পদ ও অর্থ পেতে লাগল। পশ্চিমের রাজপুত ক্ষেত্রী বেনিয়া উচ্চশ্রেণী ও উচ্চপদস্থ বলে সম্মানিত হল। আর বাঙ্গলার এই 'জাতি বর্ণের' জাতিরা অপদস্থ হলেন।

পরাধীনতার একটা বড় মর্মান্তিক পরিণতি এই যে বাঙ্গালী আর যোদ্ধা-শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হয় নি। কিন্তু বাঙ্গালী পাইকদের কথা 'রিয়াজু-স-সালাতিন' পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে গিয়েছেন। উক্ত পাইক দল গৌড় সুলতানদের Pretorian Guards গঠন করেছিল। হাবসী রাজা মোজাফরসার সহিত অভিজাতদের যে অন্তর্যুদ্ধ হয় তাতে সুলতানের হাবসী ও আফগান সৈন্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর সৈন্য ছিল (রিয়াজু-স ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১২৭)। আর হাজী মহম্মদ কান্দাহারী বলেছেন, এই অন্তর্যুদ্ধে ১২০,০০০ হিন্দু ও মুসলমান মৃত হয়। অবশ্য এই হিন্দুরা স্থানীয় লোক ছিল (ঐ, পৃঃ ১২৮)। কেবল একডালার যুদ্ধের বর্ণনাকালে দিল্লীর জিয়াবারুণী গৌড়ের ভাঙ্গী ইলিয়াস সাহের বাঙ্গালী পাইক ও তাদের চালক 'কালামুখো' রাজাদের বিষয় হাস্যকর বর্ণনা করে বলেছেন যে তারা যুদ্ধের সময় মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে পড়েছিল। আর সম্রাট ফিরোজ সার সৈনেরা তাদের মাথা কেটে ফেলল (তারিখি-ই-ফিরোজ সাহী)।

মুঘল বিজয়ের পূর্বে মাধবাচার্য "চণ্ডী" পুস্তকের কালকেতুর বর্ণনায় বলেছেন, সে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাকে যখন বন্দী করে কলিঙ্গ রাজার সভায় নিয়ে খাড়া করা হয়, তখন "রাজসভা দেখিয়া বীর প্রণাম না করে।" এতই অনমনীয় সাহস। আর কবিকঙ্কণ যিনি মানসিংহের বন্দনা করে গ্রন্থ আরম্ভ

করেছেন, তিনি কালকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে চালের মরাইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছেন। পরাধীনতার এই পরিণতি !

শেষকথা ঃ…"বাহারীস্তান" পুস্তক যার বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা এখনও যাচাই করা হয় নি তাতে আমরা আমাদের মধ্যযুগের জাতীয় কার্যকরী শক্তির পরিচয় যেমন পাই, অক্ষমতার কথাও তেমন পাই। এই পুস্তক পাঠে দৃষ্ট হয়, ভারতীয়দের বরাবর যে ত্রুটি ছিল বাঙ্গলাতেও তা প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে out-manouvered হয়েছিলেন। ইহার অর্থ, বিপক্ষ যুদ্ধনীতির কৌশল বিষয়ে বেশী পারদর্শী ছিল। অজ্ঞানতার সঙ্কীর্ণতাই ইহার জন্য দায়ী। পুনঃ বাহারীস্তান পাঠে দৃষ্ট হয়, সংখ্যাধিক্যেই মুঘলেরা জয়ী হয়। আবার প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে বাঙ্গলা পুস্তকসমূহ পুনঃপুনঃ বলেছেন, সংখ্যাধিক্যের জন্যই মুঘলেরা প্রতাপাদিত্যকে জয় করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ইংরাজ যুগ ॥

"তস্মাদ্ যোগায়, যুজস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥" গীতা ২।৫

কর্মযোগে জাগি পুরুষের মত।
পরসেবা ব্রত কর উদ্দীপন ॥

(স্বদেশী রামায়ণ ধৃত সঙ্গীত)

॥ শাসন-বিবর্তন ॥

ভারতের ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের কথা পাশ্চাত্যদের গাথার মধ্যে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে ভারতীয়েরা রেশমী কাপড় প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত করতো। ঈজিপ্তে টলেমিদের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রীয়াতে ভারতীয়দের উপনিবেশ ছিল। কোন এক অজ্ঞাতকালে জনৈক ভারতীয় পর্যটক তথাকার পিরামিডের উপর আরোহণ ক'রে নিজের নাম লিখে রেখেছিলেন[১]। টলেমিদের সময়ে একজন ভারতীয় বণিক তথাকার এক মন্দিরের মহন্ত[২] হয়েছিলেন।

ভারত বহুকাল থেকেই ইউরোপের কাছে এক রহস্যপূর্ণ দেশ ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একখানি অর্ণবপোত জার্মাণ মহাসমুদ্রে জলমগ্ন হয়; ইহার দু'জন নাবিক জার্মাণীতে প্রবেশ করে সোয়াবীয়া রাজ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাকার রাজা নিকটস্থ রোমান ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁদের পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি এ' সংবাদ প্রথম শতাব্দীর সপ্তম দশকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন[৩]। এই লেখক আবার বলেছেন আমাদের রোমীয় মহিলারা এমন বিলাসী যে ভারতীয় রেশম (অংশুক) ব্যতীত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করবেন না এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এমন চতুর যে তাঁরা মূল্যস্বরূপ সুবর্ণ-মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করবেন না। এরূপেই গুপ্তযুগে রোমান দীনার (Dinarius) এবং তারপর পাল-যুগে বাঙ্গলায় এবং উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় গ্রীক পয়সা দ্রম্ম

১। Rawlinson-এর লেখা।
২। Gordon Child—What History Teaches.
৩। de Aquatil's Disquisition on India.

(Drachma) ভারতে প্রচলিত হয়। রোমীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের বহু নিদর্শন ভারতীয় উপদ্বীপাংশের উপকূলসমূহে আবিষ্কৃত হয়েছে[১]।

ভারতীয় বাণিজ্যের পণ্যগুলো বহুপূর্বে আরবের ইয়েমেনের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে আনীত হ'ত। এই কারণবশতঃ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ঈজিপ্তের এক প্রাচীন ফ্যারাও (সম্রাট) দ্বারা সুয়েজখাল খনন করা হয়। টলেমীদের রাজত্বের সময় থেকে আমরা স্পষ্টভাবে ভারতীয় বণিকদের নামোল্লেখ হতে দেখি। রোমান সম্রাট অগষ্টুস্ সীজারের সময়ে তিনটি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে আসে।

কিন্তু কালে তুর্কীরা যখন পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহে প্রবল হয় তখন তাদের অত্যধিক উচ্চ শুল্কনীতির ফলে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়। সে সময় থেকেই ইউরোপীয়েরা জলপথে ভারতে আসার পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টিত ছিল। জেনোয়ার নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাজার সাহায্য ও সহযোগীতায় ভারতের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে মধ্য আটলান্টিকের জলস্রোতে বাহিত হয়ে এক অজ্ঞাত মহাদেশে এসে উপস্থিত হন। কালে এই মহাদেশ আমেরিগো ভেসপুচি নামক আর এক ইটালীয় নাবিকের নামানুসারে আমেরিকা নামে আখ্যাত হয়। শেষে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপের দক্ষিণ পথ বেয়ে ভারতের দক্ষিণ মালাবার উপকূলে এসে উপনীত হন। আর যে পথ প্রদর্শক (Pilot) তাঁর অর্ণবপোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়ে ১৪৯৮ খৃঃ দক্ষিণ ভারতে উপনীত করেন তিনি একজন ভারতবাসী[২]।

সেই অবধি নানাজাতীয় ইউরোপীয়েরা ধনদৌলত লাভের আশায় ভারতে আসতে থাকেন এবং উপকূলগুলোতে বাণিজ্যক্ষেত্র স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, ইউরোপের বর্তমান উন্নতির মূলে আছে প্রাচ্যের বাণিজ্য এবং ধন-সম্পদ। ইংলণ্ডের বর্তমান শ্রমশিল্প-সভ্যতার (industrial civilisation) মূলে আছে ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন।

কালের গতিতে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক বাঙ্গলার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়। তারপর সম্রাট বাহাদুর সাহ্ আলম বাঙ্গলার দেওয়ানী শাসনের ভার ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করলে, এই কোম্পানী

১। Modern Review – April, 1956.
২। John Gunther—Inside Africa, p. 322.

বাঙ্গলার শাসনভাগ ইউরোপীয় ছাঁচে গড়তে আরম্ভ করেন। শাসন বিষয়ে বাঙ্গলার অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার জন্য একটা 'কর্মসম্পাদন সভা' গঠন করা হয়। এই পরিষদ সমস্ত প্রদেশ অনুসন্ধান করে তদন্তর যে মন্তব্য তাদের সরকারের কাছে পেশ করেছিল তার নাম 'সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট'। উক্ত অনুসন্ধান বিবরণীতে আইন-বিচার বিষয়ে এই মন্তব্য আছে যে, "গ্রামে গ্রামে মৌলভী ও পাণ্ডিত আছেন যাঁদের বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নেই অথচ তাহারা বিচারকের পদাভিষিক্ত হয়ে আছেন। পুনঃ এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিচার করে যাহার উপরে রাগ আছে তাহাকে জাতিচ্যুত করেন। রাজাই লোককে জাতিতে পুনরুত্থিত করতে পারেন। কিন্তু মুসলমান রাজা হিন্দুকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, সেজন্যে জাতিচ্যুত ব্যক্তির জাতিতে উঠবার উপায় থাকে না। অতঃপর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেন যেন বিনা অপরাধে আর কাহারও জাত মারা না যায়।" উক্ত বিবরণী থেকে বাঙ্গলার একটা সামাজিক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হলো! মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাত-মারামারি এত বেড়ে গিয়েছিল যে বিয়ের রীতিমত অসুবিধা ঘটতো। যবন দোষ, রোহিলা দোষ, পাঠান দোষ, শূদ্র দোষ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের দোষ দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো (দেবীবর ঘটকের 'মেলবন্ধন' দ্রষ্টব্য)। কোন্ এক মুসলমান সিপাহী ব্রাহ্মণকে ঘুসি মেরেছে, তাতে তার জাত নষ্ট হয়ে গেল। মুসলমানের খানার ঘ্রাণ কোন ব্রাহ্মণের নাকে ঢুকলো তো অমনি 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্' বলে তার জাতিপাত হলো[১]।

অবশেষে রাঢ়া ব্রাহ্মণদের 'মেলবন্ধন' এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 'পটীবন্ধন' দ্বারা সম-দোষের লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ব্রাহ্মণসমাজ সঞ্জীবিত হয়। এই বিভীষিকার কারণ কি? এসব বিষয়ের কোন অনুজ্ঞা স্মৃতিশাস্ত্রেও নেই। স্মৃতিতে অপরাধীর জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু জাতীয় সমাজ থেকে বিতাড়িত করবার কোন অনুজ্ঞা পাওয়া যায় না। এটা তা'হলে স্বকপোলকল্পিত ব্যবস্থা যার ফলে হিন্দুসমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্মগুরু ৺হরিদাস গোস্বামী মহোদয় লেখককে বলেছিলেন—মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণেরা মুসলমান রাজাদের অর্থ নিয়ে লোকের জাতিপাত করতো। এই বিষয়ের প্রমাণও আছে। তিনি একথা লেখককে বলেছিলেন এবং এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই লেখার অনুসন্ধান করতে বলেন।

১। নগেন্দ্রনাথ বসু—ব্রাহ্মণ কাণ্ড।

লেখক অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে অনেক ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজাদের কাছ থেকে ভূমি 'লাখেরাজ' হিসেবে দান পেয়েছে, অনেক ব্রাহ্মণ মুসলমান যুগে 'মদতমাস' বৃত্তি বা তার পরিবর্তে 'ভূমিদান' পেয়েছে। কেন তারা পেয়েছে এ'দান ? এ প্রশ্নের উত্তরে পরোক্ষভাবে স্বর্গীয় গোস্ব'মীর উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট গৌণভাবে ইহা প্রমাণিত করে।

'ব্রাহ্মণবর্ণ' হিন্দুর পুরোহিত শ্রেণী। তাঁরা জাতিভ্রষ্ট হলে হিন্দুজাতি বিপর্যস্ত হবে। তুর্কি মুসলমান শাসকদের এই ধারণা সাম্রাজ্যবাদীয় চাল ছিল বলে অনুমান করা যায়। স্পর্শদোষ বা ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার বিভীষিকা দ্বারা এ' অপকর্মের উৎপত্তির হেতু নির্ধারণ করা অসম্ভব, বিশেষত যখন কোন শাস্ত্রীয় বিধান এর পেছনে নেই। রাজনীতিক চালবাজি এবং লোকের অজ্ঞানতার ফলেই এই সমাজদ্রোহী অপকার্যের সৃষ্টি হয়। বিদেশী ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রে এই অপকর্ম অনুষ্ঠানে নিষেধ আরোপ করে দেয়। এর ফলেই পরে ফেরেঙ্গ দোষ, আলোমান দোষ, ফরাসী দোষ, আঙ্গরেজ দোষ প্রভৃতি 'দোষ'-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আর হয়নি। এই প্রথা এ'ভাবে রদ হওয়ায় সমাজ প্রকৃতিস্থ হয়ে ভবিষ্যতের বিবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা পায়।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার সামাজিক রীতি বিষয়ে দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করেন 'সতীদাহ-প্রথা' নিবারণের কালে। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বেই কলিকাতার কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি একটি সমিতি গ'ড়ে সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য চেষ্টিত হন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্মশানে গিয়ে স্বামীর চিতায় প্রবেশকারী বিধবাকে বুঝাতেন যে বিধবার স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রবেশ করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। পরে রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন দ্বারা এ প্রথা রদ করার জন্যে ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করেন। এ'ছাড়া শিক্ষিতদের মধ্যে আরও অনেকে এই প্রথার বিপক্ষে ছিলেন। এ'সকলের সমর্থনের উপর ভরসা করেই গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করে দেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিপক্ষদল বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেও হেরে যান।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে সমাজের কুপ্রথা ও কদাচার নিবারণের জন্যে একদল শিক্ষিত হিন্দু আন্দোলন করতে আরম্ভ করেন এবং তদানীন্তন সরকার অনেক স্থলে তা'র সহায়ক হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের দ্বারা 'বহু বিবাহ' প্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে

হিন্দুদের ২১০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক দরখাস্তে বলা হয়—কুলীনদের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহ যেন বন্ধ করা হয়। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে তখন হস্তক্ষেপ করেন নি[১]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫৫ খৃঃ) প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। এই জাতি আগে বাঙ্গলার অধিবাসী ছিল না। বাঙ্গলার পশ্চিমভাগের পর্বতমালার সানুদেশ যাহা দামন-ই-কো নামে অভিহিত ছিল তথায় এদের অধিবাস ছিল। এই অঞ্চল পরে ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে বিভক্ত হয়[২]; এরা তিন বার অভিযান দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে এবং ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে বলে কথিত হয়ে থাকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে এদের নামোল্লেখ নেই। এদের ভাষার 'মন-ক্ষেমর' কারেন জাতিদের ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে বলে একদল ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলে থাকেন। অন্যদিকে হাঙ্গেরীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ফন্ হাভেসী 'মন ক্ষেমর' জাতীয় ভাষার সহিত সাঁওতাল ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্ধিহান[৩]। ইনি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা আষ্ট্রিক্ ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন[৪]। ইনি বরং সাঁওতাল ভাষাকে ফিনোউগ্রীয় (Finno-Ugric) ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক প্রমাণে তৎপর। যা' হউক, সাঁওতালদের ভাষা, ধর্ম এবং আচার বিষয়ে আর্য্যভাষীদের সহিত কোন সাদৃশ্য নেই। তবে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে আর্য্য আচারের কিছু প্রভাব তাদের ভেতর বিস্তারলাভ করেছে।

এই সরল ও অজ্ঞ জাতি ক্রমশঃ হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বস্তু হয়ে উঠে। অবশেষে তারা বিদ্রোহ করে। সরকার কর্তৃক বিদ্রোহ দমনের পর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩৭ ধারা এবং '৫৭ খৃষ্টাব্দে ১০ ধারা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণাসমূহ একটা 'বে-বন্দোবস্তী' জনপদরূপে পরিণত হয়।

পুনরায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের আগে সাঁওতালদের মধ্যে অশান্তির আশঙ্কা জেগে ওঠে এবং একটা ধর্ম আন্দোলনও উপস্থিত হয়। তারা তখন নিজেদের কৌমগত ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। এতদ্বারা

১। C. E. Buckland—Bengal Under The Lieutenant Governors, Vol. I. p. 324 ; 1—2 ch. on Sir. Cecil Beadon.

২। Buckland—Vol. I. pp. 11—16.

৩। Wilhelm Von Hevesy "Zur Verwandschaft der Munde—Sprachen" in "Orientalische Literatur Zeitung" ; May, 1926.

৪। W.Von Hevesy : A false linguistic family : 'The Austro—Asiatic' in B. O. Journal, 1934. Vol. XX p. 251.

তারা এক প্রকারের রাজনীতিক সংঘ স্থাপনের আশা পোষণ করেছিল। কিন্তু সরকার সজাগ হয়েই পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করে। ফলে সে উত্তেজনা থেমে যায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ে উন্নতিকল্পে সরকার সচেষ্ট হন। ইংরেজী এবং বাঙ্গলাভাষার মাধ্যমে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাবিস্তার করার জন্যে ১৮৫৭ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সময়ে সরকার পক্ষে একটা কথা উঠেছিল যে বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্কও ছিল। একদল বিশ্বাস করেন এবং প্রচারও করেন যে শিক্ষা বিস্তারের ফলেই নাকি বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ তা' অগ্রাহ্য করে বলেন যে বিদ্যালয়গুলো বিদ্রোহ উৎপাদনে অকিঞ্চিৎ পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। যা' হউক, বাঙ্গালীর শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা বিষয়ে তাদের নির্বিরোধিতা প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু বিহারের লোকে এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল, যেমন অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের উন্নতি বিষয়ক যে কোন সঙ্কল্পে প্রথমে আপত্তি করে থাকে।

১৮৫৬ খৃঃ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলন করার প্রচেষ্টাকে সরকার জয়যুক্ত করেন। বিদ্যাসাগর প্রাচীন স্মৃতি পুস্তকগুলো থেকে প্রমাণ দেখান যে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। বস্তুতঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে মনু, কাত্যায়ণ, নারদ, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিতে বিধবা বিবাহের অনুজ্ঞা আছে। পুনঃ বাঙ্গলার বাইরে কতিপয় তথাকথিত উপজাতি ব্যতীত শূদ্রজাতিগুলোর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। আবার 'তালাক' অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদও তথাকথিত অনেক নিম্ন জাতিদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কৌটিল্য স্বয়ং এই বিষয়ে বলেছেন—পরস্পরম্ দ্বেষং মোক্ষম্ অর্থাৎ পরস্পর 'অবনিবনা' হলে পৃথক হবে।

বাঙ্গলায় পূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ-যুগ আজ পর্যন্ত "সাঙ্গা" কথাটা তার সাক্ষ্য প্রদান করে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' বিধবা বিবাহ প্রচলনের কথা আছে। কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আচরণের প্রবল চাপে উচ্চজাতিগুলো এ প্রথা ত্যাগ করেছিল।

তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠে যায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

রাজ্যপাল সিসিল বিডনের শাসনকালে (১৮৬৪-৬৫) বাঙ্গলায় কতিপয় সামাজিক কদাচার বিষয়ে তৃতীয়বার হস্তক্ষেপ করেন। ধর্মের মানতের নামে গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করা, ধর্মের নামে শরীরে বাণ ফোঁড়া, গঙ্গাজলে মৃতদেহ ও পশুর শব ফেলে দেওয়া প্রভৃতি আরও অনেক কদাচার আইন দ্বারা দণ্ডনীয় করা হয়। উইলিয়ম ডিগবী মহোদয় তার 'ব্রিটিশ-শাসিত সমৃদ্ধ ভারত' ('Prosperous British India') নামক ব্যঙ্গ পুস্তকে এর একটা লম্বা তালিকা প্রকাশ করেছেন। এ সব কদাচার বর্তমান সমাজ-শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে বলেই আজ আমাদের কাছে কদাচারগুলো অবিশ্বাসের জিনিষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত ধর্মের নামে বিভৎসতার কি তাণ্ডব নৃত্যই না সমাজে চলতো! আর অজ্ঞেরা তা শাস্ত্রের অনুজ্ঞা বলে অবনত মস্তকে মেনে নিত।

পুনঃ ১৮৬২ খৃঃ ফৌজদারী মোকদ্দমায় "মুরী প্রথা" বিডন মহোদয় কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। তৎপর তাঁর শাসনকালে বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারকল্পে 'নর্মাল স্কুল'-সমূহ স্থাপিত হয় এবং গুরুট্রেনিং শিক্ষাপদ্ধতিও প্রচলিত হয়।

তারপর ১৮৯১ খৃঃ সহবাস সম্মতি আইন (Consent Age Act) সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সমাজের বালবধূকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। যৌবনাবস্থার পূর্বে অল্প বয়স্ক বধূর স্বামী-গৃহে বাস করা হিন্দুর শাস্ত্রানু-মোদিত নয়। বাল্য-বিবাহ হিন্দুর হতো। কিন্তু হিন্দুসমাজে তার প্রতিশেধক ব্যবস্থাও ছিল। ধর্মশাস্ত্রেই এই প্রথার নিষেধ আছে। বধূ পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তা হ'লে স্বামী-গৃহে প্রেরিত হয়ে পুনর্বিবাহ সম্পাদিত হত। বাঙ্গলার বাইরে সর্বত্র এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় এর বিপরীত রীতি প্রচলিত ছিল। এই রাতির ফলে অনেকস্থলে বালিকা বধূ ব্যাধিগ্রস্থ হতো। আশ্চর্যের কথা, রঘুনন্দন এ বিষয়ে নীরব! শিক্ষিতদের আন্দোলনের ফলে বিপরীত-পক্ষীয়দের প্রতিবাদ সত্বেও ইংরেজ সরকার একটা আইনের দ্বারা বালিকা বধূর সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ দণ্ডনীয় করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে বাঙ্গলার সীমান্তের বিভিন্নস্থানে পার্বত্য কৌমদের মধ্যে অশান্তির উদয় হয়। লুসাই পর্বতে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের গোলযোগ ঘটে। এরা ইংরেজ রাজত্বে এসে গোলমাল করতো বলে শুনা যায়। পরে ধীরে ধীরে তারা দমিত হয়ে যায়। আবার ১৮৮০-৯৪ খৃঃ তিব্বতীয়েরা সিকিম আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে তারা ফিরে যায়। মণিপুরের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বাঙ্গলায় নানা প্রকারের জ্বর ও মড়কের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সিসিল বিডনের শাসনকালে বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ দু'টোতে ১৮৬২ সালে ভীষণভাবে মড়ক দেখা দেয়। যশোহর, নদীয়া, বারাসাত ও হুগলী থেকে বর্দ্ধমান অবধি এর প্রসার ঘটে। আবার ১৮৮১ সালে 'নদীয়া জ্বর' নামে আর একপ্রকার জ্বরের আবির্ভাব ঘটে। ঐসবের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এসব কারণের বিশেষ কোন হেতু আবিষ্কার করা যায় নি। কিন্তু এই মারাত্মক জ্বরে সহস্রে প্রায় ৪০ জন হিসাবে লোকের প্রাণ নাশ হয়ে যায় (হাজারে ৩৯·৭২ ভাগ)[১]।

১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লোকসংখ্যা গণনা আরম্ভ করা হয়েছিল। তা থেকে দেখা যায় যে সেকালে বাঙ্গলার লোক ছিল ৩৬,৭৬৯,৭৩৫ জন অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৪৩০ জনের বাস। বাঙ্গলা এবং আসামের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০,৬৬৪,৭৭৫ জন। এদের ভেতর সংখ্যাধিক্যের বাস ছিল নিম্নবঙ্গে অর্থাৎ বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গালাতে তাদের সংখ্যা ছিল ১৭,৫০০,০০০ জন[২]। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুর সংখ্যা তৎকালীন মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নদীয়াতে পুনরায় জ্বরের পাদুর্ভাব ঘটে। এবার মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৯·৭২ জন। এবারের লোকসংখ্যা গণনায় দেখা যায় যে আসাম ব্যতীত বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৬৯,৫৬৬,৮৬১ জন। অতএব পূর্বাপেক্ষা শতকরা বৃদ্ধির হার ১০·৮৯ জন। এবারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল বেশী। হিন্দুর সংখ্যা ৪৫,৪৫২,৮০৬ জন, মুসলমানদের সংখ্যা ২১,৭০৪ ৭২৪ জন, খৃষ্টানের সংখ্যা ১২৮,১৩৫ জন। এই সময়েই আরও দেখা যায় যে ঢাকা বিভাগে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। অন্যদিকে বর্দ্ধমান বিভাগে তারা শতকরা ২·৭৭ অর্থাৎ তিন জনের কম। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত জ্বরের প্রকোপই এর জন্য দায়ী বলে নিরূপণ করা হয়ে থাকে[৩]। পুনরায় ১৮৭২ খৃঃ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৩·৬৪ জন এবং মুসলমানদের হার ১০·৯৬।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় তৃতীয়বার লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তাতে দেখা যায় পূর্ববঙ্গে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩·৫ জন। এর কারণ বিবিধ

১। বাকল্যাণ্ড—২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫০।

২। ঐ —১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬—৫১৭।

৩। ঐ —২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩৬।

দেশের সাধারণ অবস্থা বিশেষ মড়কের প্রাদুর্ভাবের অভাব, বিহার ও মধ্য-বাঙ্গলা থেকে আগত লোকের পূর্ববঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন।

উত্তরবঙ্গের উচ্চভূমিতে লোকসংখ্যা শতকরা ছয় জন হিসেবে বৃদ্ধি পায়, হিমালয়ের পাদদেশে এবং গঙ্গার দুই কূলে লোকসংখ্যা কমে যায়। পশ্চিম-বঙ্গে খনি কারখানা অঞ্চলে লোকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে লোকসংখ্যা কমেছে[১]।

ভারত সরকারের দশ-বছর অন্তর দেশের অভ্যন্তরীন সালতামামীর সংবাদ যা The Report on the moral and material progress and conditions of India for the ten years ending 1891-92 গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গলাদেশের লোক-সংখ্যা মোটামুটি ৪০,৪০০,০০০ জন। আসল বাঙ্গলায় (Bengal proper) দুর্ভিক্ষ বস্তুত অজ্ঞাত আর প্রচুর বারিপাতের জন্য এদেশ উর্বরা।

শেষে আসে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনা। তাতে দেখা যায় লোকসংখ্যা কমবেশী সাত কোটির উপর ; তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশী।

ঐ ঘটনা (মুসলমান সংখ্যাধিক্য) কি প্রকারে হল, এ বিষয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন। এক শতাব্দীর মধ্যে বিশেষভাবে হিন্দু প্রধান প্রদেশ অহিন্দু প্রধান কি প্রকারে হয়—ইহা একদিকে যেমন অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় অন্যদিকে তেমনি আবার গবেষণার বিষয়ও বটে।

মধ্যযুগের ন্যায় বিশেষভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের হিড়িক ইংরেজ শাসনে হয় নি। তবে "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" চিরকালই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলেছে[২]। জনকতকের ভেতর তথাকথিত সংস্কার এবং স্বাধীনতা এই ক্ষয়িষ্ণুতাকে ব্যাহত করতে পারে না। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা এবং তৎপ্রসৃত বিধিনিষেধসমূহই এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। দেশ বিভাগের দ্বারা হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার হ্রাস পাবে না। যে অজ্ঞাত কারণে বাঙ্গলায় হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে পাঞ্জাবেও তাহাই কার্যকরী হয়েছে। এর মূল কারণ সমাজ-শরীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।

তবে পূর্বোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গেই ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ পাওয়া যায় সুস্পষ্টভাবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে ইংরেজ শাসনের

১। বাকল্যাণ্ড—২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৩।

২। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্লকুমার সরকার।

শেষ যুগ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গেই বেশী হয়। এটি ক্ষয়িষ্ণুতার একটি বিশিষ্ট কারণ বটে। হিন্দুর জন্ম-হার অহিন্দু থেকে কম নয়। কিন্তু সমাজ-শরীরের ব্যাধি, বাল্য বিবাহ, বিধবার পুনঃ বিবাহের নিষেধ প্রভৃতি হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তির অন্তরায়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার তালিকায় দেখা যায় যে অবিবাহিত হিন্দু-মেয়ের সংখ্যা থেকে বিবাহিত হিন্দু-মেয়ের সংখ্যা কম, অর্থাৎ বিবাহের পর হিন্দু-মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুহার বেড়ে যায়[১]। হিন্দুর বহু-বিবাহ বস্তুতঃ ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে উহা আছে; হিন্দুর বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন আছে। সমাজ বিজ্ঞানের অভিমত এই যে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধির হার কমে আসে, দরিদ্রের বেপরোয়া বংশবৃদ্ধির ভাবটাও ক্ষীয়মান হতে আরম্ভ করে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে মুসলমানদের একদিকে যেমন সন্ততি-বৃদ্ধির হার বেশী, তেমনি অপরদিকে সন্ততিদের মৃত্যুর হারও হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। সুতরাং স্পষ্টই অনুমা . করা যায় যে বাঙ্গলার বয়স্ক হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা বেশী।

কিন্তু আসল কথা থেকে যায়। এ বিষয়ে এটাই শেষকথা যে কি প্রকারে হিন্দুপ্রধান বাঙ্গলা অহিন্দু-প্রধান হয়ে যায়। এ পরিবর্তন একটা সমাজ-তাত্ত্বিক, নরতাত্ত্বিক ও সংখ্যাশাস্ত্রের গবেষণার বস্তু।

লোকগণনার অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য এস্থলে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হল। এ জনসংখ্যা গণনা পুরাতন বাঙ্গলা প্রদেশের অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম সহ ভিত্তিতে ধরা হয়েছে।

১৮৭১—৭২ খৃষ্টাব্দে খাস বাঙ্গলা—মোট জনসংখ্যা ৩৬,৭৬৯,৭৩৫

বাঙ্গলা এবং আসাম—হিন্দু—৪২,৬৭৪,৩৬১; মুসলমান—২০,৬৬৪,৭৭৫ বেশীর ভাগ মুসলমান সংখ্যায় ১৭,৫০০,০০০ নিম্নবঙ্গের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গলাভাষী অঞ্চলের লোক। কলিকাতা ও সহরতলী এবং হাওড়ার জনসংখ্যা ৮৯২,৪২৯ (গণনা বিশ্বস্ত নহে)।

এ জনসংখ্যা গণনার মধ্যে ১৭,৩৯৯ বর্গমাইলের বাসিন্দা—যথা, সুন্দরবন, আসামের লখিমপুর ও কাছাড়ের পার্বত্যাঞ্চলের এবং বড় নদীসমূহের অঞ্চল বাদ দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাহাড়ের সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ গণনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তদ্রুপ দার্জিলিং পর্বতের সানুদেশস্থ তরাই,

১। এ বিষয়ে ১৯৫১ সালের সেন্সাস তালিকা দ্রষ্টব্য।

ভুটান, ডুয়ার্স, সিকিম, নাগা পর্বতের এবং আসামের অর্ধ-স্বাধীন-জাতীয় লোকসমূহের গণনা সম্ভব হয়নি[১]।

১৮৮১ খৃঃ

বাঙ্গলা	জনসংখ্যা
বর্দ্ধমান বিভাগ	৭,৩৯৩,৯৫৪
প্রেসিডেন্সি	৮,২১১,৯৮৬
রাজসাহী	৭,৭২৬,৭০১
ঢাকা	৮,৭০৫,৯১৬
চট্টগ্রাম	৩,৫৬৯,০৭১

উপরোক্ত হিসাব বাকল্যাণ্ড প্রদত্ত ১৮৯১ খৃঃ তুলনামূলক সংখ্যা হতে গৃহীত হয়েছে[২]।

জনসংখ্যা শতকরা ১০.৮৯ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃদ্ধির শতকরা হার বর্দ্ধমান বিভাগে সর্বাপেক্ষা কম—যথা, ২.৭৭%। ১৮৬৪-৭৩ খৃঃ "বর্দ্ধমান জ্বরের" প্রকোপই জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ বলে ধরা হয়েছে। ১৮৭২-৮১ খৃঃ মধ্যে বিহার সমেত বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি ১৩.১৪%; মুসলমান ১০.৯০%, খৃষ্টান ৪০.৭১%, বৌদ্ধ ৯৩.২৯%।[৩]

আসাম ব্যতীত বাঙ্গলা প্রদেশ (বিহার সহ) ১৮৯১

বাঙ্গলা	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
বর্দ্ধমান বিভাগ	৭,৬৬৮,৮০৮	৩.৯৮
প্রেসিডেন্সি "	৮,৫১২,৬৩০	৩.৬৬
রাজসাহী "	৮,০১৯,১৮৭	৩.৭৮
ঢাকা "	৯,৮৪৪,১২৭	১৩.০৭
চট্টগ্রাম "	৪,১৯০,০৮১	১৭.৭০

(বাকল্যাণ্ড—২য় খণ্ড ; পৃঃ ৯০৩ হইতে গৃহীত)

পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যা শতকরা ১৩½ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। সাধারণ শ্রীবৃদ্ধি, মড়কের অভাব এবং বিহার ও মধ্য-বাঙ্গলা থেকে গিয়ে লোকের উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলে অনুমিত হয়। উত্তরবঙ্গে

১। Buckland—Bengal Under the Lt. Governors; Vol, I. pp. 514—17 (1901).
২। Buckland—Bengal Under the Lt. Governors; Vol, II. p. 903.
৩। Buckland—Ibid. pp. 736-37.

জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ৬ জনের বেশী। কিন্তু হিমালয়ের সানুদেশ এবং গঙ্গার উভয়তীরাঞ্চলে জনসংখ্যা কমেছে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকেন্দ্র ও খনি অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে (বাকল্যাণ্ড—ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৩)।

লোকগণনা বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯০১	২০,১৫০,৫৪১	২১,৯৪৭,৯৮০
১৯১১	২০,৯৪৫,৩১৯	২৪,২৩৭,২২৪

১৯৫১ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ আদম সুমারীর হিসাব।

(মোট লোকসংখ্যা—২৪,৮১০,৩০৮)

হিন্দু—	১৯,৪৬২,৭০৬	৭৮·৪৫%
শিখ—	২৯,৮৬৪	০·১২%
জৈন—	১৯,১১৬	০·০৮%
বৌদ্ধ—	৮১,৫৭৬	০·৩৩%
জারতুষ্ট্রীয়—	১,৯১৮	০·০১%
মুসলমান—	৪,৯২৫,৪৯৬	১৯·৮৫%
খৃষ্টান—	১,৭৫,০২১	০·৭০%

(পশ্চিমবঙ্গ আদম সুমারী রিপোর্ট—৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৬৮)

পূর্ব পাকিস্থান থেকে হিন্দুরা ক্রমাগত চলে আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রে এক্ষণে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেছে।

উদ্ধৃত তালিকাসমূহে দেখা যায়, ১৮৯১ খৃঃ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তারপর ১৯০১ খৃঃ হতে দৃষ্ট হয়, মুসলমানের সংখ্যা মোটের উপর কিঞ্চিৎ বেশী। এই গণনাকাল থেকেই মুসলমানের বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়তির পথেই চলেছে। ১৯৩১ সালের গণনায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মোট বৃদ্ধি প্রায় ৬৬ মিলিয়ন (৬০ লক্ষ) বেশী ; কিন্তু ১৯৪১ সালের গণনায় বৃদ্ধির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ মিলিয়ন অর্থাৎ আশী লক্ষ।

১৯০১—১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত বাঙ্গলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার (variation per cent) :—

আঞ্চলিক নাম	হিন্দু	মুসলমান
বাঙ্গলা	+৩.৯	+১০.৪
পশ্চিমবঙ্গ	+১.৭	+ ৪.৯
মধ্যবঙ্গ	+৫.২	+ ৩.১
উত্তরবঙ্গ	+২.৯	+ ৪.২
পূর্ববঙ্গ	+৬.৬	+১৪.৬

(Statistical Abstract : Govt. of West Bengal)

১৮৯১ খৃঃ গণনায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে লোকসংখ্যার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি-প্রাপ্তি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ১৯০১ খৃঃ থেকে বাঙ্গলায় জনসংখ্যা গণনায় মুসলমানের সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়। ১৯১১ খৃঃ লোক গণনায় একমাত্র মধ্যবঙ্গ ব্যতীত বাঙ্গলার সর্বত্রই মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার বেশী। পূর্ববঙ্গে এই বৃদ্ধির হার আবার সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশী। এই হারের আকস্মিক ও বিস্ময়কর বৃদ্ধির কারণ কি? নিম্নোক্ত তালিকা খাস বাঙ্গলা অঞ্চলের (আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা বাদ)।

এ বিষয়ে '৫১ খৃঃ গণনাকালে পাকিস্তানের সেন্সাস রিপোর্ট (Bulletin No. 2) স্বীকার করেছে যে ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ খৃঃ সেন্সাসসমূহ রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ খৃঃ সেন্সাসে পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা ৪২.৩ মিলিয়ন দেখান হয়েছে। কিন্তু সঠিক গণনায় প্রকৃত সংখ্যা হবে ৩৮.৬ মিলিয়ন। পুনঃ ১৯৫১ খৃঃ গণনায় (যাহা পক্ষপাতশূন্য বলে দাবী করা হয়) লোকসংখ্যা ৪২.১ মিলিয়ন নির্ধারিত হয়েছে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ১৯৪১ খৃঃ গণনার ৪২.৩—৩৮.৬ =৩.৭ মিলিয়ন মিথ্যা গণনা হয়েছে[১]। এই থেকে আমরা এই সংবাদ পাই যে পূর্ববঙ্গে ১৯৪১ খৃঃ লোকগণনায় প্রায় ৪ মিলিয়ন মিথ্যা লোকগণনা করা হয়েছিল!

১। Quoted in Census of India, 1951 : Vol. VI ; pt. 4A. Report pp. 263-364.

এস্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে ১৯২১ খৃঃ গণনায় 'পটুয়া' প্রভৃতি যেসব জাতিকে হিন্দু-তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল ১৯৩১ খৃঃ গণনায় তাদেরকে মুসলমান তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এরূপ অনেক জাতি যাহারা হিন্দু সমাজের ছত্রছায়ায় বাস করে তাদেরকে 'অহিন্দু' এবং কৌমগত (tribal) বলে গণ্য করা হয়।

আদম সুমারীর তারিখ		হিন্দু	মুসলমান
১৯২১ খৃঃ		২০,৮০৯,১৪৮	২৫,৪৮৬,১২৪
১৯৩১ ,,		২২,২১২,০৬৭	২৭,৮১০,১০০
১৯৪১ ,,	পুরুষ	১২,২৪৪,৬৩৬	১৮,০২৮,৯৭৯
	স্ত্রীলোক	১২,৮১৪,৩৮৮	২৫,৯২৬,৪৫৫
		২৫,০৫৯,০২৪	৩২,৯৫৫,৪৩৪

(Statistical Abstract : Govt. of West Begal)

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক কারণবশতঃ বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা কম করে প্রদর্শন করা হয়েছে। আবার উচ্চ জাতিসমূহকে দুর্বল করবার জন্য হিন্দুর মধ্যে জাতি-হিন্দু এবং তপশীলভুক্ত প্রভেদ ও পার্থক্য আনয়ন করা হয়। এই বিভাগ স্মৃতিগত দ্বিজ, সৎশূদ্র, অসৎশূদ্র এবং অন্ত্যজ পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় বিভাগ।

পুনঃ ভারতে '৫১ খৃঃ লোক গণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২১,৮৩৭,২৯৫; কিন্তু '৩১ খৃঃ-এর সংখ্যা ১৭,৬৬২, ৪২৭ এবং '৫১ সালের লোকসংখ্যার ২৪,৮১০,৩০৮ মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্টরূপে অগ্রহণীয় যে ইহার জন্য অনুসন্ধান প্রয়োজন। অনুসন্ধানের ফলে রিপোর্টে দেখা যায় যে এস্থলেও ৫% অর্থাৎ ১·৭ মিলিয়ন[১] মিথ্যা গণনা প্রদান করা হয়েছিল[২]।

তৎপর কথা উঠে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক কিনা? এ বিষয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকারেরা পুনঃ পুনঃ বলেছেন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক নয়[৩]। ১৯৫১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্টেও ভারত তথা বঙ্গ প্রদেশ এই তথ্যের পুনরুক্তি করেছে।

১। Quoted in Census of India, 1951 : Vol. VI ; pt. 4A Report p. 367.

২। ঐ পৃঃ ৩৬৪।

৩। B. N. Datta—Dialectics of Land Economics of India.

এই রিপোর্টে জনৈক ইংরেজের গণনা উদ্ধৃত করে[১] দেখিয়েছে যে ১৮৭১—১৯৪১ খৃঃ পর্যন্ত ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমগ্র জগতের এই ১৮৮০—১৯৪০ খৃঃ সময়ের বৃদ্ধির হার (০'৬৯২) অপেক্ষা কম (০'৬০২%) এই সংখ্যা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ অপেক্ষাও কম।

সেন্সাসের তালিকাগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৯২১ সাল থেকে বাঙ্গলায় লোকসংখ্যা বাড়তির পথে। '৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট বলে যে ইহার কারণ ১৯২০ খৃঃ রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে যখন দেশ ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসন পেতে লাগল তখন ম্যালেরিয়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির প্রতিষেধক এবং কৃষি উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়নের ফলে লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণগুলি বিদূরিত হতে লাগল। গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল। নগরের সহিত রেল, বাস প্রভৃতি দ্বারা সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় গ্রামস্থ লোকদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সকল সুব্যবস্থার ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ পূর্বোক্ত মহামারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা লোকক্ষয়। এই রিপোর্ট বলে মিঃ হান্টার এবং ১৮১০ খৃঃ ৫ম রিপোর্ট (Fifth Report of 1882) বলছে যে, ১৭৭০—১৭৭৪ খৃঃ ('৭৬-এর মন্বন্তর) মোট লোকসংখ্যার ৩৫২ এবং কৃষিজীবীদের ৫০% লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়[২]।

আবার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিসাবে লোকক্ষয়ের সংখ্যা ছিল ১০ মিলিয়নের উপর, অর্থাৎ এক কোটিরও বেশী।

ইংরেজশাসন প্রবর্তনের প্রাক্কালে খাস বাঙ্গলার লোকসংখ্যা কত ছিল তাহা সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় নেই। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অফ ওয়েলেস্লীর অনুজ্ঞাবলে ১৮০১ খৃঃ কালেক্টর এবং জজদের দ্বারা যে লোকসংখ্যা ধার্য করা হয়েছিল সেই উভয় গণনার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী প্রাপ্ত হবার পর যে লোকগণনা করে তদ্দ্বারা তিনটি নিম্নবঙ্গ প্রদেশের জনসংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ এক ক্রোড় ধার্য করে, কিন্তু এই সংখ্যা কম বলেই প্রতীত হয়।

১। Kingsley Davis: The Population of India and Pakistan (1951)

২। Quoted in Census of India of 1951, Vol. VI. Pt. I, A. p. 375.

১৭৮৬-৮৭ খৃঃ সার উইলিয়ম্ জেমৃস্ মনে করেন যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং বারাণসীর (তৎকালীন বাঙ্গালা প্রদেশে) লোকসংখ্যা ছিল ২৪ মিলিয়ন। আবার কোলব্রুক মলোদয়ের ১৭৯৪ খৃঃ গণনা ৩০ মিলিয়ন[১]। ১৮৭১ খৃঃ থেকে লোকসংখ্যা গণনা দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখি যে পুরাতন সুরে বাঙ্গলা বিহার এবং উড়িষ্যার লোকসমূহ অনেক মহামারী, দুর্ভিক্ষ, নৈসর্গিক এবং অর্থনৈতিক আপত উত্তীর্ণ হয়ে বংশবৃদ্ধি করেছে। এদ্বারা ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুর পুত্র উৎপাদন শক্তির নূন্যতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু '৭৬-এর দুর্ভিক্ষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মহামারীসমূহ দ্বারা পশ্চিম বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করেছে।

পুনঃ ১৯৩১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্টার হিন্দুর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্তরায় বলে মনে করেছেন। বস্তুতঃ সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেন, উচ্চশিক্ষা এবং সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে সমাজের দায়িত্বহীনভাবে বংশবৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে তাহা প্রযোজ্য হতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাঙ্গলার দেওয়ানী গ্রহণ করে সেদিন থেকে এদেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়তে আরম্ভ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭৬) বাঙ্গলায় কুখ্যাত হয়ে রয়েছে। সমগ্র বাঙ্গলার পশ্চিমভাগ অর্থাৎ রঙ্গপুর থেকে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ দেখা দেয়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' পুস্তকের অবতারণা করেন। বাঙ্গলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তারপর ১৮৯৩-৯৪ ও ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে উহা পুনঃ প্রকট হয়। তা'ছাড়া খণ্ড ও বিক্ষিপ্তভাবে মালদহ মেদিনীপুর প্রভৃতি নানাস্থানে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটে। অবশেষে বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের কালে সারা বাঙ্গলায় এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদীদের হিসেবে তখনকার প্রাণহানির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ, আর ইংরেজ সরকারের হিসেবে পনের লক্ষ। লোকে এ দুর্ভিক্ষকে বলে মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ (man-made famine)। এ'ভাবে ইংরেজ রাজত্বে ভারতের একস্থানে কি অপরস্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ লেগেই থাকত।

তা'ছাড়া ছিল মড়করূপী নানাপ্রকারের জ্বর। আজও লোকে কথায় বলে—'ম্যালেরিয়া বাঙ্গলার মৃত্যুদণ্ড'। এসব কারণ থেকে দু'টি তথ্য অবগত

১। Quoted in Census of India of 1951, Vol. VI pt. I, A. p. 198.

হওয়া যায়ঃ (ক) বাঙ্গলার অধিবাসীদের শারীরিক দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক মূল কোথায়? (খ) বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে কিভাবে হ্রাস পেল। সাইর 'মুতাক্ষরিণ' পুস্তকে বর্ণিত বিবরণ এবং হাণ্টারের অনুসন্ধান অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাঙ্গলা ছিল বিপুলভাবে হিন্দু-প্রধান। কিন্তু উপর্যুপরি মড়ক, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যা' প্রধানতঃ পশ্চিমবাঙ্গলায় দেখা দিয়েছিল তাহাই হিন্দুকে হীনবীর্য করে দেয়। ফলে তার জনসংখ্যাও কিছুটা কমে যায়।

অপরদিকে আমরা দেখি, পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের ফলে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে রাইয়তেরা সংঘ (League) ও সমিতি গ'ড়ে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করে[১]। ১৮৭৩ খৃঃ পাবনা জেলায় জমিদারদের বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে রাইয়ত অর্থাৎ কৃষিজীবী প্রজাদের উত্থান ঘটে। এর ফলেই Tenancy Act VIII of 1885 নামক বিল সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

ইংরেজ বাঙ্গলার দেওয়ানী গ্রহণ করার পর খাজনা আদায়ের সময় যেসব অকথ্য অত্যাচার করে তার ফলে উত্তরবঙ্গে রংপুর প্রভৃতি স্থানে ভীষণ প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই ঘটনা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ঘটে। সে সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত অর্থনীতিক কারণে এক আদর্শ নিয়েই বাঙ্গলার কৃষিজীবী প্রজারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করবার প্রয়াস পেয়েছে। নীলকরের বিপক্ষে আন্দোলনের সময়ে নদীয়া, পাবনা, যশোর এবং অন্যান্য স্থানে জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষ কৃষকেরা আন্দোলন চালিয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই গণশ্রেণী নিজেদের একতা উপলব্ধি করতে থাকে। এই একতার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করে সাম্রাজ্য-বাদী সবকার ভীত হয়ে পড়ে! অবশেষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন দিয়ে লোকদের বিচ্ছিন্ন করে!

১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে কুখ্যাত 'ইলবার্ট বিল' পাশ হওয়ার পর ইউরোপীয়দের ভেতর তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হলে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ বিশেষভাবে জেগে উঠে। এই বিলের দ্বারা ভারতীয় দায়রা বিচারকেরা ইউরোপীয়দের বিচার করবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তার ফলে এ বিল ইউরোপীয়দের বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে। তাঁরা কলকাতায় টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে এই বিল একদিকে ইউরোপীয়দের সুবিধা হরণ করছে কিন্তু অপরদিকে দেশীয়দের

১। বাকল্যাণ্ড—ঐ, পৃঃ ৬০১।

তেমন কোন বিশেষ সুবিধেও প্রদান করতে পারছে না ইত্যাদি। এসব মন্তব্যকারীদের মধ্যে অনেক ফিরিঙ্গি, ইহুদী এবং আরমানীয়ও ছিল। এদের মধ্যে আরমানীয় বক্তাটি ভারতবাসীদের হীন কুকুর বলে গালাগালি দেয়। এতদ্বারা উভয় সমাজে প্রবল বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্দীপিত হয়ে উঠে। তৎকালীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এই কলহের জের প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া থেকে পলাতক ইহুদী ও আরমানীয়েরা বহুদিন থেকে ভারতে এসেছে ও আসছে। ভারত তাদের কাছে নিরাপদে বসবাসের স্থান। ইংরেজাধিকারে তারা শ্বেতকায় জাতি বলে পরিগণিত হয়ে ইউরোপীয়জাত নাগরিকদের সুবিধা ভোগ করিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে ভারতের পরাধীনতার সুবিধা গ্রহণ ক'রে তারা ফণা তুলে ভারতবাসীকে দংশনে উদ্যত হয়ে ভারতে আশ্রয় লাভের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। হায় রে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে ভারতের পরাধীনতার কালে ভারতীয়েরা বিদেশীয় ধর্ম গ্রহণ করে 'বিদেশী' বলে পরিচয় প্রদান করে। বৈদেশিক শাসনের সুবিধে গ্রহণ করে এশিয়াজাত 'পরগাছা' দল নিজেদের শ্বেতকায় অ-ভারত-বাসী বলে। এ'ভাবেই এক হাজার বছর ভারতে স্থায়ী ভারতীয় রক্ত ও কৃষ্টির সহিত বিজড়িত ইরাণ থেকে পলাতক পার্শী এতদিন শ্বেতকায় অ-ভারতীয় এবং ইরানী বলে গর্ব অনুভব করত!

এই বিষ উদ্গীরণের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ভারতীয়দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তৎকালের একজন বিখ্যাত বাগ্মী ৺লালমোহন ঘোষ ঢাকায় টাউন হলের এক বক্তৃতায় পূর্বোক্ত বক্তৃতার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, ইংরেজজাতি ভারতে কি এতই দুর্বল বা অসহায় বোধ করে যে সুদূর আরমেনীয়া হতে লোক ভাড়া করে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়? তিনি আরও বলেন যে সিংহ-চর্মাবৃত গর্ধভ হীন কুকুরের লাথি খাবার যোগ্য (A jack ass in lion's hide is fit to be kicked by acur!)। এ সব বক্তৃতা থেকে আমরা এ আলোড়নের জাতিগত উষ্ণতা বুঝিতে পারি।

অবশেষে সরকার একটা মধ্যস্থ মীমাংসায় উপনীত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজের কাছে বিচারকালে একজন ইউরোপজাত ব্রিটিশ-প্রজা জুরীর বিচার প্রার্থনা করতে পারবে বলে স্থির হয়। এবং তখন থেকে দেশী ও ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসন জজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। আরও স্থির হল, ফৌজদারী আইনের ৪৪৬ ধারানুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাসের জেল দেওয়া ও ২০০০ টাকা জরিমানা বা উভয়

প্রকারের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এই জুরীর অর্দ্ধ সংখ্যা ইউরোপীয় বা আমেরিকান বা উভয়ের দ্বারা গঠন করতে হবে। এই সংশোধন বিল ১৮৮৪ খৃঃ Act III রূপে গৃহীত হয়।[১]

তৎকালে আরেকটি সমাজের উন্নতি-বিধায়ক কাজ সরকার করেছিল—সেটা হল ১৮৮৩ খৃঃ ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার্থ কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকারের অনুমোদন প্রদান। ইতিপূর্বে মহিলাদের মেডিকেল কলেজে প্রবেশ অনুমোদিত ছিল না। তজ্জন্য কতিপয় বাঙ্গালী মহিলাকে অধিকতর উদার মনোভাবসম্পন্ন মাদ্রাজ প্রদেশে শিক্ষার্থ যেতে হয়েছিল—এ'জন্য উক্ত প্রবেশাধিকার আন্দোলনকারীদের সাহায্য প্রদান করে তখনকার লেফটেনান্ট গভর্ণর টম্পসন মেডিকেল কাউন্সিলের অভিমত খণ্ডন করে মেয়েদের প্রবেশাধিকার প্রবর্তন করেন।[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে দু'টি আন্দোলন বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছে সে দু'টো হচ্ছে—ওয়াহাবী আন্দোলন আর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথম ২৪ পরগণা জেলায় উত্থিত হয়। এ আন্দোলন গোঁড়া মুসলমান ধর্ম প্রচার করত। এদের উদ্দেশ্য মুসলমান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও অপরোক্ষভাবে সে আন্দোলন হিন্দুর বিপক্ষেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এর নেতা ছিলেন তীতুমীর। অবশেষে সসস্ত্র ইংরেজ পুলিশবাহিনী তীতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' ভেঙ্গে দিয়ে বিদ্রোহ দমন করে।

কিন্তু এ-মত গুপ্তভাবে চলতে থাকে। কুমারখালির ফরাজীরা এর রূপান্তর। পরে এ'সম্প্রদায় মধ্য-বাঙ্গলায় গুপ্তভাবে প্রচারিত হয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অভিযানের জন্য চেষ্টিত হয়। যশোর জেলা এদের একটি ঘাঁটি ছিল। বাঙ্গলার এ-দলের সঙ্গে পাঞ্জাবের এবং পাটনার ষড়যন্ত্রকারীদের সংযোগ ছিল। অবশেষে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং আম্বালার ৫ জন, পাটনার ৫ জন এবং কুমারখালিব একজন বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হয়।[৩]

তৎপর বিংশ শতাব্দীতে সরকার কর্তৃক 'গৌড়বিল' গৃহীত হওয়ার ফলে হিন্দুসমাজে থেকেও অসবর্ণ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ বলে অনুমোদন লাভ করে। তার ফলে অসবর্ণ বিবাহের সন্ততিদের আর সমাজের

১। Buckland—Vol. II pp. 768-789.

২। Ibid—pp. 795-96

৩। ঐ—পৃঃ ৩১৮।

বাইরে নিক্ষিপ্ত বা বিষয়াদি থেকে আত্মীয়দের দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার উপায় রইল না এবং তাদের সন্তানগণ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের অপবাদ মুক্ত হয়ে সমাজে গ্রাহ্য হয়ে উঠে। আবার "সারদা আইন" দ্বারা বাল্য-বিবাহও রদ করা হয়। যৌবন প্রাপ্ত হবার পূর্বে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সন্ততিদের পক্ষেও অমঙ্গলকর বলে অনেকদিন থেকে সমাজ-সংস্কারকেরা আন্দোলন করে আসছিল, কিন্তু "সিভিল ম্যারেজ আইন" মধ্যে অসবর্ণ ও প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ গৃহীত হলেও এটা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রয়োগ করা যেত না। অবশেষে এই আইন জাতি ধর্ম প্রদেশ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য হয়।

পূর্বে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে পুন-র্বিবাহ (কৌটিল্য, নারদ, পরাশর, কাত্যায়ণ এবং দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য), যৌবন আগত হলে বিবাহ (দ্রৌপদী, দময়ন্তী, কুন্তী প্রভৃতি মহাভারতের নারীরা) হ'ত। বাল্য-বিবাহ যে ছিল না তা নয়। সংস্কৃত পুস্তকগুলোতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্ত্রীলোক যখন পণ্য বিশেষ, তখন তার পিতা তাকে যখন ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন, দান করতে পারেন, বিক্রয় করতে পারেন, (ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল)। মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত ইউরোপেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে শরীর শীঘ্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এজন্য এদেশে বালিকা বিবাহের এত আধিক্য। তদুপরি ভারতীয়েরা পুনঃ পুনঃ তুর্কী আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। তুর্কীরা ভারতীয়দের কন্যা লুণ্ঠন বা অপহরণ করত (বাঙ্গলার পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং হিন্দীতে কবিতাসমূহ দ্রষ্টব্য)। গ্রামে গ্রামে তুরুক সওয়ার এজন্য ঘুরত। তখন ভারতীয় হিন্দুরা বাধ্য হয়েই স্ত্রীলোকদের গৃহ মধ্যে অবরোধ করে রাখতে লাগল, বাল্য-বিবাহ দিয়ে তাদের অধিকারী নিযুক্ত করতে থাকল, আর বিবাহিত স্ত্রীলোকের মুখে উল্কির ছাপ দিয়ে কুশ্রী করে রাখতে লাগল। পাঞ্জাবে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের বহুপূর্বে 'মাঙ্গনি' অর্থাৎ বাগদত্তা প্রথা এই উদ্দেশ্যেই প্রচলিত হয়।

আফগানিস্থানের হিন্দুদের এ'বিষয়ে কথা শুনলেই বোঝা যায় কেন বাগ-দত্তা ও বাল্য বিবাহের এত প্রচলন হিন্দুদের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু অর্থনীতিক কারণবশতঃ বর্তমানে বিবাহের বয়সের সীমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে পূর্বেকার মত বাল্য বিবাহের প্রথা অন্তর্হিত হয়েছে। আজকালকার তরুণ-তরুণীর কাছে এ প্রথা প্রায় অজ্ঞাত ও ধারণার বহির্ভূত।

অথচ পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্যই উত্তর ভারতে কড়া অবগুণ্ঠন ও পর্দা প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু নেপালে, আসামে এবং দক্ষিণ ভারতে এ প্রথা অপ্রচলিত।

এইসব কারণের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের জন্য এবং অর্থনৈতিক কারণের ফলে সমাজ বিংশ শতাব্দীতে এক নূতন অভিব্যক্তির স্তরে উপনীত হয়। এ সময় সরকার কর্তৃক ফৌজদারী আইন বিল গৃহীত হয়। এতদ্বারা মুসলমান আইন রদ করে সবাইকে এক আইনের অধীনে আনয়ন করা হয়। ইহা এক-জাতীয়তাবাদী কাজে সহায়ক হয়। ১৮৪১ খৃঃ আইনের ফলে কাজে লাগান হয়।

ইংরেজ শাসনকালে একটি বুর্জুয়া অর্থাৎ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিব্যক্তি হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আপ্লুত লোকের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে এক বিশিষ্ট জাগরণ মাথা চারা দিয়ে উঠে। রাজা রামমোহন রায় একদিকে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলনকল্পে 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন, সতীদাহ প্রথা রদ করার চেষ্টা করেন এবং জাতীয় জীবনের নানাদিকে সংস্কার করার জন্য চেষ্টা করেন[১] সেরূপ তিনি ফরাসী বিপ্লবের দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই সূত্র ধরে তার প্রশিষ্যগণ 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী' মন্ত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ সংস্কারকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করেন। জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রচলন ও বিধবা-বিবাহের নিষিদ্ধকরণ, কালাপানি পার হওয়া মানা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, হাঁচি-টিকটিকির বাধা আর স্পর্শদোষ প্রভৃতি হিন্দুজীবনের যে-সকল নিত্য নৈমিত্তিক বাধাসমূহ হিন্দু-জীবনকে শৃঙ্খলিত ও ভারাক্রান্ত করে হিন্দু-সমাজকে স্থানুবৎ করে রেখেছিল সেগুলোকে উঠিয়ে দেবার জন্য শিক্ষিতেরা তৎপর হয়ে উঠল। এ বিষয়ে মাহাত্মা ডিরোজিয়ের ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাদের 'নব্য-বাঙ্গলা' বলে অভিহিত করা হত, কারণ তারাই নূতন জাগ্রত ও অগ্রগমনশীল বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। এ সময় সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি কর্ম সর্বসমেত লোক দ্বারা সমর্থিত হয় এবং বাঙ্গালী জীবনে একটা নূতন স্পন্দন অনুভূত হতে আরম্ভ করে।

পুরাতন ভারতীয় মনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় নূতন বীজ বপন হওয়ার কালে নূতন বাঙ্গলা তথা নূতন ভারত বিবর্তিত হতে আরম্ভ করে।

১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রামমোহন রায়ের জীবনী।

রামমোহনের দ্বারা সমর্থিত এবং মেকলে কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন ভাবের শিক্ষা প্রণালী সময়ে তার সুফল প্রসব করে। অতঃপর কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয় হয়। তিনি ধর্মসংস্কারকল্পে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশবচন্দ্র ধর্মসংস্কারের সংগে সমাজ-সংস্কার, পান দোষ নিবারণ, ধূমপান নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি সংস্কারমূলক কর্মপন্থা যোজনা করেন। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিক লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত 'আত্মীয় সভা' তৈরী করে তার তরুণ সভ্যদের বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন ও যুক্তিবাদী করে তোলেন। কেশবচন্দ্রের তরুণদল জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের দাবী গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কালে দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি মতবাদের বিশেষভাবে প্রসার লাভ করায় তারা সেই কষ্টী-পাথরে ভারতের সব অনুষ্ঠানই যাচাই করতে চাইতেন। এ'জন্য তারা স্বীয় সমাজের অধোগতি দেখে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে জাতিকে উপেক্ষালিত করে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ করতে চাইতেন। এদের ভেতর কেশবচন্দ্র সেন সমাজ-সংস্কাররূপ মতবাদের বিভিন্নতাহেতু মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সমাজ থেকে ১৮৬৬ খৃঃ পৃথক হয়ে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন এবং যুগপৎ ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে মন দিতে চাইলেন। কিন্তু এখানেই সমাজসংস্কারের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ বাঁধে। ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার চাইতেন, কিন্তু তারা সনাতনী সমাজ থেকে বিছিন্ন হন নাই।

এই বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেছেনঃ "ব্রাহ্মসমাজে যখন এইরূপে ভাঙ্গাভাঙ্গি ও ভাগাভাগি হইতেছিল তখন ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংস্কারকার্যে ব্রাহ্মেরা দেশের রাজপুরুষদিগের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল।......ইংরাজ রাজপুরুষগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের এই সংস্কারব্রতের প্রশংসা করতেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যখন কেবল ধর্ম ও সমাজসংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের

একনায়কত্বের প্রতিবাদীগণ অনেকেই একটা সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ সেকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও নায়কত্ব করেন।...” সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে নূতন স্বাধীনতার আদর্শ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল[১]।”

এখানে ব্রাহ্মসমাজের ভাঙ্গাভাঙ্গির ইতিহাস অনুসরণ না করে যদি তার গঠনের ফলে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (যা পরবর্তীকালে “নববিধান ব্রাহ্মসমাজ” নাম গ্রহণ করেছিল) এবং কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদীগণের পূর্ব-সৃষ্ট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এই উভয়দলই সমাজসংস্কার কার্যে ব্রতী হওয়ায় অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম ভেঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ, বাল্য-বিবাহ রদ, প্রভৃতি প্রচেষ্টার ফলে সনাতনীয় হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাদের বিবাহ ক্রিয়া সরকারের ‘সিভিল ম্যারেজ’ আইনের দ্বারা সম্পাদিত হতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সংস্কারকেরা স্ত্রী ও পুরুষের সকল বিষয়ে সমানাধিকারের দাবী তুলেন নি!

ধর্মসংস্কার কর্মে সনাতন সমাজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা ভেঙ্গে সংস্কারকদের মতগুলো নিজের জীবনে সমূর্ত করতে গেলে মূল সমাজ থেকে বিছিন্ন হয়ে পডতে হয়। ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সমাজে পরিণত হল। যারা সমগ্র দেশকে উন্নত করবেন বলে সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা কার্যত একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়ে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র গণ্ডীভূক্ত করে নিলেন।

সমাজবিজ্ঞান বলে, যখন দুইটি লোক সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক আহার এবং বিবাহ বন্ধ হয় তখন দুইটি লোকসমষ্টিই পৃথক জাতিরূপে পরিণত হয়। তজ্জন্য এই বিশাল ভারত মধ্যে অজস্র ধর্মসম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মেরা একটা পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য হতে লাগলেন। ক্রমশঃ একদল নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেন[২]। এক্ষণে আবার তাঁরা বলেন যে তাদের কৃষ্টিও নাকি পৃথক! তাঁরা এক্ষণে দুই-জাতি তত্ত্বের খপ্পরে পড়েছেন।

১। বিপিনচন্দ্র পাল—নব যুগের বাঙ্গলা: পৃঃ ১১৭-১১৮ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।
২। ১৯১১ সাল ও তৎপরবর্তী সেন্সাস রিপোর্ট।

কিন্তু হিন্দুসমাজে এবম্বিধ অনুষ্ঠান আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, আবাহমান কাল থেকে এই প্রকার ধারা চলে আসছে। যখনই কোন নূতন ধর্ম-আন্দোলন উত্থিত হয়েছে তখনই একদল সমাজের বাইরে গেছে, আর একদল বর্ণাশ্রম ধর্মের ভেতরেই রয়ে গেছে। পুরাকাল থেকে বৌদ্ধ, জৈন এবং মধ্যযুগের সন্ত আন্দোলন উদ্ভূত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকগুলা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও শিখ সম্প্রদায়ের ভেতর এই প্রকারের দুটো শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে। একদল বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অমান্য করেছে, অন্যদল বর্ণাশ্রমের ভেতরেই রয়েছে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের পূর্বে বাঙ্গলায় চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটে। তাদের মধ্যে যারা চৈতন্য অনুগত তারা বর্ণাশ্রমীয় সাধারণ সমাজেই আছেন। আর যারা চৈতন্য ভক্ত তাঁরা জাতিভেদ তুলে দিয়ে জাতবৈষ্ণব জাতির সৃষ্টি করেছে। জাত বৈষ্ণবদের ভেতরে সনাতনী ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় কোন প্রথাই প্রচলিত নেই। তাদের ভেতরে পুনর্বিবাহ ও তালাক-প্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রকারে যেসব ব্রাহ্ম সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁরাই জাতব্রাহ্ম আছেন, আর অপরদিকে যাঁরা স্বীয় বাহ্য-জীবনে ধর্মাশ্রম মেনে চলেন তাঁরা সনাতন সমাজের অন্তর্গত হয়ে আছেন। অবশ্য এদের সংখ্যা এখানে খুবই কম।

ইতিমধ্যে আর্যসমাজ বাঙ্গলায় প্রচার কার্য আরম্ভ করে। শিক্ষিতদের ভেতরে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি বটে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তথাকথিত অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্যদের মধ্যে তারা অনেক পরিমাণে সফলকাম হয়েছেন। তারা এ'সব দীক্ষিতদের নূতন সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে তাদের উত্তোলন সম্ভাবিত করছেন। উপস্থিত এরা সমাজ সংস্কারক এবং ধর্মসংস্কারকের কাজ করছেন। অনেকে বর্ণাশ্রম প্রথা ভাঙ্গছেন বটে, কিন্তু তারা এখনও পৃথক জাতি সৃষ্টি করেন নি।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ঢেউ ক্রমে রাজনীতিতে এসে উপস্থিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে রাজনীতিক আন্দোলনের আবির্ভাব হল। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন—"সমাজ ও ধর্মসংস্কারের যুগের পরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের আবির্ভাব হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কাব্যে, নাট্যে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, সাহিত্যের সকল বিভাগে এই নূতন স্বাধীনতার ভাবটা মুখরিত হইয়া উঠে।" এখানে দেখা দরকার যে বুর্জোয়া-শ্রেণী একদিকে যেমন ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে উঠতে থাকে তেমনি তাদের ভেতর শ্রেণী

চৈতন্যও বিকশিত হ'তে আরম্ভ করে। ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বিবর্তিত বলে প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণী এই শাসনকে "ভগবানের বিধান" (Divine Dispensation) বলে ধরে নেয়। পরে ইংরেজকে তাদের ক্রমোন্নতির পথে অন্তরায় দেখতে পেয়ে এবং তার সঙ্গে অর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব সমুপস্থিত হওয়ায় বুর্জোয়া ও ইংরেজ—এই দু'য়ে ভাব-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

এই সংঘর্ষ ও তৎপ্রসূত দেশভক্তির ক্রমোদ্বোধন ক্রমশঃ বিশালাকার ধারণ ক'রে নানাভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৪৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উপর জয়ী হয়। ইংরেজ সরকার ভারতকে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান—এই দুটি অঞ্চলে ভাগ করে এদেশ ত্যাগ করে। এর ফলে বেশীরভাগ প্রাচীন ভারতের সীমা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীতে বৈদেশিক মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা বিজিত হবার পর ধর্ম পরিবর্তনের ফলে বর্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান যেমন ধর্মীয় বিভিন্নতার জন্য মূল ভারত ভূখণ্ড হতে বিছিন্ন হয়ে ভিন্ন দেশরূপে পরিগণিত হয়, ঠিক তেমনি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো ভারত থেকে পৃথক হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু ভারত নানা জাতি ও ধর্ম সমন্বিত রাষ্ট্র গঠন করে। বিভক্তিকরণের দু' বছর পরে ভারতীয় গণপরিষদ একটা শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Constitution) রচনা ক'রে ভারতকে স্বাধীন সংযুক্ত গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছেড়েছে বটে, কিন্তু তারা একটা বিরাট সামাজিক সমস্যা রেখে গিয়েছে। অনেকদিন যাবৎ ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাসের ফলে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মিশ্রণে একটা মিশ্র জাতির বিবর্তন হয়েছে। এই বর্ণ-সঙ্করেরা মুসলমান সমাজে জীর্নিভূত হ'তে পারে, কিন্তু পূর্বের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের যেন আর সে শক্তি নেই যার দ্বারা মধ্যযুগের হিন্দুরাজত্বকালে শক, যবন, হুণ প্রভৃতি আর্যসমাজে মিশে গিয়েছিল।

এই মিশ্রিত জাতি পুনঃ 'অনন্তর', 'দ্বান্তর', 'এ অন্তর' প্রভৃতি মনুর বিধানের ন্যায় নিজেদের ভেতর ১৪ আনা, ১২ আনা, ৮ আনা, ইউরোপীয় রক্তের লোক বলে অভিহিত হয়। অবশ্য আমেরিকার শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের মধ্যে মিশ্রিতদের Octoroon (আটভাগের একভাগ কৃষ্ণকায়) Quadroon (তিনভাগ শ্বেতকায়) মুলাটো (অর্ধেক শ্বেতকায়) প্রভৃতির

ন্যায় পৃথক পৃথক সমাজ বা জাতি সৃষ্টি করেনি। ভারতীয় বর্ণসঙ্করেরা আগে East Indian, পরে Eurasian এবং শেষে Anglo-Indian নাম গ্রহণ করে।

এই হল ইউরোপীয় পিতা ও ভারতীয় মাতাজাত বর্ণসঙ্করের অবস্থা এবং এই সমাজে দেশজ খৃষ্টান নাম পরিবর্তন করে ঢুকেছে। ভারতীয় পিতা ও ইউরোপীয় মাতাজাত সন্তানও এই সমাজে স্থান পায়। আবার আমেরিকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা যুক্তরাষ্ট্র হতে আগত মিশ্রিত রক্তের ঔপনিবেসিক-গণ, এশিয়াজাত ইহুদী, আরমানী প্রভৃতিও এ সমাজে ঢুকে 'অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান' বলে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে।

এই বৃহৎ মিশ্রিত সমাজকে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুযায়ী মনু-স্মৃতির ভাষায় 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম'-জাত লোকের ন্যায় ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছিল। যে বর্ণসঙ্করের ইউরেশীয় পিতা, সে ইউরেশীয় (Eurasian) বা বর্তমানের 'অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান' বলে গণ্য হত। পিতার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের পুণ্য হেতু সে ভলাণ্টিয়ার কোর-এ ভর্তি হতে পারত, ইউরোপীয় পল্টনের অফিসার হতে পারত, বিনা লাইসেন্সে ঘরে অস্ত্র রাখতে পারত, রেল প্রতিষ্ঠানে গার্ডের কাজ এদের একচেটিয়া ছিল, পুলিশের বড় কর্মচারী বা সার্জেন্টের কাজে নির্বিবাদে ঢুকতে পারত। শাসকজাতির ঔরসজাত সন্তান বলে ভারতবাসী অপেক্ষা তাদের অনেক রাজনীতিক সুবিধা ছিল। অতএব সে অনুলোমজাত জাতি। কিন্তু যার পিতা ভারতীয় এবং মাতা ইউরোপীয় মহিলা, আইনের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ভারতীয়দের ন্যায়ই ছিল। অর্থাৎ তাকে রাষ্ট্রে প্রতিলোমজাত লোকের অসুবিধা ভোগ করতে হত।

এই বর্ণসঙ্করেরা ধর্ম ও ভাষা দ্বারা নিজেদের ভারতীয়দের থেকে পৃথকী-করণ করত। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে কি বিবর্তন হ'বে তা' ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বনীতির গর্ভে নিহিত। স্বাধান রাষ্ট্র আইন দ্বারা সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির ভেতরে বিবাহের সুবিধে করে দিয়েছে। সকলে যখন এক কৃষ্টির অধীনে আসবে তখন পার্থক্যও দূরীভূত হয়ে যাবে।

এই মহামানবের সাগর তীরে এরাও ভবিষ্যতের সম্মিলন বা সমন্বয়ের মাঝে নিজেদের একাঙ্গীভূত করতে বাধ্য হবে।

॥ গণ-বিদ্রোহ ॥

পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন পরে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা হয় এবং নিরীহ বাঙ্গালী নীরবে বশ্যতা স্বীকার করে—ইহা সাধারণ

বিশ্বাস। এই ভুল ধারণা ক্রমশঃ ভাঙ্‌ছে। ভারত স্বাধীনরাষ্ট্ররূপে বিবর্তিত হওয়ার পর অনেক নূতন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য নিরঙ্কুশ-ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

আমরা জানি মীরকাসেম বঙ্গের কতকগুলি জেলার (যথা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান) দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদান করেন। পরে সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত করেন। কোম্পানী নূতনভাবে শাসন-বিভাগ সংগঠিত করতে থাকেন। 'সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট' সেই নূতন সংগঠনের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এতেই আমরা যেন মনে না করি যে বাঙ্গলা অতি নির্বিঘ্নে আমলকবৎ ইংরেজের করতলগত হয়েছিল।

এই নূতন বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে বাঙ্গলার অনেক অর্ধ-স্বাধীন ভূ-স্বামীদের ক্ষমতা খর্ব হয়। তাদের করদ-জমিদারে পরিণত করা হয়। প্রথমে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের ভূঁইঞারাজদ্বয়কে ভুলক্রমে সাধারণ জমিদারের ন্যায় ভেবে তাদের রাজ্য নিলামে চড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অতঃপর এ'সব অর্ধ-স্বাধীন ভূস্বামীদের পাইক ঘাটোয়ালদের (militia) এই অজুহাত দেখিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয় যে কোম্পানী নিজেই শান্তিরক্ষা করবে। অতএব জমিদারদের পৃথকভাবে সৈন্য রাখার প্রয়োজন নেই। এই পাইকেরা নিষ্কর ভূমি ভোগ করত এবং দরকার পড়লে জমিদারদের কার্য করত। পশ্চিমবঙ্গের তখন ঘোর অশান্ত জীবন মেদিনীপুরের জঙ্গল মহালগুলিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এ'স্থানের জমিদারেরা নিজেদের 'স্বাধীন রাজা' বলে ঘোষণা করতেন। তাঁদের পাইক ও স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, যাঁদের ইংরেজরা 'চোয়াড়'[১] নামে অভিহিত করেছে, স্বীয় রাজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি ভোগ করত এবং প্রয়োজনের সময় রাজার হয়ে লড়ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-দক্ষিণাংশের লোকেরা অশান্ত জীবনই কাটিয়েছে। মেদিনীপুরের জেলা-শাসক মিঃ প্রাইস্ তাঁহার পুস্তকাদিতে যে-চিত্র এঁকেছেন[২] তা' পাঠ করলে আজকালকার বাঙ্গালী মাত্রই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাববেন এ কি বাঙ্গলা দেশ? এরাই কি ইংরেজ কিংবদন্তীর বাঙ্গালী? বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও মেদিনীপুরে রাজাদের পরস্পরের ভিতর ঝগড়া, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লেগেই ছিল (এ'সব ব্যাপারে জনৈক ইংরেজ

১। Chuar Rebellion.

২। Price—Report on the Administration of Midnapore District (1880).

কাপ্তেনের মুণ্ড উড়ে যায়)। এ'সব জমিদারগণ প্রায়ই স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করত। অনেকেই কৌশলে মুঘল সরকারকে দেয় খাজনা ফাঁকি দিত। তাদের ভীষণ দুর্দান্ত লাঠিয়ালেরা মুঘল সরকারে প্রেরিত খাজনা রাস্তায় রাহাজানী করে কেড়ে নিয়ে নিজ জমিদারদের ফিরিয়ে দিত[১]।

ইতিপূর্বেই উক্ত হয়েছে যে ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী পেয়ে এ'সব রাজাদের খাজনা প্রদানকারী বা করদ জমিদারে পরিণত করে। পশ্চিম-বঙ্গের গৌরব মল্লভূমির অর্ধ-স্বাধীন ভূঁইয়া রাজার রাজত্ব খাজনার দায়ে নিলামে চড়লে বর্দ্ধমানের ঠিকাদার খাজনা আদায়কারী জমিদার তাহা কিনে নেয়। এ প্রকারে বীরভূমের মুসলমান রাজ নিঃস্ব হয়ে গেল। হান্টার মহোদয় ইংরেজ কোম্পানীর এ ভুলের বিষয়ে বিশেষ অনুযোগ করেছেন।

এর পরেই আসে মেদিনীপুরের পালা। জঙ্গলমহলের অনেক রাজাদের ভূমি এবং তাদের পাইকদের নিষ্কর ভূমিও কেড়ে নেওয়া হল। ফলে উপস্থিত হল 'পাইক বিদ্রোহ'। সর্বস্বান্ত রাজাদের সঙ্গে তাঁদের একান্ত অনুগত পাইকগণ এবং 'অন্ত্যজ' জাতীয় প্রজারা মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। এই বিদ্রোহ জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুর পরগণাতেই কেন্দ্র স্থাপন করে। ক্রমে ইহা মেদিনীপুর জিলার পূর্বদিকস্থ জগৎবল্লভপুর, দক্ষিণে নারায়ণগড়, পশ্চিমে রায়পুর (পূর্বে পুরুলিয়ার অন্তর্গত একটি পরগণা, বর্তমানে ইহা বাঁকুড়ার মধ্যে), মানভূমের পঞ্চকোট ও কাশীপুর পর্যন্ত পাইকদের বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়। ইহারা বীরভূমেও অভিযান ক'রে রাজার জমিদারী এবং হুগলী জেলার ব্রাহ্মণ্যভূমিও দখল করে।

এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি। নাড়াজোলের রাজবংশীয় চূণীলাল খাঁও এই বিদ্রোহের সহিত যুক্ত ছিলেন। রায়পুরের রাজা দুর্জন সিংহ ও তাঁর পাইকরা ইংরেজ তরফের জমিদারের নায়েব কিনু বক্সীকে যুদ্ধে মেরে ফেলে। যুদ্ধে দুর্জন সিংহ বন্দী হন। কিন্তু তাঁর পাইকেরা পরে পুনঃ তাঁকে মুক্ত করেন। বাগ্দীজাতীয় গোবর্ধন বাগপতি সেনাপতিত্ব করেন এবং চন্দ্রকোণাতে (তখন ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংরেজ যেসব দেশীয় সিপাহী বিদ্রোহীদের বিপক্ষে পাঠাত তারা রাইতদের লুণ্ঠন করত। এস্থলে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেশবাসীদের যোগাযোগ

১। ১৯০৫—৬ খৃঃ নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ মহাশয় লেখক এবং তার বন্ধুদের কাছে এই গল্প বলেছিলেন যে এ'রকম লাঠিয়াল তাঁর এখনও একজন আছে।

থাকত। ইংরেজ দখলীকৃত এলাকার লোকেরা সব সংবাদ বিদ্রোহীদের পাঠাত। মেদিনীপুর জেলায় বিদ্রোহীদের তিনটি বড় ঘাঁটি ছিল। বাহাদুরপুর, শালবনি ও কর্নগড়। ইংরেজ কালেক্টরের রিপোর্ট এই যে, নাড়াজোল হতে বলদ-বাহিত চার গাড়ী অস্ত্র, বারুদ ও গোলা রাণীর কেল্লায় প্রেরিত হয়।

এই বিদ্রোহী পাইকেরা স্বীয় নেতাদের প্রতি কত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল তাহা বক্ষ্যমান দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয়। আনন্দপুর পাইকদের দ্বারা দখলীকৃত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মোহনলাল নামীয় এক অশ্বারোহী সর্দার এসে তথায় উপস্থিত হয় এবং লুণ্ঠন কার্য বন্ধ রাখবার হুকুম দেন। ইংরেজ লেখক বলেছেন ঃ নৈষ্ঠিকভাবেই হুকুম পালিত হয়। মোহনলাল তৎপর তার পতাকা সেই নগরে উড্ডীন করেন এবং অধিবাসীদের তাদের পরিবার-বর্গকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার আজ্ঞা প্রদান ক'রে বলেন যে যদি তাঁরা তাঁকে মানেন তা'হলে কেহ তাঁদের গায়ে হাত দেবে না। কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করলে অবশিষ্ট অধিবাসীদের তরবারীর মুখে প্রাণ বিনষ্ট এবং নগরও ভস্মীভূত করা হবে।

১৭৯৯ খৃঃ বিদ্রোহ চরমে উঠে। ইংরেজ কর্মচারীদের অনুমান যে, রাণীর জমিদারী এবং পাইকদের পাইকান ভূমি যাওয়ায় এরা ভেবেছিল যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করে নষ্ট-সম্পত্তি পুনরায় দখল করে নেবে। জঙ্গল-মহলের "আদিবাসী"-জাতীয় লোকসমূহও পাইকদের সঙ্গে যোগদান করে। সকল পাইকেরাই ইংরেজ কোম্পানীকে শান্তি স্থাপনে সহায়তা প্রদান না করে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের সঙ্গেই যোগদান করেছিল।

এ'সময়ে ঘাটশীলার রাজাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর মাটির কেল্লা ইংরেজ দখল করতে পারে নাই। সাধারণতঃ লোকে ভরতপুরের মাটির কেল্লার যুদ্ধের কথাই জানে। কিন্তু বাঙ্গলায় তৎপূর্বেই সেই অভিনয় হয়ে গেছে! ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে। কল্‌কাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ থেকে স্থানীয় লোক নিয়ে সৈন্যদল গঠন করবার জন্য হুকুম যায়। কিন্তু উত্তর আসে যে, স্থানীয় লোকদের সৈনিকের নির্দিষ্ট উচ্চতা নাই, অর্থাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ খর্ব। পুনবায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে হুকুম যায় "কুছ্ পরোয়া নেই ; 'ওখানকার লোকের মধ্য থেকেই সৈন্যদলে লোক সংগ্রহ কর।" অবশেষে কাঁথি ও জলেশ্বর হতে সাতশত লোক সংগ্রহ করে এবং তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে ঘাটশীলার দুর্গ দখল করে

রাজার শিরশ্ছেদ করা হয়[১]। অবশেষে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ স্থানীয় লোকদ্বারা গঠিত সৈন্যদলের সাহায্য নিয়েই বিদ্রোহ দমন করে।

এ বিদ্রোহকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা "চুয়াড় বিদ্রোহ" নাম দিয়ে সত্য তথ্য চাপিবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের ইহা "গণ-বিদ্রোহ"। 'চুয়াড়' নামে কোন জাতি নাই। উক্ত নাম যাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁরা অন্ত্যজ বর্ণ হলেও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী। পূর্বোক্ত পাইকেরাও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী। এদের নেতৃত্ব করেন জনৈক বাগ্‌দীজাতীয় লোক। সর্বোপরি ছিলেন মেদিনীপুরের জমিদার-গৃহিণী, অর্থাৎ কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি। বিক্ষুব্ধ জমিদার ও সর্দারগণ এতে নায়কত্ব করেছিলেন। কাসিয়াড়ার রাজা সুন্দরনারায়ণ ও তাঁর জামাতা ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলবার কার্যে অগ্রণী। স্থানীয় মারাঠা জমিদারেরাও যোগদান করেছিল এই গণ-বিদ্রোহে। ফলে অত্যন্ত ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল[২]। কিন্তু ভারতের গণ-বিদ্রোহে যে-দোষত্রুটি আমরা সিপাহী বিদ্রোহে দেখি তাহা এ'স্থলেও দেখা যায় —যথা কেন্দ্রীভূত কর্মপদ্ধতি ও একনায়কত্বের অভাব। অথচ মহাভারতে দৃষ্ট হয় বৃহস্পতি ও শুক্রনীতি অনুসারে একনায়কত্ব একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জনগণ কালক্রমে তাহা ভুলে গিয়েছে।

যাহা হউক পরিশেষে রক্তপাত দ্বারা বিদ্রোহের দমন করা হয়। রাণী শিরোমণি এবং চূণীলাল খাঁ[৩] বন্দী হয়ে মেদিনীপুরে নীত হন। এঁদের ইহার পরবর্তী অবস্থা বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে মেদিনীপুর অঞ্চলে কিংবদন্তী আছে যে রাণীকে কলকাতার কেল্লায় নিয়ে আসা হয় এবং তথায়ই তিনি গতায়ু হন। কিন্তু চুয়াড়েরা পুনঃ অশান্তি সৃষ্টি করেন। তাঁরা ১৮০৬ খৃঃ বগড়ী পরগণা পর্যন্ত হানা দেয়। তাঁরা স্বাধীনভাবেই কার্য

১। Price—Report on the Administration of the Midnapur District (1880).

২। (a) A. C. Mitra (i) Census 1951. West Bengal (ii) District Hand Book of Midnapur.
(b) Narendranath Das—(i) Paik Rebellion of 1799 p. xxvii
(ii) the Resistance of the Chieftains, p. xvii.

৩। কথিত আছে, ইনি বর্তমান নাড়াজোল রাজবংশের পূর্বপুরুষ।

করত ; আর যারা বিপক্ষীয় ইংরেজদের সংবাদাদি সরবরাহ করত তাদের মেরে ফেলত। অবশ্য পরে ইহাও দমন করা হয়।

এ'স্থলে দুইটি ঘটনা আজকালকার ভীরুতা অপবাদগ্রস্থ বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে : (ক) আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণমেন্টের চিঠি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন যে বাঙ্গালী সিপাহী দ্বারা ঘাটশীলার দুর্গ জয় করা হয়। (খ) ডিসেম্বর ১৭৬৮ খৃঃ এবং নভেম্বর ১৭৭০ খৃঃ ঘাটশালা এবং বরাহভূমের পার্বত্যাঞ্চলে চুয়াড় এবং পাইকেরা বিদ্রোহ করে ; কিন্তু তাঁরা মেদিনীপুরে অভিযান করেন নি। এ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ একটি বড় চালাকীর চাল চালেন ! এ অঞ্চলের সব জোয়ান ব্যক্তিদের কোম্পানীর পল্টনে ভর্তি করে নেয় এবং তৎসঙ্গে তাদের পাইকান জমির স্বত্বও স্বীকার করা হয়। পরে তাদের দক্ষিণে, পশ্চিমে এবং উত্তরে মহারাষ্ট্রীয়দের বিপক্ষে প্রেরণ করা হয়। শতাব্দীর শেষে ইংরেজ কোম্পানী নিজেকে মধ্য ও উত্তর ভারতে দৃঢ়ীভূত করেছে এবং ঘাটশীলার রাজাকে ধ্বংস করেছে। এক্ষণে কোম্পানীর আর পাইকদের প্রয়োজন নেই। তাঁদের সৈন্য-শ্রেণী থেকে বিদায় করে দেওয়া হয় ও তৎসহ প্রদত্ত পাইকান জমিও কেড়ে নেওয়া হয়। এরই ফলে পাইক ও চুয়াড়েরা একত্রিতভাবে বিদ্রোহ করে। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় এপ্রিল ১৭৯৮ খৃঃ[১]।

এই কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রয়োজন হওয়ায় ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালী সিপাহী স্বীয় সৈন্যদলে নিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছে। তখন অ-সামরিক (non-martial) মত গড়ে ওঠেনি। পুনঃ সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বগড়ী পরগণায় 'লায়েক বিদ্রোহ' উপস্থিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'লায়েকালী' হাঙ্গামা বলা হয়[২]। হয়ত উপরোক্ত সেন্সাস রিপোর্টার যাহাকে চুয়াড়দের ১৯০৬ খৃঃ বিদ্রোহ বলেছেন, ইহা সেই পর্ব।

অতঃপর উত্তরবঙ্গে "গণ উত্থানের" পালা ১৭৭০ খৃঃ (বাঙ্গলা ১১৭৮ সন) বাঙ্গলায় এক অতীব ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে ইজারাদার দেবী সিংহ এবং খাজনা আদায়কারী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচারে 'গণ সাধারণ' ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে। প্রজাদের ঘর পোড়ান, নারীধর্ষণ প্রভৃতির ন্যায় ভীতি ও নাশকতামূলক কার্য দ্বারা কোম্পানীর খাজনা আদায় করা হত। এদের অত্যাচার এত তীব্র ও ভীষণ ছিল যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের

১। Census of India, 1951.

২। মতিলাল শীল প্রণীত বকদ্বীপ।

বিচারকালে কর্মীপ্রবর বার্ক (Burke) তার উপরোক্ত অনুচরদের মানবাকৃতি শয়তান (devil in human form) আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। অত্যাচারের বর্ণনা শুনে শ্রীমতী সেরিডন প্রমুখ অনেক ইংরেজ মহিলা মূর্চ্ছিতা হন। এই অত্যাচারের ফলে গণ-বিদ্রোহ সমুপস্থিত হয়। এ সময়ে উত্তরবঙ্গে এক রোমাঞ্চকারী নারীর উদয় হয়। তার নাম রাণী চৌধুরাণী। এঁর সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংযোগ ছিল বলে অনুমান করা হয়। এর সেনাপতি ছিলেন ভবানী পাঠক নামীয় জনৈক মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ইনি ইংরেজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। রাণী চৌধুরাণীর বজরায় বাস ও যুদ্ধাদি ইংরেজ লেখকগণ স্বীকার করে গিয়েছেন[১]।

এই রাণী চৌধুরাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেবী চৌধুরাণীরূপে বর্ণিত হয়েছেন। কথিত আছে, তিনি রঙ্গপুরের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার ঘরের মহিলা ছিলেন। রঙ্গপুরের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার ১৯২৬ খৃঃ লেখককে বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর এদের সেরেস্তায় যেসব কাগজে জমিদার হরবল্লভ ও পুত্র ব্রজসুন্দরের নামোল্লেখ ছিল ঐ সব নথিপত্র তাঁহারা গোপন করে ফেলেন। বঙ্কিম বর্ণিত দেবীর মাঠ প্রভৃতি এদেরই জমিদারীর মধ্যে পড়ে। আশ্চর্যের কথা, উক্ত বংশ এই সম্বন্ধ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে এ খবরের কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এই বংশের বর্তমান জমিদারের পত্নী মহোদয়া ১৯৪৮ খৃঃ লেখককে জানান যে দেবীর আসল নাম রাণী চৌধুরাণী। এঁদেরই জমিদারীর মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক কালীবাড়ী আছে। সেখানে হস্তাক্ষরে লিখিত রাণী চৌধুরাণীর জীবনী-পুস্তক আছে। বংশধরেরা এ বিষয়ে উদাসীন! যখন বাঙ্গলায় সকলে দেবী চৌধুরাণীর নামে গর্ব অনুভব করেন তখন তাদের লজ্জা বোধ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে ডাকাতি, খণ্ডযুদ্ধ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি তো ভূস্বামীদের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। মহাভারতেও বর্ণিত আছে যে কুরুবংশের পিতামহ স্বয়ং বিরাট রাজার গোধন লুঠ করে আনবার জন্য গিয়েছিলেন। সেদিন পর্যন্তও কোন কোন জমিদার বংশের বদনাম ছিল যে তারা পদ্মানদীতে নৌকায় আরোহীদের লুঠ করে তাদের নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দিত। ইউরোপেও সামন্তযুগে পরের লুটপাঠ করে নেওয়া বীরত্বের কার্য বলে বিবেচিত হত। রাণী বা দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হলে ইতিহাসই উপকৃত হবে।

১ Hunter District Gazetteer.

দক্ষিণ বাঙ্গলায় যখন গণ-বিদ্রোহ হয় তার পূর্বেই মেদিনীপুর জেলা নানাবিধ আক্রমণে প্রপীড়িত। এর মধ্যে ছিল সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচার। সন্ন্যাসীরা ছিল "নাগা" সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা জোর করেই লোকের নিকট থেকে তোলা বা কর আদায় করত। লোকে এদের ভয়ে ভক্তি করত। পাইক বিদ্রোহের পূর্বে ১৭৭৬-৮০ খৃঃ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সশস্ত্রবাহিনা বাঙ্গলার সামাজিক ও রাজনীতিক আকাশে আবির্ভূত হয়। হালসীপুরের (হাতেয়া) রাজা নাগাদের সাহায্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইহার পূর্ব থেকেই উত্তর ভারতের অনেক দেশীয় নরপতির যথা, অযোধ্যা, জয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতির সৈন্যদলে "নাগা-ফৌজ" ভর্তি ছিল।

আকবরের সময় পর্যন্ত সশস্ত্র মুসলমান ফকিরেরা অহিংসবাদী হিন্দু সাধু ও সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার করত, তাঁদের হত্যা পর্যন্ত করত। বারানসীতে কেহ বৈকালে দেবদর্শনে বাহির হতে সাহস করত না। গঙ্গার জল হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে যেত। এ অবস্থা দেখে সরস্বতী সম্প্রদায়ের সাধু মধুসূদন সরস্বতী[১] সম্রাট আকবরের নিকট থেকে এই মর্মে ইঙ্গিত পান যে হিন্দুরাও মুসলমানদের ন্যায় আত্মরক্ষা করতে পারে।" এই হুকুম পেয়ে তিনি হিন্দু রাজাদের সিপাহীদিগকে গেরুয়া পোষাক পরিধান করিয়ে হিন্দু ও তাঁর ধর্মকে বাঁচাবার জন্য ধর্মযোদ্ধা (Knight Templers) সৃজন করেন। তাঁরা ধর্মান্ধ মুসলমান গাজীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।[২]

"দাবীস্তান" নামক ফার্সী পুস্তকে উল্লিখিত আছে, এই সন্ন্যাসীরা সর্বদাই যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকত। উক্ত পুস্তকেই পুনঃ উল্লেখ আছে "মাদারিয়া" ও "জালালি" নামক সম্প্রদায় দু'টির ধরণ-ধারণ বাহ্যত নাগাদের ন্যায় ছিল। কিন্তু নাগাদের সহিত এদের যুদ্ধ লেগেই ছিল। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকগণ বলেন, মুসলমান ফকিরদের স্পর্দ্ধা অত্যধিক রকমের বেশী। তারা সাধারণ লোকের উপর জোর-জুলুম চালাত। কারণ তারা রাজার জাতের লোক। ইহারা সকলেই শাহ পদবী ব্যবহার করত। পুরাতন ইংরেজী সরকারী

১। কোটালীপাড়ার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। ইনি শঙ্করাচার্যের মতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এজন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ পর্যন্তও তিনি খুব শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন।

২। J.N. Farquhart (i) The Organisation of the Vedanta (J.R.A.S. of Great Britain and Ireland ; July 1925) ;

(ii) The Fighting Monks of India in the Journal at Anthropological Society U. S. A.

দলিল পত্রে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রমণের কথা উল্লেখ আছে। উল্লিখিত আছে যে ইহারা বেশীরভাগ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যাতায়াত করত। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য হতে লোক নিয়েও এদের দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ থেকেই 'ছেলেধরা' প্রবাদ বাঙ্গলায় প্রচলিত হয়েছিল। ১৭৭৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে একদল সন্ন্যাসীকে ক্ষীরপাই-র (ঘাটাল মহকুমা) সন্নিকটে দেখা যায়। পুরী তাদের গন্তব্যস্থল ছিল। ইংরেজ সরকার তথাকার কর্মচারীকে ইহাদের বিনষ্ট করবার হুকুম দেয়। পুনঃ মার্চ মাসে এই দলের তিন হাজার লোক রায়পুরে আবির্ভূত হয়। কাপ্তেন ফরবেস্ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু তারা জঙ্গলমহল দিয়ে পালিয়ে যায়। জুন মাসে কাপ্তেন এডওয়ার্ডস্ তাদের দলকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। আবার অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে নিহত হয়। আরেক জায়গায় ইহাও আবার উল্লেখ আছে, দুই জন অফিসার নিহত হয়। এই দল পরে প্রয়াগ অভিমুখে পালিয়ে যায়। রায় সাহেব শ্রীযামিনী মোহন ঘোষ মহোদয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বাঙ্গলায় অভিযানের ব্যাপারে সরকারী কাগজপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সরকারী অফিস থেকে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন।[১] তিনি বলেছেন যে ফকিরেরা মজনুসার অধীনে মৈয়মনসিংহ জেলায় নানা প্রকারের নির্মম ও অকথ্য অত্যাচার করেছিল। স্বীয় সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে একটি মেয়ে নৃসংশ অত্যাচারী ফকিরকে পিতা বলে সম্বোধন করেছে, তথাপি বলাৎকার করা হয়েছে ঐ মেয়েটির উপর। উত্তর-পূর্বে যখন এ প্রকার ঘৃণ্য ও জঘন্য অত্যাচার চলছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। বগুড়া জেলার গেজেটিয়ার বলেছে যে মজনুসা বগুডা জেলায় অবস্থান করছেন এমন সময় অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়ে ফকিরদের উপর আক্রমণ করে।

ফকির নেতার কেবল শিশুপুত্র ছাড়া সকলেই নিহত হয়। লোকে ইহাকে ভগবৎ প্রেরিত দল বলেই বলাবলি করতে লাগল। এ ঘটনাকে লক্ষ্য করে সর্দার পাণিকর তাঁর পুস্তকে বলেছেন যে হিন্দুদের উপর ফকিরদের অত্যাচার দেখে মধুসূদন সরস্বতা কর্তৃক সৃষ্ট নাগা সন্ন্যাসীরা অত্যাচারীদের দমন করবার জন্যই বাঙ্গলায় গিয়েছিলেন।[২] কিন্তু ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে

১। Jamini Mohan Ghose—Sannyasi & Fakir Raider in Bengal (C.M. XXX).

২। K. M. Pannikar—A Survey of Indian History.

পরে আবার নাগা ও ফকিরেরা মিলিত হয়ে কয়েক জায়গা থেকে টাকা আদায় করে।

বিভিন্ন রেকর্ড থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পড়ে এ'কথা বলা যায় না যে সন্ন্যাসীরা দেশপ্রেম ও স্বধর্ম প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ফকিরদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বাঙ্গলায় শুভাগমন করেছিলেন। কেবল বগুড়ায় মজনুসার দলকে নিহত করা ব্যতীত আর কোথাও তাদের স্বজাতি বা স্বধর্ম প্রেম দেখা যায় নাই। অবশ্য ফকিরদের সঙ্গে প্রাচীন বৈরী ছিল। স্বধর্ম প্রেম বা স্বজাতি প্রেম তাদের সর্বত্র অনুপ্রাণিত করে নাই। ইহার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ—অযোধ্যার নবাবের সৈন্যদলভুক্ত ১৪০০০ নাগা-সৈন্য রূপনারায়ণ গোঁসাই-এর নেতৃত্বে ৩য় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা হিন্দুদের বিপক্ষে লড়িবার কাহিনী। কিন্তু যখন আফগানেরা মারাঠাদের কোতল করতে আরম্ভ করে তখন ভীত মারাঠা সৈন্যেরা নাগাদের তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা পায়। আর মারাঠা তাঁবু হতে লুণ্ঠিত রমণীদের নবাবকে ২২০০০ ভোমান দিয়ে খালাস করাতে বাধ্য করে[১]।

যাহা হউক বর্তমান সংবাদের উপর নির্ভর করে আমরা নাগাদের বাঙ্গলায় অভিযান স্বধর্ম প্রেম বা স্বজাতি প্রেম প্রণোদিত বলতে পারি না। রঙ্গপুরে যুদ্ধ করে অবশ্য তারা কাপ্তেন টমাসকে নিহত করেছিল কিন্তু উহা ইংরেজের সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধ নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সকলে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়ে কল্পনা করেছিল সন্ন্যাসীরা "বন্দেমাতরম্" রণধ্বনী হাঁকত। আবার রং চড়িয়ে ঢাকার রমনা স্বামিজী বললেন, তারা 'ওঁ বন্দেমাতরম্' বলত!

এবার ইঙ্গ-বঙ্গের পালা। এবার অহিংস নীতি অনুসারে গণ-বিদ্রোহ হয়। ইহাকে 'নীলকর-বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করা যায়। ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ইংরেজ মূলধনীরা মধ্য-বাঙ্গলায় নীলের চাষ আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও নীল উৎপন্ন হত না। ইংরেজ কারবারীরা জোর করে রায়তদের জমিতে নীল ছড়িয়ে তাদের তাহা বুনিতে বাধ্য করত। রায়তদের মারপিঠ ও তাদের উপর জুলুম বিশেষভাবেই হত। অবশেষে যশোরের ভৈরব বিশ্বাস এবং তাহার ভ্রাতা নীলকর চাষীদের নেতা হয়ে নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ (Passive Resistance) আরম্ভ করে[২]। এ কাজে তারাও নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

১। Jadunath Sarkar—The last days of the Mughals.
২। Sisir Kumar Ghose—Indian Sketches.

চাষীরা বলে "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই হাত আর নীল চাষ করবে না।" কলকাতায় হরিশ মুখোপাধ্যায় নামক একজন সংবাদপত্রসেবী তাঁদের বিষয় কাগজে আন্দোলন করতে লাগলেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার "নীল দর্পণ" নাটকে ইংরেজ নীল ব্যবসায়ীর অত্যাচারের বীভৎসতা প্রকাশ করেন। আমেরিকার টম কাকার কুটীর (Uncle Tom's Cabin) নামক পুস্তকের ন্যায় উপরোক্ত পুস্তক নীলচাষের বিভৎসতার মুখোস খুলে দেয়।

এই পুস্তকখানা কবি মাইকেল দত্ত কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়। কিন্তু পাদরী লং সাহেবের প্রকাশ্যে নাম থাকাতে তাহার জেল হয়।

যশোর নদীয়া এবং পাবনায় এই গণ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নদীয়ার স্থানীয় এক ক্ষুদ্র জমিদার ইহার নেতা হন। ইংরেজের লাঠিয়ালদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সদা সজাগ থাকতেন। তাদের সংগঠন ও প্রতিরোধ অদ্ভূত কৌশলপূর্ণ ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয় লেখকের জনৈক বন্ধুকে স্বদেশী-যুগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, "সেইরূপ বলিষ্ঠ শরীরের কৃষক আর দেখা যায় না।" কৃষকেরা অহিংসপন্থা অবলম্বন করেছিল।

যশোরে আর একবার নীলকর আন্দোলন হয়। উহার প্রধান কর্মী ছিলেন স্বামী কেশবানন্দ। বহু লেখালেখি ও কলিকাতার আন্দোলনের ফলে এই অত্যাচারের মূল কারণ অপসারিত হয়। শেষে জার্মাণীতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হওয়ায় নীলের চাষ ভারত থেকে একেবারে উঠে যায়। কেবল কারখানাগুলির ভাঙ্গা বাড়ীসমূহ পড়ে থাকে।

স্বদেশীযুগের প্রাক্কালে নদীয়া জেলায় স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচার কার্যের সময়ে এক বৃদ্ধ মুসলমানের সহিত লেখকের আলাপ হয়। তিনি নীলকুঠীর একজন পেয়াদা ছিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সলজ্জভাবে বললেন "হাঁ বাবু, বড় অত্যাচার হত।"

এই প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও তৃতীয় ভাগে বাঙ্গলায় গণ-বিদ্রোহ পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়। অবশেষে নানা অত্যাচারে ঠগী ডাকাতি বন্ধের জন্য ওয়াকোপের আইন দ্বারা বলিষ্ঠ শরীর বিশিষ্ট গণশ্রেণীয় লোক দেখিলেই জেল দেওয়া প্রভৃতি বিবিধ কারণ-বশতঃ পূর্বোক্ত ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয় বর্ণিত গণশ্রেণীয় লোকের অন্তর্ধান হয় এবং তৎপরিবর্তে দুর্বল, ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্থ ক্ষীণ বাঙ্গালী কৃষকের আবির্ভাব ঘটে। তত্রাচ ১৯৩০-৩২ খৃঃ পর্যন্ত মেদিনীপুরের কৃষক ও গণ-শ্রেণীয় লোকেরা ইংরেজ পুলিশের নির্মম অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য

যেসব কার্য করেছে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আজও বাহির হয় নাই। এই উপলক্ষে শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখনীয়। তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে পুলিশের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করণার্থ গণসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসবাদ (Counter terrorism) অবলম্বন করেন। এই আন্দোলনের কোন কোন নেতার সহিত লেখক ১৯৪৭ খৃঃ কাঁথিতে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

।। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলা ।।

ইংরেজ আমলের রাজকর্মচারী সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাঁহার "লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণরদের অধীনে বাঙ্গলা" নামক পুস্তকে সিপাহী বিদ্রোহের আমলের প্রদেশপাল সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে তৎকালীন বাঙ্গলা (বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাসহ গঠিত) প্রদেশে সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ দাখিল করেন তাহা প্রকাশ করেছেন। ইহার মধ্যে খাস বাঙ্গলা সম্পর্কে অন্যান্য সংবাদাদির ভিতর নিম্নলিখিত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে।[১]

প্রদেশপাল স্যার হ্যালিডে তার প্রদত্ত সরকারী বিবরণীতে বলেছেন যে বাঙ্গলা প্রদেশের বিহারের সাহাবাদ জিলায় কুমার সিংহের নেতৃত্বে বিরাট বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল; ছোটনাগপুর এবং কটক বিভাগে অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন হয়ে উঠে। খাস বাঙ্গলাভাষী অধ্যুসিত বাঙ্গলার মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যেখানে হিন্দী-ভাষা উত্তর ভারতে সিপাহীদের ছাউনী ছিল সেখানেই বিদ্রোহ হয়েছে। উক্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে, বাঙ্গলাভাষী লোকেরা সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করে নাই, বরং বিপক্ষতাচরণ করেছিল।

সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষিত বঙ্গবাসী বা ইংরেজ কোম্পানী-পুষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্লুত ব্যক্তিরা এই সামন্ততান্ত্রিক প্রচেষ্টা সম্বলিত তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। ইহা কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত বাবু এবং ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষপুট-পুষ্ট কেরাণীবাবুদের মনোবৃত্তি সুলভ ছল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু জনশ্রুতি ও উপরোক্ত সরকারী বিবরণীর মধ্যে অনেক সংবাদ আছে যাহা এ ধারণার সমর্থনে যায় না।

১। C. E. Buckland—Bengal under the Lieutenant Governors Vol: I. chapter on Sir P. J. Halliday : Appendix pp. 65-162.

উক্ত বিবরণী আরও বলেছে, মানভূম জেলার পাঁচেটের (পঞ্চকোট) জমিদার রাজা নীলমণি সিংহদেব সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে ধৃত ও বিচারাধীন হয়ে অন্তরীনে আটক হন।[১]

সিংভূমের লাউহাটের রাজা ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করেন।[২] রাজা তাঁর দেওয়ান জগুর (Jaggoo) হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে দেওয়ান জগু ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজা অর্জুন সিংহ জঙ্গলে পালিয়ে যান! এ সময়ে মানভূম ও সিংভূম জেলার বিভিন্ন কৌমদের মধ্যে এক বিশাল ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। পোড়াহাটের রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা কোলদের ক্রমাগত উত্তেজিত করে-ছিলেন। রাজা তাঁর দেওযান রঘুদেও-এর প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করতে অসম্মত হন এবং রিপোর্ট লিখবার সময় পর্যন্ত জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকেন।

আসাম বিভাগের জোড়হাটের রাজা কন্দর্প সিংহ সিপাহীদের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। রাজা নাবালক ছিলেন এবং তাঁর দেওয়ান মণিরাম দত্তের হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন। মণিরাম কলকাতায় থাকতেন। রাজার বাড়ীতে খানাতল্লাসীর ফলে মণিরাম দত্তের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র হস্তগত হয়। মণিরাম দত্তকে গ্রেপ্তার করে কিছুকাল আলীপুর জেলে আটক রাখার পর পুনঃ আসামে পাঠান হয়। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়।[৩] তাঁর সঙ্গে আরও চারজনকে ধরা হয়। তাঁদের একজনের ফাঁসী, দুইজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, অপর একজনের ১৪ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। তরুণ রাজাকে আসাম থেকে এনে আলীপুর জেলে আটক রাখা হয়।

পুনঃ পূর্বাঞ্চলে মাসিয়া সর্দারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জয়ন্তিয়ার সিংহাসনচ্যুত রাজা চেরার সর্দারদের উত্তেজিত ও ক্ষেপাবার অপরাধে ধৃত হয়ে শ্রীহট্টে অন্তরীণ হন। অন্যদিকে মণিপুরের জনকতক রাজকুমার ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন।

১—২। Ibid. pp. 193-204.

৩। তার সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে যোগাযোগ ছিল তাহার সাক্ষ্য বাঙ্গালী মধু মল্লিকের কার্যাবলীতেই প্রকাশ। মণিরাম দত্ত কর্তৃক মধু মল্লিক জোড়হাটে প্রেরিত হন। কাপ্তেন চার্লস্ হল্‌রয়ডের (Charles Holroyds) রিপোর্টও রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহের জবানবন্দীতে প্রকাশ যে মধু মল্লিকই রাজাকে উত্তেজিত করার কাজে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কাপ্তেন হল্‌রয়ড্ তাঁকে বন্দী করেন। মণিরাম দত্ত কলকাতার ছাতুবাবুর বাড়ী থেকে ধরা পড়েন। মধু মল্লিকের দ্বীপান্তর হয় এবং মণিরামের ফাঁসি হয়।

আবার পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলের মুসলমানেরা বিদ্রোহী সিপাহীদের নানা প্রকারে সাহায্য করেন বলে জনশ্রুতি আছে। যশোরের ঝিকরগাছির মহম্মদ আলী নামায় এক পুলিশ জমাদার এক ধর্মের ফতোয়া জারী করে প্রচার করে যে 'শেষ বিচারের দিন (কেয়ামতের দিন) আসছে।' এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বাকল্যাণ্ডের রিপোর্ট এ বিষয়ে নীরব!

কলকাতায় লোকের মধ্যে একটা অশান্তির ভাব সৃষ্টি হয়। গুজব রটে যে দেশীয় লোকেরা বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র কিনে গোপনে মজুত করে রাখছে। পুলিশের তদন্তে দেখা গেল যে যদিও দেশীয় লোকেরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে তবু এই প্রচারে গুজবের ভাগই অত্যধিক বেশী। তথাপি পুলিশ আগামী মহরম্ পর্ব উপলক্ষে পাছে কোন গোলমাল বাধে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিকট এই অমূলক ভয় ও ত্রাস নিরসনের জন্য অনুরোধ জানান! বকৃরি ঈদ্ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়! কিন্তু ইউরোপীয় দোকানদারেরা দেশীয়দের নিকট পিতলের টুপি ও বন্দুক বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেয় এই আশঙ্কায়, পাছে উহা উত্তর-পশ্চিমের বিদ্রোহীদের নিকট পুনঃ চালান হয়ে যায়। অন্যদিকে বারাসত ও অন্যান্য স্থানে অযোধ্যার নবাবের দলের লোকদের গ্রেপ্তার ও আটক করে রাখা হয়। কলকাতায় চিৎপুরের নবাবের বাড়ীতে গোপন ও লুক্কায়িত অস্ত্রাদির সন্দেহে খানাতল্লাসী করা হয়।

পুনঃ ঢাকা জেলায় ফেরাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়! অনেকে তাঁহাকে জোনপুরের ঐ নামে পরিচিত এক খ্যাতনামা মোল্লার সহিত সনাক্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা প্রমাণিত হয়নি। চাঞ্চল্য প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত না হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলায়ও বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কারণ দেশীয় পল্টনের উপর সন্দেহ ছিল এবং সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের গোলমালের ঢেউ আসতে পারে এ ভয়ও ছিল। মেদিনীপুরে এক পুলিশ বরকন্দাজ সিপাহীদের বিদ্রোহ করবার জন্য উত্তেজিত করছিল বলে ধরা পড়ে।

এ'সময়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। হুগলী জেলার জমিদার ও অন্যান্যেরা গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনে জানান যে পুলিশ বরকন্দাজরা অকর্মণ্য ও কাপুরুষ। তাদের বদলে লাঠিয়ালদের কার্যে নিযুক্ত করা হউক।

তদনুসারে হুগলী সদর থানায় পরীক্ষামূলকভাবে তাদের (লাঠিয়াল) নিযুক্ত করা হয়। পরে হুগলীর ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বহুসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টানদের উক্ত কর্মে নিয়োগ করা হয়। ইহারা ভাল এবং কর্মদক্ষ বলেও প্রমাণিত হয়।

ইহা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিপদের বেলায় বাঙ্গালী লাঠিয়াল এবং খৃষ্টানদের সামরিক কার্যে ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেছে। সুতরাং বাঙ্গালী 'সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন' জাতি নয়, এই অপবাদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারেনি !

ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা নানা প্রকারের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজ অধিবাসীরা সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

অন্যপক্ষে মণিরাম দত্ত কলিকাতায় গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতেছিল। ইহা অন্যান্য বঙ্গভাষী বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকে কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এই দৃশ্যপটের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একদল বাঙ্গালী ছিল। সুতরাং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ সরকারের পক্ষপুটে-পুষ্ট শ্রেণীর বাহিরে বহু বাঙ্গালী ছিলেন যাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তজ্জন্য জীবন দানও করেছেন। এসব প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে না যে বাঙ্গালীরা "সিপাহী বিদ্রোহ" ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এবং উহা হতে দূরে ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় মোরচা (Anti-Imperialist Front) রচনা করেছিল এবং পরবর্তীকালে উহা স্বাধীনতাকামীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ স্বাধীনতার যুগ ॥

"কলি শযানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সংপদ্যতে চরন্
চরৈবেতি চরৈবেতি" ॥

"এক্ষণে পুরুষাকার প্রদর্শন পূর্বক অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জনে যত্নবান হও"। বিদুলা—সঞ্জয় সংবাদ; উদ্যোগপর্ব—মহাভারত।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়। পরাধীনতার এই সুদীর্ঘ অমানিশার অবসানে বঙ্গভাষী আবার স্বাধীনতার আলোক দেখতে পায়। কিন্তু এ আলোক বঙ্গপ্রদেশকে দ্বিখণ্ডকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। প্রাচীন গৌড়চক্র আর নাই! বাঙ্গলার "পঞ্চ গৌড়েশ্বর"-রূপ মহিমা আজ বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সেনরাজগণ বাঙ্গলাকে তার পূর্ব গৌরব ও প্রতিষ্ঠার পদমর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, অথবা উপযুক্ত পরিমাণ সময় পান নি। গৌড়ের সুলতানগণও এ-বিষয়ে কৃতকার্য হন নি যদিও তাঁরা বিহার এবং কামরূপের উপর কখনও কখনও প্রভূত্ব স্থাপন করেছিলেন।

অতঃপর আসে মুঘল-শাসন। যথার্থভাবে বাঙ্গলার শোষণ ও পরাধীনতার অবস্থা সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। গৌড়ের সুলতানদের শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিতভাবে বাঙ্গলাভাষার চর্চা করেছেন, সাহিত্য গড়েছেন, গীতবাদ্য বিবর্তিত করেছেন এবং ধর্মের সংযোগও হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ই পীর-পূজা করেছেন। ইসলামীয় সুফীধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বৈষ্ণবধর্ম উভয়েরই ভাবধারা এক আদর্শাভিমুখী হয়েছিল। পোষাক-পরিচ্ছদের ধরণ-ধারণেও একটা একরূপতা প্রাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু মুঘলযুগে ও উহার পরবর্তীকালের ইংরেজ আমলে তাহার কৃষ্টির নূতন কিছু বিকাশ করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। দেশজ মুসলমানও পরাধীনতার জিঞ্জির হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিল। কথিত আছে, যশোর অঞ্চলে বক্তার খাঁ (বক্তোয়ার) নামে এক দুর্ধর্ষ পাঠান ডাকাত ছিল। এই সময়ে সীতারাম রায় মুর্শিদাবাদের সুবাদারদের দ্বারা সুন্দরবনের ডাকাতদের দমনের জন্য আদিষ্ট হন। একদা তিনি নদী-পথে যাওয়ার কালে অকস্মাৎ নিকটবর্তী এক গ্রাম হতে ভীষণ গোলমাল শুনতে পান। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারলেন

"বক্তার খাঁ গ্রাম……লুঠিতেছে।" তিনি তীরে উঠিয়া বক্তার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হতে লাগল। তিনি কহিলেন "আর কতক্ষণ।" প্রত্যুত্তরে বক্তার কহিল "জীবন যতক্ষণ"। সীতারাম কহিলেন "ইহার প্রয়োজন কি ?" বক্তার বলল, "কি করিব, স্বাধীনতা গিয়াছে, আর করিবার কি আছে।" সীতারাম বললেন "যদি পাঠান ও হিন্দু এক হয়"। উত্তরে বক্তার বলেন, "তাহা হলে সবই সম্ভব হয়।" ইহাতে উভয়েই তরবারী ফেলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে মিত্রতা স্থাপন করেন।

এই বক্তার খাঁই পরে রাজা সীতারাম রায়ের স্বাধীন বাঙ্গালী রাজত্ব স্থাপন প্রচেষ্টায় তাহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিরূপে সহকারী হয়েছিলেন। ১৯0৫—৬ খৃঃ সীতারাম রায়ের উৎসবকালে জাতীয়তাবাদীরা তাঁহার কবর-স্থানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

এই কারণবশতঃ মেদিনীপুরের রহমৎ খাঁ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে শোভা সিংহের বাগ্দী সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুঘলের বিপক্ষে অভিযান করেছিলেন। এই প্রকারে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী হিসাবে পারস্পরিক সহনশীলতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে একজাতিরূপে বিবর্তিত হয়েছিলেন। হিন্দুর মধ্যযুগীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষা থেকে উদ্ভূত গৌড়ীয় ভাষার সঙ্গে ফার্সী এবং আরবী মিলিত হয়ে বর্তমানের বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এটা ভুললে চলবে না। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বাঙ্গলা ভাষার অর্ধেক ফার্সী শব্দ। ইংরেজ আমলে ফার্সী শব্দ পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা ভাষা সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু কথ্য ভাষায় ফার্সী ও আরবী শব্দ ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাসমূহ থেকে শব্দসমূহ আজও বাঙ্গলা ভাষায় আমদানী হচ্ছে।

ইংরেজযুগের প্রধান সামাজিক বিবর্তন হয়েছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন হলে মুসলমানেরা তা' বর্জন করে; কিন্তু হিন্দুরা উহা সাদরে গ্রহণ করে। পূর্বের রাজভাষা ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা করে তাঁরা সরকারী কাজকর্ম করতে লাগলেন। এরূপে একটি চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী উদ্ভূত হয়। তৎপর উদার পেশাসমূহের দ্বারা ভারতবাসীর দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি অবস্থাপন্ন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিবর্তিত হয়। আর দশশালা বন্দোবস্ত দ্বারা মুঘলযুগের ভূমির ঠিকেদারেরা (lease-holder) জমিদাররূপে (land-holder) রূপান্তরিত হয়।

এই অর্থনীতিক পরিস্থিতি হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রমকে বিশেষভাবে আঘাত করে। তুর্কি মুসলমান আক্রমণ দ্বারা বর্ণাশ্রম বিশেষভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই আক্রমণের প্রবল চাপে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ মুসলমানী কৃষ্টি গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানের বিহার ও বাঙ্গলা তাহা প্রতিহত করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করে (তৎকালে বর্তমানের "বিহার" প্রদেশ বিবর্তিত হয় নাই)। মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভে স্বাধীন রাজ্যরূপে বিদ্যমান ছিল প্রাচীন মিথিলা। কবি বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিব সিংহের সময়ে মিথিলা মুসলমানাধান হয়। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত মিথিলা পূর্বাঞ্চলের কৃষ্টির দ্যোতকরূপে বিদ্যমান ছিল। পুনঃ বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে চতুষ্পাঠীসমূহ প্রাচীন সংস্কৃতভাষাগত কৃষ্টি জীবন্ত রাখত। স্থানীয় ধনী ও ভূস্বামীগণ এসব বিদ্যালয়সমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এইসময় উত্তর ভারতের এবং বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্য কমঠবৃত্তি অবলম্বন করে জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং স্পর্শদোষ প্রভৃতির কড়াকড়ি নিয়ম বিশেষভাবে অবলম্বন করে। এইযুগে ভারতের যে চারজন নিবন্ধকার অর্থাৎ নব্যস্মৃতিকারের উদয় হয়, বাঙ্গলার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আজকালকার সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এদের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে বিশেষ অহিতকর।

এদের মধ্যে আমরা রঘুনন্দনের ব্যবস্থার বিষয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। কারণ স্বাধীন বাঙ্গলার এ-াংশ লোকের মধ্যে ইহা এখনও কার্যকরী রয়েছে। রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তিনজনই নবদ্বীপের অধিবাসী এবং সহপাঠী বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু মতে মিলিত হতে না পারায় তিনজনই পৃথক রাস্তায় গেলেন। রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামক পুস্তকে "শুদ্ধিতত্ত্ব", ষড়বিংশতি অধ্যায়ে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের শ্লোক জাল করে বলতে চেয়েছেন যে সতীদাহ বেদসম্মত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসল বেদ দৃষ্টে দেখা গেল যে ইহা মূলানুগ নহে। এবম্প্রকারে একাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মতের সমর্থনার্থ মিতাক্ষরা পুস্তকে গৌতমস্মৃতির একটা শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম স্মৃতিকার ইহা বলছেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ব্যবহার দায়ভাগের টীকাকারদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং অচ্যুত, ইহা দেখিয়ে দেন যে উক্ত শ্লোকটি 'আমূল' অর্থাৎ মূল গ্রন্থে নেই। তদ্রূপ মেধাতিথি মনুস্মৃতির

টীকাকালে মনুর মত খণ্ডনার্থে বলেছেন, "আচার্যেন উক্তং"। কিন্তু কোন্ আচার্য বলেছেন, তার উল্লেখ নেই। মধ্যযুগের বিরচিত নানা উদ্ভট শ্লোক যা মুখে মুখে চলত তা' পরে অজ্ঞের কাছে শাস্ত্রবচন বলে গণ্য হয় এবং তাহা বহু পণ্ডিত কর্তৃক স্বীয় স্বার্থানুকূলে ব্যবহৃত হত। দেশশুদ্ধ লোক যখন মূর্খ, বিশেষতঃ যখন পুরোহিতশ্রেণী ব্যতীত অন্য কেহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারত না, আর যখন দেশে স্বাধীন নরপতি যে-সামাজিক তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করবেন, তখন স্বভাবতঃই এসব বিভ্রাট উপস্থিত হত। রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত লোকে বিশ্বাস করত যে বেদে রয়েছে "দেবী ত্রিনয়না"। আর ইহাও লোকে বিশ্বাস করত যে রাধাও বেদে উল্লিখিত রয়েছেন। আসল কথা, এ'বিষয়ে প্রবল "আর্য-সাম্রাজ্য" ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে নানাশ্রেণীর বর্বরজাতি ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করে এবং চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তাদের 'অনার্য' আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি হিন্দুত্ব লাভের ফলে দেশে স্থায়ীত্ব লাভ করল। লোকে ম্লেচ্ছভাষা ও আগের ভাষা ব্যবহার আরম্ভ করে। কাজেই তখন সেগুলিই সমাজে অঙ্গীভূত হতে লাগল। তখন তাকে জাতিতে তুলে নিতে শাস্ত্রকারেরা বাধ্য। এ-বিষয়ে 'পূর্ব-মীমাংসা' প্রণেতা জৈমিনীর টীকা উদার হয়ে বলেছেন, "রাজশব্দ ক্ষত্রিয়বাচী"। ইহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, দক্ষিণে লোকের পদবী 'রাজা'। এতদ্বারা তাদের ক্ষত্রিয়-বর্ণত্ব স্বীকৃত হয়। এই উপায়ে নূতন ক্ষত্রিয়বংশসমূহ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। তৎপরে আসলেন কুমারিলভট্ট। তিনি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের অগ্রগামী। কিন্তু বাধ্য হয়ে জৈমিনীর ব্যাখ্যা মেনে নেন। তিনি বিধান দিলেন, নূতন আচার-ব্যবহার যদি বেদ-বিরুদ্ধ না হয়, তা'হলে উহা গ্রহণীয় হবে (তন্ত্রবার্তিক দ্রষ্টব্য)।

এবম্প্রকারে যখন ব্যবহারে (আইন), আচারে এবং রীতিতে অনার্য ও বৈদেশিক প্রথা দেশে শিকড় গেড়ে বসল তখন উহা সনাতন শাস্ত্রসম্মত বলে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নেই। এই প্রকারে ধর্মের নামে, সামাজিক রীতির নামে ও আচারের নামে নানা দেশ মধ্যে যখন তাহা প্রচলিত হল তখন লোকেও ইহার উৎপত্তির বিষয় ভুলে গিয়ে বৈদিক আপ্তবাক্য বলে নির্বিরোধে ও নির্বিবাদে উহা মেনে নেয়। এরূপে বাঙ্গলার প্রচলিত রীতিকে আর্য-শাস্ত্রসম্মত করবার জন্যই রঘুনন্দনকে বেদের একটি শ্লোক জাল করতে হয়েছিল। কারণ মধ্যযুগের যে-কয়খানি নিবন্ধ পুস্তক ইহার স্বপক্ষে বলেছে

তাহা বেদবাহ্য, অতএব শাস্ত্রীয় নহে। রঘুনন্দনের আর একটি কুকীর্তি হ'ল কলিযুগে কেবল দুই বর্ণ আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নিয়েই আর্যসমাজ, এরূপ উদ্ভট ও জঘন্য বিধান প্রদান। কলিযুগে দুই বর্ণ এই শ্লোকটি যমসংহিতাতে আছে বলা হত, কিন্তু তাহা সত্য নয়। কমলাকরভট্ট তাঁর "শূদ্র কমলাকর" পুস্তকে বলেছেন, "শাস্ত্রান্তরে" উহা আছে। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে তা আছে তাহা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হল না। এ' বিষয়ে লেখক অন্যত্র আলোচনা করেছেন। রঘুনন্দন এই শ্লোকের মর্ম বাঙ্গলায় প্রয়োগ করে তিনি সত্যের অপলাপ করেছেন। তাঁরই সময়ে উড়িষ্যার রাজা, বিজয়নগরের সম্রাট, চিতোরের রাণা এবং অন্যত্র অজস্র রাজপুত সামন্ত ও রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদাররূপে বিরাজ করছিলেন। তৎপরে উত্তরে রাজপুত, দক্ষিণে রাজু ও ভেল্লালা, মারাঠা প্রভৃতি জাতিসমূহ বরাবরই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে এসেছেন। বাঙ্গলার 'বল্লাল-চরিত' গ্রন্থে ক্ষত্রিয় 'প্রেমবিলাসে' "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" জাতির উল্লেখ রয়েছে। তত্রাচ তিনি কি প্রকারে বললেন যে বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নেই। বাঙ্গলার ব্যবসায়ী জাতিগুলি যাঁহাদের 'নবশায়ক' বলা হয় চিরকালই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন। তাঁরা বৈশ্যত্ব বঞ্চিত হলেন কি প্রকারে? পুনঃ অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং বৃহৎধর্মপুরাণ গ্রন্থদ্বয়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য পেশাগত লোকসমষ্টি-সমূহের সম্বন্ধে হাস্যোদ্দীপক উৎপত্তির বর্ণনা আছে। ইহার উত্তরে বলা হয়—বাঙ্গলার উত্তরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আগের তখন ছিল না। হয়ত বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে তাঁদের বর্ণ ও শ্রেণীগত ক্রিয়া লোপ পেয়েছিল; হয়ত "দশকর্ম" তাঁরা সম্পূর্ণ বা পুরাপুরি পালন করতেন না। আজও ভারতে সকলে তাহা পালন করেন না। কিন্তু বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা কি তখন সকলেই সাগ্নিক বৈদিক আচারসম্পন্ন ছিলেন? হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের তান্ত্রিক বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের রাজাদেশে বৈদিক দ্বারা পুনঃ উপনয়ন প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণেরা কেবল বাঙ্গলায় রইলেন আর ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্ধান হয়েছে। বাঙ্গলার হিন্দুর দুর্ভাগ্য যে, পাল রাজত্বের অবসানের পর ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতাদের প্রাচীন করা হয়; আচার-ব্যবহার বাঙ্গলায় সমূর্ত করতে তাঁহারা আর্যভাষী ভারতীয় জাতির ক্রম-বিকাশ এবং সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তনের গতিশীলতা অস্বীকার করে-ছিলেন। উপরোক্ত জৈমিনি ও কুমারিলের ব্যবস্থা তাঁহারা ধরতে পারেন নি। তৎপর শ্রেণীস্বার্থ সমাজে বড় বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। দেশে যখন

সকল বর্ণের পরিচালক কোন স্বাধীন হিন্দু রাজা নেই, তখন পুরোহিত শ্রেণী স্বভাবতই সমাজের নেতা হয়ে স্বীয় মতানুসারে এবং স্বার্থোদ্দেশে তাহা পরিচালিত করত। এ'জন্যই বাঙ্গলার সমাজের এরূপ বিভ্রাট।

তৎপর সমাজ-বিধ্বংসী রঘুনন্দনের আর একটি দুষ্কার্য হচ্ছে 'প্রায়শ্চিত্ত বিধান।' যখন দেশের লোক জলস্রোতের ন্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করে "আরব" সাজিতেছে, যখন হিন্দুর পুত্র স্বধর্ম ত্যাগ করে স্বীয় পূর্বতন সমাজের উপর ভীষণ উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, সেই দুর্দিনেও রঘুনন্দন বিধান দিলেন যে স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করলে পুরাতন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে, কিন্তু পৈতৃক সমাজে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে না! ইহার অর্থ, যদি কোন হিন্দু অহিন্দুর ধর্ম গ্রহণের পরে পুনঃ স্বীয় পৈতৃক সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে তা'হলে সে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পুরাতন ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু পৈতৃক সমাজে পুনঃ প্রবেশাধিকার পাবে না। আজ-কাল ইহা নিঃসন্দেহে ঘোর হিন্দুজাতীয়তার বিপক্ষতাচরণ বলেই বিবেচিত হবে। যখন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতিকে বাঁচাও বলে অদ্বৈত নিত্যানন্দের দল বাঙ্গলায় ধর্ম ও সমাজে সংস্কারের রোল তুলতেন, তখন জাতির বিচার নাই, তখন বৈষ্ণব বর্ণনে 'বৈষ্ণব বন্দনা' ভক্তেরা গাইলেন। যখন দুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ গোস্বামী) বললেন, 'ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি পরতেকে চাহ একবার।' যখন অনেক মুসলমান বৈষ্ণব হলেন, তখন এবম্প্রকারের আত্মঘাতী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আজ বিংশশতাব্দীর মানব বুদ্ধির অগম্য। যে-দেশে আজ পর্যন্ত ধর্ম দিয়ে মূলজাতিত্ব ও একজাতিত্ব এবং যে দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশধর অহিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে তাহার সহস্র সহস্র বৎসরের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য অস্বীকার করে নব-গৃহীত ধর্মানুসারে হয় 'আরব' না হয় 'ইউরোপীয়' বলে পরিচয় প্রদান করে তখন সেই দেশের অনুতপ্ত হিন্দুকে তাহার পৈতৃক সমাজে পুনঃ প্রবেশের অধিকারলাভে বঞ্চিত করে স্বীয় সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবার কি হেতু ছিল তাহা আজ আমাদের বোধগম্য নহে। এস্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে, মুসলমান-রাষ্ট্রে কেহ মুসলমান হলে সে উহা পরিবর্তন করতে পারত না; কারণ স্বধর্মত্যাগীর (Renegade) দণ্ড ছিল মৃত্যু! অন্যপক্ষে একাদশ শতাব্দীতে 'মিতাক্ষরা' প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বরের বিধান ভিন্ন প্রকারের! রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল ফাঁকা। তাঁহার বিধান অনুসারে স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করে স্বীয় সমাজে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু পৈতৃক-শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে না।

ইহার অর্থও বোধগম্য নহে। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্বে এবং সমসাময়িক কালে বিপরীত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। 'চাচনামায়' উক্ত হয়েছে যে সিন্ধুদেশের রাজার পুত্র মুসলমান হয়ে পুনঃ হিন্দু হয়েছেন। কোন ভারতবাসীকে তুর্কীরা মুসলমান করলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে তারপর স্বীয় ধর্মে ও সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে হ'ত। পুনঃ খাস বাঙ্গলার রঘুনন্দনের পূর্বেকার দৃষ্টান্ত রাজা গণেশ। রাজনীতিক কারণবশতঃ তাঁহার পুত্রকে মুসলমান হওয়ার পরে সেই রাজনীতিক কারণ অপসারিত হলে যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পুনঃ হিন্দু করা হয়েছিল বলে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর স্বাধীন চালুক্য রাজার ব্যবহারসচিব ছিলেন। কাজেই স্বাধীনজাতিসুলভ ছিল তাঁহার ব্যবস্থিত সামাজিক ব্যবস্থা। আর রঘুনন্দন পরাধীন জাতির একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত কোন জাতির রাজনীতিক আদর্শ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রেণীস্বার্থ তাঁহাকে অন্ধকারে ফেলেছিল। পুনঃ যেসব ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের আহারের গন্ধ শুঁকলে বা তাহার দ্বারা কোন ব্রাহ্মণের গাত্র স্পর্শ হলে জাতিচ্যুত হবার এবং তজ্জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হবার ব্যবস্থা হত তিনি কি সেসব শাসক-পাদপদ্মসেবী স্বজাতিদ্রোহীদের···প্রবাহে নিমজ্জিত হয়েছিলেন ? আজকাল কেহ কেহ তাহা সন্দেহ করেন (হিন্দু-মিশন পত্রিকায় অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অতীতের রাজনীতিক আজ ধরবার উপায় নেই। হয়ত বিজাতীয় শাসন-কর্তারা হিন্দুসমাজ ব্যবস্থাপকদের উপর এমন চাপ দিতেন যাতে এসব সমাজের অহিতকর ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দুটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য।

লেখকের বিশেষ বন্ধু কলিকাতার খৃষ্টান-পাদরী পরিচালিত কোন কলেজের এক অধ্যাপক নিম্নলিখিত সংবাদ লেখককে জানান। ত্রিবাঙ্কুর থেকে আগত তাঁহার সিরিয় খৃষ্টিয়ান ছাত্র তাঁহাকে জানান যে পূর্বে এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ হিন্দুবংশ-সম্ভূত বলে হিন্দুসমাজেই থাকতেন। কিন্তু তাহারা নিজ নিজ পৈতৃক সমাজে থাকত। ফলতঃ বিষ্ণুভক্ত হিন্দু, শৈব হিন্দুর ন্যায় খৃষ্টভক্ত বলে সিরিয় খৃষ্টানেরা পরিগণিত হতেন। এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যানুসারে খৃষ্ট-শিষ্য সাধু টমাস্ তাঁহাদের খৃষ্টান করেন। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকে এঁরা দক্ষিণ ভারতে আছেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা তাঁহাদের হিন্দু সমাজ থেকে বিভক্ত করে দেয়। পুনঃ অনেককে ইংরেজ পাদরীরা...মণ্ডলীভুক্ত করে লয়। এতদ্বারা তাহারা ইংরেজী আইনের অধীন হয়। সাধারণতঃ হিন্দুরাজা প্রজার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় নাই। রাজা কিন্তু সমাজের

পরিচালক। হয়ত তৎকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সামাজিক কারণে মিতাক্ষরার এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল। আমরা আজ ইহার কারণ নির্ধারণ করতে অক্ষম। পুনঃ একটা গল্প বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় নানাভাবে প্রচলিত আছে যাহা বাঙ্গলার প্রথম মুসলমান যুগের সামাজিক অবস্থার উপর আলোক সম্পাত করবে। একদা এক হিন্দু মুসলমান হয়। কিন্তু সে তাহার পৈতৃক বাটীতেই পূর্বের ন্যায় থাকত এবং সমাজেও মেলামেশা করত। পরে তাহার মোল্লাগুরু এসে দেখে যে সে তার পূর্বের সামাজিক পরিবেষ্টনির মধ্যেই রয়েছে। তখন মোল্লাজী বললেন, যেহেতু তাহার সমাজের লোকেরা তাহার সহিত আহারাদি করেছে সেইহেতু তাঁহারাও মুসলমান হয়ে গেছে। মোল্লাজী এই ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বিষয়টি স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তাকে জানায় এবং সেই গ্রামের সব লোকই মুসলমান বলে গণ্য হতে থাকে। অনুরূপ গল্প ঢাকার সোনারগাঁয়ও প্রচলিত আছে। এই কাহিনী জনৈক ইংরেজ লিখিত পুস্তকেও লিপিবদ্ধ আছে।[১]

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার পার্থক্য এবং রঘুনন্দনের ব্যবস্থার অপকারিতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন দেশমান্য নেতা ৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করে পুনঃ "হিন্দু" হন। তাঁহার আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। ইহার পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে উক্ত মণ্ডলীর সন্ন্যাসী (monk) হন। কিন্তু তিনি হিন্দুর ছুঁৎমার্গীয় আচার-ব্যবহার কখন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ভারতীয় সাধুর পোষাক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও মস্তক মুণ্ডন করতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাঁহার এই ভাব ক্রমে মনে উদয় হয় যে ভারতে বেদান্তের উপর খৃষ্টধর্মের ভিত্তি স্থাপন না করলে এই ধর্মের প্রসার অসম্ভব (ইহা লেখকের স্বকর্ণে শ্রবণ করা)। তিনি এই মত প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু ইহার বিপরীত ফল হল। তিনি রোমান ক্যাথলিক বিশপ কর্তৃক ধর্মমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হন। এ'কথা তিনি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেছিলেন। লেখক

১। Romance of an Eastern Capital. ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদের পুস্তকে রাজপুত-স্থানে হিন্দুরা মুসলমানের কন্যা বিবাহ করত বলে বর্ণিত আছে। সম্রাট হুমায়ুন তা বন্ধ করে দেয়। পূর্ব-পাঞ্জাব পবতে তদ্রূপ বিবাহ হত। আওরঙ্গজেব তা' বন্ধ করে দেয়। এ'সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকারের History of Aurangzeb ও আবদুল হামিদ লালাজীর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

তখন সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে তিনি দৈনিক "সন্ধ্যা" পত্রিকায় সম্পাদকরূপে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন এবং চরমপন্থী দলের একজন নেতা হন। তাঁহার চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র সেন থেকে রোমান ক্যাথলিক বিশপ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রভাবের আবর্তের মধ্যে পড়েও তিনি যে বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরাম ঠাকুরের সন্তান তাহা কখন ভুলতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে তাঁহার খুল্লতাত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে "সন্ধ্যা" পত্রিকায় বংশাবলী আলোচনা দ্রষ্টব্য। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা (chair) তিনি করান। কিন্তু ভারতীয়দের আর্থিক আনুকুল্যের অভাবে তাহা সফল হয় নাই। যাহা হউক, জাতীয়তাবাদ প্রচারকার্যে তিনি অনেকস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হতেন। লোকে তাঁকে "জেসুইট্" অর্থাৎ গুপ্ত রোমান ক্যাথলিক চর বলে সন্দেহ করত। তাঁর মৃত্যুর পর 'সন্ধ্যা'র ম্যানেজারের মোকদ্দমার আসামীর উকিল[১], আদালতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তিনি Jesuit। বোধহয়, এসব কারণেই প্রপীড়িত হয়ে তিনি সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে পণ্ডিতাগ্রণ্য পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থায় গঙ্গাস্নানান্তে "স্বধর্মত্যাগ" মন্ত্র উচ্চারণ করে পুনঃ হিন্দু হন। কিন্তু রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করেন। ব্যবস্থা প্রদানকালে তর্করত্ন মহাশয় লিখেছিলেন 'ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ হলেও বিনামূল্যে এরূপ ব্যবস্থা দিতে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বীকার করবে না। আমি শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞাত হয়েই আপনাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা প্রদান করছি' শ্রীপঞ্চানন দেবশর্মণঃ[২]। পরে উপাধ্যায় মহাশয়ের খ্রীষ্টিয়ান শিষ্য রেবাচান্দ ওরফে অনীমানন্দ কলিকাতায় এসে তাঁহার গুরুর

১। এই বিষয়ে লেখকের দ্বিতীয় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ও 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বোধগম্য করি যে রঘুনন্দন এবং মুসলমানযুগের নিবন্ধকারদের দ্বারা হিন্দু-সমাজেব কি গভীর ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। পুনঃ ইহাও বিশেষ-ভাবে ভাববার কথা যে শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনন্দনের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁহার জন্য গোপালভট্ট ও সনাতন গোস্বামী কর্তৃক 'হরিভক্তিবিলাস' নামক পৃথক 'নব্যস্মৃতি' প্রণয়ন করান। তাহাতে সতীদাহ, নিরম্বু উপবাস, কলিতে দুই বর্ণ, এসব অদ্ভুত ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে উপবাস ও একাদশীর কথা আছে বটে কিন্তু নিরম্বু ব্যবস্থার উল্লেখ নেই।

২। Animananda: Life of Upadhyaya Brahmabandhav.

স্বধর্মত্যাগের বিষয় অনুসন্ধান করেন (তর্করত্ন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব', পৃঃ ১১৩)।

রঘুনন্দনের তৃতীয় ব্যবস্থা ঃ বাঙ্গলার অ-ব্রাহ্মণদের জন্য একমাস অশৌচ গ্রহণ বিধান। তাঁর মতে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্র! তার শুদ্ধিতত্ত্বে (৭১) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণগত বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয় নাই। শূদ্রের পক্ষে একমাস অশৌচ ব্যবস্থা দিয়েছেন (৭০)। কিন্তু ভারতের অন্যত্র অ-ব্রাহ্মণদের চার দিনের অশৌচ এবং বাঙ্গলার ন্যায় হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা নেই। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে শূদ্রের পক্ষে একমাস অশৌচের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অন্যত্র বার দিনই অশৌচ পালিত হয়।

তৎপর রঘুনন্দনের নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা কত ভীষণ নিষ্ঠুর ও পীড়াদায়ক তাহা অবর্ণনীয়। এই ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দু-বিধবা বৃদ্ধা হলেও তাহার অন্তিম কাল পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস করবার অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই বিধান কি ধর্মপালন জন্য না বাঙ্গালী হিন্দুকে নানা প্রকারের পীড়া দিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রদান করা হয়েছিল? এসব ব্যবস্থা যতই কাল্পনিক উচ্চাদর্শ সম্মত (ideational) হউক না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বাঙ্গালী হিন্দুর ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এ-সবের ফলেই যে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে—এ'কথা আজ অস্বীকার করলে চলবে কেন? ধর্মের এবং আধ্যাত্মিকতার নামে হিন্দুসমাজ স্ব-জাতি ও সমাজদ্রোহী পৈশাচিক লীলা চালিয়েছিল বা এখনও উহা চলছে। ইহা নিরাকরণ করবার সময় কি স্বাধীন ভারতে এক-জাতীয়তা গঠনকামীদের আসে নাই? আশী বৎসরের বা ততোধিক বৃদ্ধার জন্য নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা যে শাস্ত্রসম্মত নয় তাহার উদারনীতিক পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং সনাতনপন্থীয় পঞ্চানন তর্করত্ন ও অন্যদের সহিত তর্কে ধরা পড়ে।[১] পুনঃ ষাট বৎসরের উপরের বয়সের লোকের উপবাস নাই, এ'কথা তো স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং লেখককে বলেছিলেন।

১। যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'বিধবার একাদশী'—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৭। তর্করত্ন মহাশয় অনীমানন্দকে উভয় ব্যবস্থার পার্থক্য বুঝিয়ে বলেন, উপাধ্যায়কে মিতাক্ষরা মতে প্রায়শ্চিত্ত করান হয়েছে। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী মহোদয়ও অনীমানন্দকে বিধান প্রদান করেন। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা যে জাতীয়তা-বিরোধী তাহা তকরত্ন মহাশয় জেনে এবং ভালরূপে বুঝেই মিতাক্ষরা মতে উপাধ্যায়কে কালীঘাটে সর্ব সমক্ষে শুদ্ধি-করণান্তর পুনঃ হিন্দু করেন। মিতাক্ষরার বিধান দ্বারা উপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় নিজেকে জাতিতে হিন্দু বলে (ethnically a Hindu) পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তাঁহার অন্তরের ধর্ম-বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন তাহা নিয়ে কেহ মাথা ঘামায় নি। অবশ্য তিনি একবার লেখককে বলেছিলেন,

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় যে স্ব-সমাজে প্রবেশ করা যায় তাহা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী হাঙ্গামায় যেসব হিন্দু মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিল সমাজে তাঁদের পুনঃ গ্রহণ করার জন্য কলিকাতার সাতজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রকাশিত ব্যবস্থাপনা বা বিধান থেকেই প্রমাণিত হয়।

উপবাসতত্ত্ব সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা প্রয়োজন। এই প্রথা আজ বাঙ্গলার হিন্দু বিধবার পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক হয়ে আছে। উপবাস প্রথা সকল প্রাচীন ধর্মেরই অঙ্গ হয়ে আছে। ইহা ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার একটি অঙ্গ। কৃচ্ছসাধনের উদ্দেশ্য শারীরিক সংযম অর্জন করা। অনুমিত হয়, উক্ত উপায়ে উহা বৈদিকজাতির বংশধরদের মধ্যে আসে। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে ইহাই মনে হয় যে উপবাস ধর্মসাধনকারী ব্রহ্মচারী যতি ও সন্ন্যাসীদের পক্ষে অবশ্য করণীয় (ব্রত)। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। সনাতনী স্মৃতিসমূহেও উপবাস করার বিধান আছে। এসব পুস্তক পাঠে ইহাই হৃদয়াঙ্গম হয় যে উপবাস পালন করা ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ ও সোপান। সেজন্য সাম্প্রদায়িক স্মৃতি ও পুরাণসমূহে উপবাস পালন বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পুনঃ ইহাও দৃষ্ট হয় যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পুরাণ ও ধর্মপুস্তকসমূহে উপবাস পালন ধর্ম সাধনার একটি অঙ্গ এবং শ্রীহরির অনুজ্ঞায় হরিবাসরে উপবাস পালন করার উপদেশ আছে। কিন্তু বৈদিকযুগের পরে ঋক্‌বেদের অর্থ ব্যাখ্যাকালে যাস্ক তাঁর 'নিরুক্ত' নামক পুস্তকে উপবাস বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তৎপরের ধর্মসূত্রসমূহে উপবাস পালনের বিধির উল্লেখ আছে। বৌধায়ন সূত্র হচ্ছে তিনখানি সর্ব প্রাচীন স্মৃতির অন্যতম। ইহা বৈদিক পরবর্তী ও মধ্যযুগের পূর্বে বা সমকালীন সময়ে লিখিত হয়। ইহা ব্রহ্মমান বিধান দিতেছেন ঃ

"উপবাসেত্বশক্তানামশীতেরূর্দ্ধজীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্যমাহ বৌধায়নুবাচ।"

এতদ্বারা দৃষ্ট হয় অশীতিবর্ষের উপর বয়স হলে উপবাসের দিন একবার ভাত খেতে পারবে। পুনঃ এই স্মৃতি বলে ঃ

"কিঞ্চৎ ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকং শরীরীনাম্। ত্রিংশদ্বর্ষাধিকা-নাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনায়।"

"আমি যীশুখ্রীষ্টকে কখনও ভগবানের অবতার বলি নি।" তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন গণ্যমান্য নেতা বলে খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যুর পর দেশের লোক অত্যন্ত সম্মানসহকারে তাঁহার শব বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নিমতলা শ্মশানঘাটে এনে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

ইহার অর্থ, যারা ব্যাধিগ্রস্থ যাদের দেহ পিত্তপ্রধান এবং বয়ঃক্রম ত্রিংশ-বর্ষের অধিক তাঁরা রাতদিন ভোজন কল্পনা করবেন। হরিভক্তিবিলাসধৃত বচন (১২।৩৭)।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে একাদশীর ব্রতপালন দিবসে জল ও ফলমূল খাবে কিনা সে-বিষয়ের কোন উল্লেখ বৌধায়ন করেন নি। আশীবৎসরের উপর বয়স হলে দিনে একবার ভাত খেতে পারবে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নানা প্রকারের উপবাস ব্রত পালনের ন্যায় একাদশীর উপবাস পালনও ধর্মের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। পুনঃ উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম বিধানের সংশোধনী প্রস্তাবরূপ নিয়ম পরের শ্লোকে বৌধায়ন বলেন যে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং যার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হয়েছে তারা রাত্রিকালে ভোজন করবে। এস্থলে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম। বৌধায়ন স্মৃতি ও তৎপ্রসূত আইন আজও বোম্বাই অঞ্চলে জীবন্তরূপে কার্য করে যাচ্ছে। মৌর্যপূর্ব যুগের স্মৃতিকে অবহেলা করতে পারা যায় না। এই শ্লোক অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী পুস্তক 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে। রঘুনন্দন ইহা এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষোক্তের টীকাকার চৈতন্য শিষ্য সাকর মল্লিক ওরফে সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সনাতনীয় মতের সহিত মিল বজায় রাখবার জন্য এক অদ্ভুত টীকা দিয়ে আশী বৎসর পর্যন্ত উপবাসের সীমা নির্ধারিত করেন। তিনি বলেন, এস্থলে ত্রিংশবর্ষের অধিক বলতে আশী বৎসরের বা নবতি বৎসর বুঝাবে অর্থাৎ ষাট বৎসর পর্যন্ত মানুষের উত্তম বয়স বলে গণ্য হওয়া উচিত এবং গৃহাশ্রমে বাসের উপযুক্ত বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ ; সুতরাং উহার অধিক ত্রিংশবৎসর বর্ষ বুঝতে হবে।

তা'হলে ৬০ + ৩০ = ৯০ অথবা ৫০ + ৩০ = ৮০. কিন্তু টীকাকারের এই কষ্টসাধ্য কাল্পনিক ব্যাখ্যা কি করে গ্রহণ করতে পারা যায়—ইহা অযৌক্তিক এবং মূলের অর্থবিরুদ্ধ। অন্যদিকে বৌধায়ন নিজে বৈদিক সাহিত্য হ'তে একটি শ্লোক তাঁর স্মৃতিতে উদ্ধৃত করেছেন যার অর্থবোধ এস্থলে প্রয়োগ করলে পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ দাঁড়ায়। শ্লোকটি এরূপ "জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ অগ্নিনাম দধিতা ইতিশ্রুতি"। ইহার অর্থ, যার পুত্র হয়েছে এবং মাথার চুল কাল অর্থাৎ পূর্ণ যুবক সেই গার্হস্থ্য অগ্নি রক্ষা করবে। প্রাচীন বৈদিককালে ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। তজ্জন্য খাদ্য-নিয়ম, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতিতে নানা প্রকারের কড়াকড়ি নিয়ম পালন করবার আদেশ ছিল।

উপবাস প্রভৃতি ব্রত জীবনের এই সময়ের ভিতর নিশ্চয় পালন করা হত। তৎপর ছাত্রজীবন সমাপ্তির সমাবর্তনের শেষে শিক্ষার্থী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে। পুত্রের পিতা হয়ে ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স হলে তার উপবাস ব্রত উৎযাপনকালে শিক্ষার্থী রাত্রে অন্নাহার করতে পারেন। উক্ত শ্লোক সবর স্বামীর ভাষ্যে এবং কুমারিলের তন্ত্রবার্তিকাতেও উদ্ধৃত হয়েছে।

এস্থলে কথা উঠে, একাদশী ব্রতপালনকালে নির্জলা উপবাস করা প্রয়োজন কিনা এবং সে বিষয়ে কি বিধান আছে তাহাই লক্ষ্য করবার বিষয়। রঘুনন্দন একাদশী নিয়ম বিষয়ে বলেন "বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হয়ে সাতবার কৃষ্ণের নাম করবে।" তৎপর মধ্যযুগীয় বিভিন্ন পুস্তক থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে পরে পরে কি করতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। নিরাহার হয়ে পুণ্ডরীকাক্ষকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে। তৎপর সেই পাত্রের জল কিঞ্চিৎ পান করবে। যেমন স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে "উপবসন্ত সঙ্কল্প্য মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।" পুনঃ কালমাধবীয়ে কাত্যায়নের উদ্ধৃত বচন বলে "উপবাসফলং প্রেপ্সুর্ন পিবেৎ পাত্রগতং জলং।" তৎপর অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা করবে। ব্রহ্মপুরাণ মত তিনি উদ্ধৃত করছেন ঃ পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য উপহার দ্বারা বহুবিধ জপ হোম প্রদক্ষিণ করে এবং নানাবিধ স্তোত্র স্তব গীত-বাদ্যাদি দ্বারা বিষ্ণুর উপাসনা করবে।

রঘুনন্দন বিষ্ণুপূজার বিধান উপদেশ করবার পর দ্বাদশীর বিষয়ে ভবিষ্য-পুরাণের মত উদ্ধৃত ক'রে নিয়ম পালন বিষয়ে বলেন, একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতেও বিষ্ণুপূজা করবে। এস্থলে আহারের কড়াকড়ি নিয়ম নিবন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হতে উদ্ধৃত ক'রে ব্যবস্থা দিতেছেন।

একাদশী উপবাসব্রত নানা প্রকারের আছে। বিভিন্ন পুস্তকে ঐ দিন আহার না করার কথাই বলা হয়েছে। "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়োরপি।" ইহার অর্থ, দুই পক্ষে দু'টা একাদশী তিথিতে আহার করবে না। আবার একাদশী পালনে অশক্ত হ'লে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের নির্দেশিত অনুকূল ব্যবস্থাও রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

মনু বলেন, "বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ। আপৎসু মরণাদ্ভীতৈর্বিধিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ। প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোহনুকল্পেন বর্ততে। ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্মতের্বিদ্যতে ফলম্।" ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে প্রথমোক্ত লোকেরা যারা মরণভয়ে ভীত তারা প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস পালন করবে। তৎপর উদ্ধৃত হতেছে কালবিবেকধৃত বরাহপুরাণ ঃ 'উপবাসাসমর্থস্তু

কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রয়োজয়েৎ।' অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ আহার করবে। ইহা একাদশী উপবাসকে অবলম্বন। তৎপর নারদীয় হতে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ অনুকল্পোনৃনাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি। মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভম্। নত্বেবং ভোজনং কশ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতম্। ক্ষীণ লোকদের জন্য অনুকল্প বিধান উক্ত হয়েছে। পুনরায় বায়ুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত হতেছে ঃ উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষং প্রকল্পয়েৎ। ন দুষ্যত্যুপবাসেন উপবাসং ফলং ভবেৎ। নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম্। যং পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ।

তৎপর উক্ত হতেছে ঃ উপবাসনিষেধস্তু অসামর্থ্যাদপীতি। তত্রাপি হবিষ্যাদিরনুকল্পঃ। অত্র সর্ব্বত্র তুলসীং ভক্ষয়েৎ। অতপর গরুড়পুরাণ হতেও তুলসী পাতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে (একাদশীতত্ত্ব)।

এর পর অনুকল্পের অতিরিক্ত (অনুকল্প অতিরিক্তং) ব্যবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত আছে ঃ 'উপবাসাসমর্থশ্চেদেকং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।' যে উপবাসে অসমর্থ সে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে (একাদশীতত্ত্ব)।

এসব বিধানের সারমর্ম এই, যে উপবাস করতে পারবে না সে অনুকল্প (substitute) অর্থাৎ উপবাসের পরিবর্তে কিছু খাবে। তাও করতে অসমর্থ হলে, অনুকল্পেরও বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল অন্তত একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। ইহা নরতাত্ত্বিক sympathetic magic-এর ন্যায়।

এই দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা এই তথ্য পাই যে একাদশীর উপবাস পালন করা বৈষ্ণবদের একটি অবশ্যকরণীয় ব্রত। রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' এবং গোপাল ভট্টের 'হরিভক্তিবিলাস' উভয় পুস্তকেই বেশীরভাগ বৈষ্ণবগ্রন্থ হতে উপবাসের সমর্থন করা হয়েছে। রঘুনন্দন গোড়াতেই বরাহপুরাণ উদ্ধৃত করেছেন—"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।" তা'হলে নিরাহার একাদশীব্রত মহৎ বৈষ্ণবধর্ম।

তারপর দশমী দিনের নিয়ম সম্পর্কে "সুরিসন্তোষ" গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ "কাংস্যং মাসং মসুরঞ্চ চনকং কোরদুষকং শাকং পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন স্ত্রিয়ম্।"

এস্থলে যেসব পুস্তকের নামোল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপবাসের আগের দিনের খাবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য বিধবার মুসুর ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ

হয়েছে। এ'প্রকারের স্ত্রীলোকের, অহিংসাবাদী জৈন ও বৌদ্ধদের অনেক আচার সম্ভবতঃ বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করেছে। আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থেও রঘুনন্দনোক্ত শ্লোক পাই। স্মৃতিতে বলা হয়েছে, "শাকং মাষং মসূরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে। দ্যূতমত্যাম্বুপানঞ্চ দশম্যাং বৈষ্ণবস্ত্যজেৎ।" কিন্তু শাক্তদের মসুরডালে আপত্তি নেই।

উপবাসের দিন মসুরডাল খাবে না। ইহা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু অনেকেই ইহার উল্টো বোঝেন।

তারপর হবিষ্যান্ন কাকে বলে সে বিষয়ে স্মৃতি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলা। কলায় কসুনীবায়া বাস্তুকং হিলমোচিকা। ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী। কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য গুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্কং সুরয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে" (একাদশীতত্ত্ব)।

কিন্তু আমরা জানি যে অন্য সকল প্রদেশে বাঙ্গলার মত হবিষ্যান্নের প্রথা নেই। যেখানে ধান জন্মায় না, আটা বা ভুট্টা গম জন্মায় তথাকার হিন্দু কি প্রকারে এই নিয়ম পালন করবে? এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে উদ্ধৃত শ্লোক কোন স্মৃতির অন্তর্গত, তার নামোল্লেখ নিবন্ধকার করেন নি। ইহা নিশ্চয়ই মধ্যযুগের পরে পূর্ব-ভারতে লিখিত হয়েছিল।

পুনঃ মহাভারত হ'তে শ্রীকৃষ্ণের বচন উদ্ধৃত ক'রে নিবন্ধকার রঘুনন্দন বলেছেন, 'নিত্যমেতদ্‌ব্রতং নাম কর্ত্তব্যং সার্ববর্ণিকং'। অতএব ধর্মব্রত সকল বর্ণের করণীয়। কিন্তু আমরা আজ জানি বর্তমানে মহাভারত যে-রূপ ধারণ করেছে (পাঞ্চরাত্র—বৈষ্ণবধর্মের পুরাতন নাম) তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত দ্বারা ভারাক্রান্ত। শেষে রঘুনন্দন বলেছেন, "অতএব এক ভক্তাদাবপি পূর্বপর দিনয়োরেকভক্তাদিকো ধর্মঃ কার্য।" ইহার তাৎপর্য, উপবাস দিনে ভক্তা (অন্ন) খাবে না। তৎপর "ভক্ত" জিনিষটি কি তার ব্যাখ্যা নিবন্ধকার স্কন্দপুরাণ হতে দিতেছেন ঃ "দিনার্দ্ধ সময়েহতীতে ভুঞ্জ্যতে নিয়মেন যৎ। একভক্তমিতি প্রোক্তং রাত্রৌ তন্ন কদাচন ইত্যনেনাভিহিতং।" এতদ্বারা বুঝা যায়, মধ্যাহ্ন-ভোজনকে ভক্ত বলে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ভাতকে ভক্তা বলে। অমরকোষেও এই অর্থ দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে অশক্তের পক্ষে রঘুনন্দনের নিজের ব্যবস্থা ঃ একাদশী উপবাসে অসমর্থের পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা, এমন কি, হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা পর্যন্তও বিহিত এবং গ্রাহ্য হবে, কিন্তু নিরম্বু উপবাসই প্রশস্ত।

অবশ্য বৌধায়ন প্রভৃতি যখন উপবাসব্রতের উল্লেখ করেছেন তখন নিঃসন্দেহে ইহা একটি প্রাচীন ব্রত, যদিচ গৃহ্যসূত্রাদিতে এর কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য পরে ইহা ধর্মসাধনার অঙ্গ হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় কাত্যায়ন বলেন, "ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হয়ে উপবাস করাই মানবের পক্ষে বিহিত।" দেবলও বলেন, নিরন্তর ব্রত বিষয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন, হিংসাত্যাগ, সত্যকথা প্রয়োগ, আমিষ ত্যাগ—এই চতুর্বিধ নিয়মের অনুগামী হতে হবে ধর্মার্থী বা সাধককে (হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত ১৩।২৬)।

আবার দেবল বলেন "দন্তধাবন, তাম্বুল দিবা স্বাপচ্চ মৈথুনাৎ। অসকৃজ্জল পানাচ্চ নোপবাস ফলং লভেৎ" (ঐ, ১৩।২২)। ইহার অর্থ, দাঁত মাজা, তাম্বুল ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও পুনঃ পুনঃ জলপান উপবাসের উদ্দেশ্য ও ফল ব্যর্থ করে।

উক্ত শ্লোকে দু'টি তথ্য পাওয়া গেল। দাঁতন করা বা দাঁত মাজা কার্যটি উপবাসের দিন করতে নেই। ইহা আহারের মধ্যে গণ্য হয়; এতে পেটে কোন জড়বস্তু যেতে পারে বলে ভয়। সেজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ জলপান নিষেধ করেছেন। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে দেবল আবার অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে লোকে উপবাসের দিন জলপান করত বা করতে পারে।

এ'সব উক্তি থেকে আমরা একাদশীর উপবাসকে ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গ বলে ধরে নিতে পারি। মনুষ্যজন্ম লাভ করলেই বা বিধবা হ'লেই যে উপবাস করতে হবে এমন কথা এ'সব উক্তি থেকে বোধগম্য হয় না। তবে বৈষ্ণবস্মৃতিতে নির্জলা একাদশী নামে একটি বিশিষ্ট ব্রতের কথা উল্লিখিত আছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' বলা হয়েছে, পূর্বে একাদশী নিয়ম বর্ণন প্রসঙ্গে দশমীর নিয়মাদি সম্বন্ধে যে-যে বিষয় কথিত হয়েছে সেই প্রণালীতে সংকল্পপূর্বক জলগ্রহণ করতঃ (বক্ষ্যমান) মন্ত্রদ্বারা নিয়ম গ্রহণ করতে হয়। মন্ত্র যথা, একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জয়িষ্যামি বৈ জলম্। কেশব প্রার্থনীয় অত্যন্ত দমলেন চ, বর্জয়চপঙ্খহোরাএং বিনাচাচমনার্থকম্ বিনা চ প্রাশন পাদোদক অগত্যম পরিসহ, (১৫।১৯-২০)। এর তাৎপর্যার্থ "আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে শ্রীহরি প্রীত্যর্থে একাদশীতে উপবাসী থাকিব, জলমাত্রও গ্রহণ করিব না। আচমনার্থ জলপান ও অতি বিশুদ্ধ চরণোদক পান ভিন্ন দিবারাত্রি মধ্যে অন্য জলপান পরিত্যাগ করিব"।[১] এক্ষণে কথা উঠে "চরণোদক কাহার"? পুনরাচমনের জলের পরিমাণ যতই কম হোক এবং পাদোদকের পরিমাণও যতই কম হোক না কেন

১। লেখকের বৈষ্ণবসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

তাহা "নিরম্বু উপবাস" অর্থে আজ বাঙ্গলায় যাহা বুঝা যায়, তাহার বিরুদ্ধ হয় না কি? এ'সব উক্তির দ্বারা আমরা এই বুঝি যে উপবাসব্রত ধর্মের একটি অনুষ্ঠান ছিল। ইহা আর্য-ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল। পরে জৈন সাধকেরা ইহা অতি কঠোর ক'রে তোলেন। পুনঃ বৈষ্ণবেরা ইহা ধর্ম পালনের অঙ্গ বলে মনে করেন, কিন্তু শরীর পীড়নের উপায় বলে উহা গ্রহণ করেন নি। উপবাসের দিনে অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছেন। শক্তি উপাসকদের মধ্যে ইহা নাই। অবশেষে নিবন্ধকার রঘুনন্দনের ন্যায় নব্য-স্মার্তদের পাল্লায় পড়ে নিরম্বু উপবাস বিধবার অবশ্য পালনীয় বলে নির্দিষ্ট হয়। আর রাঢ়দেশেই ইহা প্রচলিত হয়। বিশেষতঃ অ-বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কথিত হয়, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং নবশায়ক জাতিদের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি উপাসক। তাঁদের পরিচালনাথ রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি ব্যবহৃত হয়। কায়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীর বিধবাগণ নিরম্বু উপবাস পালন করতে বাধ্য। বাল-বিধবা হলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা হিন্দুসমাজে সংখ্যায় চারি-ষষ্ঠাংশ তাঁরা হরিভক্তিবিলাসানুযায়ী অনুকল্প করেন। কিন্তু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ঘরের বিধবাগণ নিরম্বু উপবাসকে সমধিক আভিজাত্য বা মর্যাদা দেন; কারণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ইহা পালন করেন। কিন্তু বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনুকল্প ব্যবস্থা প্রদান করেন। উত্তরবঙ্গেও শোনা যায় তদ্রূপ। শ্রীহট্টে পুরাতন স্মৃতির বিধানই আজও বলবৎ।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, রঘুনন্দনের মত সমগ্র বাঙ্গলা গ্রহণ করেন নি! এক্ষণে কথা এই, হিন্দুর স্বাধীনতার অন্তর্ধানের পর কে এসব নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করল? স্বাধীন সময়কার ভবদেব ভট্টের বিধি পূজাপাঠে আজও চলছে। তারপর স্বাধীন নরপতি দনুজমর্দনদেবের বঙ্গজ কায়স্থদের সমীকরণ-কালে মৈথিলী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র পৌরোহিত্য করেন। তাঁর বিধান সমগ্র বাঙ্গলায় চলত বলে কথিত আছে। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে এই পুরাতন স্মৃতি-এখনও চলে: আর মিথিলার শূলপাণি পশ্চিমবঙ্গে বাস করে একখানি স্মৃতি পুস্তক লিখেন। তাতে তিনি শারদীয়া এবং বাসন্তী উভয় ঋতুতেই দুর্গাপূজার ব্যবস্থা দেন। ৺পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, তাঁর স্মৃতিতে সান্নিপাত দোষ নেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছোঁয়াছুঁয়ির বাড়াবাড়ি নেই। অসবর্ণ বিবাহের সন্তানদের কথা উল্লেখ আছে। ইনি রঘুনন্দনের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে আবি-র্ভূত হয়েছিলেন।[১] ইত্যবসরে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। পুনঃ রাজা

১। এ সম্বন্ধে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় দ্রষ্টব্য।

যত্ন ওরফে সুলতান জেলালুদ্দিনের রাজপণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট "স্মৃতিরত্নহার" নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু আমরা উপস্থিত দেখতে পাই "হরিভক্তিবিলাস" এবং "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" সমাজে বলবৎ।

এই প্রভাবের হেতু কোথায়? ৺শাস্ত্রী মহাশয় বলে গেছেন যে বাঙ্গলায় পুরাতন কায়স্থ রাজা ও জমিদারেরাই ইহা প্রচলিত করেন। তাঁরাই বরাবর ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক হন এবং তজ্জন্য ববাবর সংস্কারকদের চয়ন করেন যদিচ বাঙ্গলার নব্য-স্মৃতিসমূহে তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হয় নি।

হিন্দুর পরাধীনতার কালে হিন্দুকে বাঁচাবার চেষ্টার পরিবর্তে পুরোহিত-তন্ত্র শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে সর্বব্যবস্থাবানপ্রবৃত্ত সমাজ পরিচালকের অভাবে নানা প্রকারের বিধি-নিষেধ দ্বারা নিজেদের আভিজাত্য ফাঁপিয়ে বাড়াবার ব্যবস্থা করেন এবং সমাজে নানা প্রকারের বিভেদ সৃষ্টি করেন। এ'সব ব্যাপারে ধনাঢ্য অভিজাতেরা সহায়ক হয়। কথিত আছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে অ-শূদ্র প্রতিগ্রাহী অনাচরণীয় প্রতিগ্রাহী ইত্যাদি নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ধনী যজমানদের তাগিদে সৃষ্ট হয়। উচ্চবর্ণের অভিজাতশ্রেণী তাদের পুরোহিতদের তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের যজমানদের পৌরোহিত্য করতে মানা করেন ইত্যাদি। এই প্রকারেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। পুনঃ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে। এ'সব অভিব্যক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ইহার মূল কারণ যজমানদের বর্ণগত মর্যাদা।

এক্ষণে রঘুনন্দনের বিধানের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা যাউক। এই বিধান মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা ধনতন্ত্রের অনুকূল। রঘুনন্দন দায়তত্ত্ব দ্বারা জীমূতবাহনের আইনের সমর্থন, তৎদত্ত অপুত্রকের বিধবার জীবনসত্ত্বদান ও এবম্প্রকারের বিধবার প্রয়োজনবোধে এই জীবনসত্ত্ব বিক্রয় আইনের প্রতিশোধ "সতীদাহ", বিধবার নিরম্বু উপবাস দ্বারা জীর্ণ হওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা বুনিয়াদিস্বার্থের বিশেষ অনুকূল হয়। ইহার জন্য বাচস্পতি মিশ্র এবং অন্যান্যের ব্যবস্থা নাকচ করে রাঢ়ের তৎকালীন সমাজের শক্তিশালী নেতারা রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বিষয়ের শেষ কথা সমাজের কূর্মবৃত্তি অবলম্বন, ছুঁৎমার্গের কড়াকড়ি, সামাজিক-বর্জ্জন নীতি, পৌরোহিত্য-প্রাধান্য প্রভৃতি জাতীয় আত্মরক্ষা কার্যে সহায়তা করেনি।

এ'সব পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধারণা হয়, তুর্কী-শাসনকাল ছিল মানসিক অন্ধকারের যুগ। এ'যুগের পাণ্ডিতাগ্রগণ্য যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ হ'তে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। উহাতে উপবাসের দিনে

আচমন করার ব্যবস্থা আছে। তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন "স্নান, তর্পণ, শিব, বিষ্ণু ও ইষ্ট পূজায়, দানে এবং শ্রাদ্ধে যে আচমনের ব্যবস্থা আছে ঐ আচমনও সামান্য ভোজনের ভিতরে পড়ে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয় একাদশীর দিনে আচমন-রূপ ভোজন একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

তৎপর তিনি বলেছেন "মাধবাচার্য কালমাধবীয় ভবিষোত্তরে"র নামে এই "একাদশ্যাং ন ভূঞ্জিত পক্ষয়োরুভয়োরপি। ব্রহ্মচারী নারীচ শুদ্ধামেব সদাগৃহী।" 'নারী' বিধবা এরূপ লিখেছেন; রঘুনন্দনের উদ্ধৃত বচনে শুধু "নারী" আছে। সুতরাং "ন ভূঞ্জীত" পদে সামান্যভাব অর্থ না করলে শব্দবোধে সামগ্রী গৌরব হয়। অগত্যা তিনি 'নারী' পদের 'বিধবা' অর্থ করলেন। স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন কিন্তু বহু বিচার করে একাদশীতে ব্রততত্ত্ব সিদ্ধান্ত করেছেন[১]! পুনঃ উক্ত প্রবন্ধে তিনি ৺পঞ্চানন তর্করত্নের "বিধবার একাদশী" নামক পুস্তকের সমালোচনায় বলেছেন "অপুত্র শয়নংভর্ত্তু।"

"অপুত্রং শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তীস্তরৌস্তিতা। ভূঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্ত দায়ভাগ-ধৃত।" কাত্যায়ন বচনের 'ক্ষান্তা' এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় 'ক্ষান্তা পরিমিতাহারেণ ক্ষীণাং' এরূপ লিখেছেন। এরূপ অর্থের সার্থকতা কি? তাঁহাদিগকে অনুরোধ তাঁরা যেন বিধবাদের প্রতি একটু দয়া করে দায়ভাগের পত্যধিকার প্রকরণ একবার পাঠ করে দেখেন যে বিধবা পত্নীর শরীর ধারণে পতির উপকার আছে। ('স্বকীয়া ধারণো পত্যুরূপ-কারত্বাৎ' ইত্যাদি হেতু নির্দেশ আছে দেখতে পাবেন।) পুনঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় একাদশীতত্ত্বধৃত বরাহপুরাণ হতে বলেছেন, উপবাসের পূর্ব দিবসে ও পর দিবসে রাত্রিতে এক-একবার ভক্তা ও মধ্যবর্তী দিবসে দু'বেলা দু'বার, চারবার ভক্তা-ভোজনের নাম উপবাস বিধি। এবং একাদশীতে নিষেধাত্মক বচনগুলির মধ্যে অধিকাংশ বচনে অন্ন শব্দটি আছে। শেষে তিনি বলেছেন, আমরা গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবন রক্ষা ও মৃত পিতার বংশ রক্ষার্থে তথা গর্ভবতী বিধবাটির রক্ষার্থে এবং পরলোকে স্বামীর সুখবৃদ্ধির জন্য প্রসূতির জীবন রক্ষার সহিত জড়িত নবজাত কুমারের রক্ষার জন্য বিধবাকে পরলোকে স্বামীর সদ্‌গতি হবে বলে প্রকারান্তরে অশক্তা বিধবাদিগকে অনুকল্প করাতে যাচ্ছি। আর তর্করত্ন মহাশয় গর্ভরক্ষার জন্য গর্ভবতীকে একাদশীর দিনে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মনে করে এক গণ্ডুষ জল দিতেও নারাজ! কিমাশ্চর্যমতপরম্!

১। যাদবেশ্বর তর্করত্ন—"বিধবার একাদশী", ভারতবর্ষ (১৩২৭ সন, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ)।

এ প্রসঙ্গ থেকে আমরা এই তথ্য প্রাপ্ত হই যে প্রাচীন উপবাস-ব্রত বৈদিক জাতিসমূহের বংশধরদের মধ্যে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। পরে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইহা বড্ড বেশী বাড়িয়ে তোলেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণতঃ নিরম্বু উপবাসের খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। সেজন্য 'অনুকল্প' বিধান তাঁদের আছে। তাই অম্বু তাঁদের বিধানের মধ্যে পড়ে না। কারণ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন, জল ও বায়ুকে বর্জন করা যায় না। গোলমাল বাঁধে বায়ু ও জলকে ভক্ত বা অন্ন অথবা খাদ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য করা নিয়ে। গোঁড়ামী করে জলকে অন্ন মধ্যে গণ্য করার অর্থ, কেবল অক্ষরেযুক্ত শব্দের উপবাস না করা। গোঁড়ারা শব্দের অর্থ ত্যাগ করে অক্ষরবাদকে গ্রহণ করেন। সকল দেশে এবং দায়ভাগের টীকার সর্ব সময়ের পুরোহিতেরা অক্ষরযুক্ত শব্দকে বড় করে দেখেন। তারা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য এবং মানবতার দিক থেকে কোন শ্লোকের অর্থ করেন না। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেই শব্দকে আঁকড়ে থাকেন "কেতাবে লিখা আছে" বলে। যুগধর্মীয় উপযোগিতা, মানবের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি দিক থেকে কোন বিষয়কে গোঁড়ার দল দেখতে অপারগ। অজ্ঞতা অথবা শ্রেণীস্বার্থ তাদেরকে অন্ধকারে রেখেছে। এ'জন্য মানবসমাজে এত বিসম্বাদ। আক্ষরিক অর্থে পূজা করে সভ্যতার পশ্চাৎভাগে অবস্থিত থেকে হিন্দু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

রঘুনন্দনের পুস্তকে আর একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হতেছে যে তিনি শারদীয়া দুর্গোৎসব এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা দিয়েছেন, কিন্তু কালীপূজা সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি (তিথিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। তিনি দীপান্বিতা রাত্রি পালন এবং রাত্রে জুয়াখেলার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই অমানিশার রাত্রে কালীপূজার নামগন্ধটুকুও পর্যন্ত নেই। চড়ক, গাজন প্রভৃতি পার্বণেরও উল্লেখ করেন নি। রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী গোবিন্দানন্দের স্মৃতিতেও এসব পার্বণের এবং শীতলাপূজা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নেই। যখন সাধারণ লোক ঋগ্বেদ ও উপনিষদাদিতে কালীপূজায় সন্ধান করেন তখন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' পুস্তকে হিন্দুর এ'সব পূজার একবারে অনুল্লেখের কারণ কি? তবে কি বৌদ্ধতান্ত্রিক মন্ত্রায়ণীদলের একজটাদেবী, তারা, হারিতী প্রভৃতি দেবী তখনও হিন্দু দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হননি? বৌদ্ধতন্ত্রকে খাঁটী হিন্দুশাস্ত্র করার সর্বশেষ উদ্যোগী ছিলেন রঘুনন্দনের সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, নবদ্বীপের 'পোড়ামাতলার' দেবীমূর্তি, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত এ'স্থানকে আজও 'পাষণ্ডীপাড়া' বলা হয়। ব্রাহ্মণ্য পুস্তকে

'পাষণ্ডী' অর্থে বৌদ্ধ (মনু দ্রষ্টব্য)। 'তেঘোরীপাড়া', 'ছাচ্চড়াপাড়া প্রভৃতি পোড়ামাতলার আশেপাশের স্থানসমূহের নাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এককালে ঐসব অঞ্চল অ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থল ছিল। এ'সব প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে একজটাদেবী তখনও কালীমায়ী হননি, হারিতী দেবী তখনও শীতলা দেবী হননি। কিন্তু হালের মুসলমানী ওলাবিবি এখন ব্রাহ্মণ্য ওলাইচণ্ডী হয়েছেন। 'বনবিবি' এখনও মুসলমানীই রয়েছেন; তিনিও কালে হয়ত হিন্দু হবেন। এরই মধ্যে তিনি হিন্দুর কাছ থেকে পূজা পেতেছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ থাকে যে রঘুনন্দনের পুস্তকে "সত্যনারায়ণ ব্রত" উল্লিখিত হয় নাই। সত্যপীর তখনও সত্যনারায়ণরূপে সার্বজনিনভাবে পূজা পেতে আরম্ভ করেন নি, যদিচ বাদশাহ হুসেন শাহ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নবদ্বীপে বৌদ্ধস্মৃতি বিষয়ে ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন সম্পর্কে শেষ কথা এই, তাঁর বিশ্বকোষীয় বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় আর্যজাতির কৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে বেদকে কার্যত অগ্রাহ্য করে গেছেন। তিনি ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪শ সূত্র হতে 'ইমানারী অবিধবা' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন বটে, কিন্তু শেষের দিকে তাহার 'জাল' পাঠ দিয়েছেন। এ'কথা বলা চলে না যে তিনি বেদের উক্ত প্রকারের ভুলপাঠযুক্ত পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। কারণ সমগ্র ভারতে উক্ত প্রকারের পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিকই ইহা খুব আশ্চর্যের কথা বটে যে উক্ত পুস্তক প্রণয়নের পরে অন্যান্য প্রদেশে নব্যস্মৃতি রচিত হয়। আকবরের সময়ের পরে কাশীশ্বর মিশ্র কর্তৃক 'বীরমিত্রোদয়' নামক তথাকার নব্যস্মৃতি রচিত হয়। আকবরের সময়ে তিনি জীমূতবাহনকে সমালোচনা করেছেন সত্য, তত্রাচ তাঁর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত বা অভিভূতও হয়েছেন। তিনি রঘুনন্দনকে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর ভুল ধরিয়ে দেন নি। তৎপর দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে 'সরস্বতী বিলাস' নামক নব্যস্মৃতি রচিত হয়। বাংলায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা জীমূতবাহনের 'দায়ভাগের' টীকা করেছেন, কিন্তু কেহই এই ভুল ধরিয়ে দেন নি। ইতিমধ্যে পৈশাচিক লীলা অবাধে বাঙ্গলায় চলতে থাকে। ইহা কি 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ্য গতি' নীতি অনুযায়ী অনুসৃত নীতি অথবা ভারতে তৎকালে কেহই বেদ পড়েন নাই।

রঘুনন্দন জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" নামক আইন পুস্তকের প্রতিপাদ্য সমর্থন করেছেন। জীমূতবাহন সতীদাহের উল্লেখ করেন নাই; বরং বিধবাকে পরলোকে তাঁর মৃত স্বামীর কল্যাণার্থ বেঁচে থাকতে বলেছেন।

অপুত্রকের বিধবাকে তার স্বামীর সম্পত্তিতে জীবনসত্ত্ব দান করে গেছেন। সুতরাং এস্থলে সতীদাহের স্থান কোথায়? পুনঃ রঘুনন্দন জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' নামক পুস্তক হতেও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এ'সব কারণে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তিনি বাঙ্গলার ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না।

বর্তমানের অনুসন্ধানের ফলে ইহাও নির্ধারিত হয়েছে যে জীতেন্দ্রিয় নামক জীমূতবাহনের পূর্ববর্তী এক পণ্ডিত অপুত্রক বিধবাকে তার মৃত স্বামীর বিষয়ে জীবনসত্ত্ব ভোগের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এতদ্বারা কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, এই পুরাতন ব্যবস্থাকে এড়িয়ে বাংলার বিধবাকে বিষয়-চ্যুত করবার উদ্দেশ্যেই ইহজগৎ থেকে চিরতরে সরাবার ব্যবস্থা, বনিয়াদীস্বার্থের প্ররোচনায় রঘুনন্দন এক 'জাল' বৈদিক অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন? কারণ বৈদিক সাহিত্য ও স্মৃতিসমূহে সতীদাহের উল্লেখ নাই। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে উক্ত প্রথা আদৌ ভারতীয় আর্য-জাতীয় প্রথা নয়। ব্যাপার বড়ই তিক্ত এবং বাঙ্গলার পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক। কিন্তু সত্যের অপলাপ ক'রে লাভ কি? রঘুনন্দনের সামাজিক ব্যবস্থা বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর হয়েছিল। তাঁর ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দু বাঁচে নাই, অধিকন্তু মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

আমরা যদি ইতিহাসের ভাববাদীয় ব্যাখ্যার আলোকসম্পাত করে এ'সব অনুষ্ঠান দেখি, তা'হলেও এ প্রথার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দুষ্ট-স্বার্থ ধরা পড়ে। আর অর্থনৈতিক বাস্তববাদীয় ব্যাখ্যাতেও সেই স্বার্থ দেখতে পাই। সেজন্য নিশ্চয়ই ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রসূত ফলে স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এ সব অমানুষিক সমাজ-বিধ্বংসী বিধান প্রদান করা হয়েছিল।

বৈদিকযুগের পরবর্তী এবং মৌর্যযুগের মধ্যবর্তীকালে রচিত জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' গৌতমসূত্র থেকে আরম্ভ করে রঘুনন্দন তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের রচনা উদ্ধৃত করে উহার বিকৃত অর্থের মাধ্যমে বনিয়াদী স্বার্থ-দুষ্ট স্বীয় মতের স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। বৈদিক সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র ব্যতীত তিনি তৎকালীন সব সংস্কৃত পুস্তক উদ্ধৃত করেছেন। আশ্চর্যের কথা, তিনি আল্লোপনিষদ উদ্ধৃত করেন নি! বোধ হয়, এই ইসলামীয় জালিয়াতি তখন বিরচিত হয় নি।

আসল ব্যাপার এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আক্রমণশীল মনোবৃত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত পণ্ডিতেরা যাহাই সংস্কৃত ভাষাতে লেখা তাহাই আপ্তবাক্য ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন। ইহার ঐতিহাসিক পারম্পর্য এবং ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। আমাদের পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির

একান্ত অভাব। এ'জন্যই এতসব বিড়ম্বনার উদ্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক আলোচনার বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাবের জন্যই প্রত্যেক সম্প্রদায় বেদের অন্তর্গত বলে স্বীয় মতের একটি উপনিষদ রচনা করেছেন।

বিদেশী বিধর্মীরাও উক্ত উপায়ে উপরোক্ত উপনিষদ রচনা করেছেন। বিদেশীয় খৃষ্টানেরা নূতন বাইবেল থেকে যীশুখৃষ্টের জীবনীর একাংশ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে একসময়ে হিন্দুদের ঠকাতেন। ঐতিহাসিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সমালোচনার মনোবৃত্তি আর আর্যধর্মের অভিব্যক্তি বিষয়ে অজ্ঞানতাপ্রসূত কার্য পাণ্ডিত্য বিপথে নিয়ে গিয়ে, আর্যজাতির বিশেষ ক্ষতি সাধন করেছে।

আজ মধ্যযুগীয় নব্যস্মৃতির বিধানের সহিত স্বাধীন ভারতে জাতীয় আইন প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব চলছে বলেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনকাল হতেই নব্যস্মৃতির সামাজিক শাসন বিষয়ক বিধিসমূহ নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা খণ্ডিত হতেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। কালের প্রবাহ কেহ রুখতে পারে না। নবভারত এবং তদন্তর্গত নয়া বাঙ্গলা নূতন সমাজ গঠন করছে। চক্ষুষ্মান উহা নিরীক্ষণ করছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জনৈক বিশেষ খ্যাতিমান পণ্ডিত 'আল্লোপনিষদ'কে অথর্ববেদের অন্তর্গত বলে স্বীকার করেন (গোপাল বসু মল্লিক 'লেকচার' বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য)। তিনি আরব্য আল্লাহ-এর সংগে সংস্কৃত 'অল্লা' (মাতা) শব্দ সমানার্থক মনে করে উক্ত অত্যদ্ভুত মত প্রচার করেন। বিংশশতাব্দীতে আবার উহার টীকাও বাহির হয়। 'সত্যপীরের পাঁচালী' হিন্দুশাস্ত্রবলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে শ্রাদ্ধের সময় পাঠ করাও হত। বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ কেন বেদের অন্তর্গত হ'ল না তাহা বোধগম্য হয় না। বোধহয়, শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এর সংবাদ রাখে না।

এ'ভাবেই ধর্মের নামে শোষণ ও অত্যাচারের ভার ইংরেজ শাসনের পূর্বের সমাজকে উৎপীড়িত করে দুর্বল ক'রে ফেলেছিল। পণ্ডিতদের দ্বারা লোকের 'জাতি মারা' ইংরেজ শাসকেরা বন্ধ করে দেন (Scheaf Committee's Report দ্রষ্টব্য)। ইংরেজ যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে লোকের চক্ষু উন্মিলিত হতে লাগল। পুরোহিততন্ত্রের শোষণনীতি এবং অজ্ঞতা ক্রমশঃ ধরা পড়তে থাকে। ফলে ধর্মসংস্কার এবং পরে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উদ্ভূত হল। সংস্কারকদের বাস্তব কর্মসমূহকে (অসবর্ণ-বিবাহ) সমাজগ্রাহ্য করাবার জন্য আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হ'ল, এবং অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ করিয়ে উক্ত বিবাহ পদ্ধতি আইনতঃ সিদ্ধ ও গ্রাহ্য করা হয়।

ইতিমধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চতর মানের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের জন্য ইউরোপের ইংলণ্ড ও জার্মানীতে যেতে লাগল। তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গোঁড়া রক্ষণশীল দল ধর্মের ধ্বজা তুলে ধুয়া তুললেন—কলিযুগে সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ। এতদ্বারা অনেকেই জাতিচ্যুত হ'য়ে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন; অনেকে আবার ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। হিন্দুসমাজ এতদ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

কিন্তু যুবকেরা যখন অধিক সংখ্যায় ইউরোপ যেতে লাগল তখন ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ধারানুসারী পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাঁদেরও মতের পরিবর্তনের ফল দাঁড়াল এই যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী বিদেশে যেতে পারে। হিন্দুর ছেলে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সময়ে ইংরেজ রমণী বিবাহ ক'রে দুই পুত্রের পিতা হয়ে শেষে তার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় সমাজভুক্ত হয়।

এরপর স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রচার। সনাতনপন্থীরা ইহার প্রচণ্ড বিপক্ষতাচরণ করেন। কিন্তু উহার বহু পরে তাঁর বিদেশ গমনের জাতীয় তাৎপর্য লোকে উপলব্ধি করতে পারে। ৺বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, তাঁর বিদেশযাত্রা হচ্ছে বিদেশে আমাদের ভারতীয়-কৃষ্টির বিশেষভাবে প্রচার উদ্দেশ্যে প্রথম গমন। এই সূত্র ধ'রে এক্ষণে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্যেরা কৃষ্টিগত[১] প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করছেন।

অতঃপর ইংরেজশাসনকালে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে সরকার বালিকা বধূর স্বামীর সহিত সহবাস বন্ধ করবার জন্য "সহবাস সম্মতি আইন" পাশ করেন। এতে কিন্তু গোঁড়ার দল এক বিশেষ বিরুদ্ধ-আন্দোলন আরম্ভ করে বললেন যে এতদ্বারা হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করা হ'তেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ হ'তে প্রতিবাদ উঠে যে এতে হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। অন্যান্য প্রদেশে বাল্য-বিবাহ সংশোধক ব্যবস্থাও আছে। প্রাচীন পুস্তকেও এই সম্পর্কে নিষেধ-বিধি আছে ('নির্ণয় সিন্ধু' ধৃত অশ্বালায়ন বচন)। অন্যান্য প্রদেশে বালিকা বিবাহ হ'লেই স্বামীর ঘর করতে হয় না। যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে পুনর্বিবাহের (যজুর্ব্বেদ দ্রষ্টব্য) পর বধূ স্বামীগৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু বাঙ্গলায় হয় এর উল্টা, নাবালিকা হয়ে বিভৎস্ কদাচারে পরিণত হয়।

মধ্যযুগীয় তুর্কী আক্রমণের পর নানাকারণে যেসব সামাজিক প্রথা সৃষ্ট হয়েছে সেগুলোকেই সনাতনধর্ম এবং হিন্দুধর্মের আশু ব্যবস্থা বিবেচনা করাতে

১। বিপিনচন্দ্র পাল: "My Life and Time", Vol. II, পৃ: ২৭৪—২৭৭

যতসব উদ্ভট আচার ও মত উত্থিত হয়ে সামাজিক কদাচার সৃষ্টি করে। আর্য-কৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলেই এ'সব বিড়ম্বনার আবির্ভাব হয়। এরপর বিংশশতাব্দীতে অগোত্র বিবাহ যার আজ জীবতাত্ত্বিক অর্থ নেই, আইনসম্মত করা হয়। পুনঃ আইন সভা "গৌড় বিল" গ্রহণ করে হিন্দুমতে অসবর্ণ-বিবাহ আইনত সিদ্ধ করে। এতদ্বারা অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের অবৈধতা ঘুচিয়ে দেওয়া হয়। আবার "সরদা আইন" দ্বারা বালিকা বিবাহ নিরোধ করা হয়। আর একটি আইন দ্বারা অপুত্রক স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর পূর্ণাধিকার প্রদান করা হয়। এই সঙ্গে পিতার সম্পত্তিতে কন্যারও অংশের অধিকার বিষয়ক আইন পাশ করা হয়। আইনে স্ত্রী ও পুরুষ সমান অধিকার পায়। পরবর্তীযুগে যাস্কের সময় হতে এ বিষয়ে যে মতানৈক্য ছিল তার সমাধান স্বাধীনভারতে হ'বে বলে আশা আছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ্য যে এ'সব আইনগত ব্যবস্থার অনেকগুলি প্রাচীনকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। ইত্যবসরে মুসলিমলীগ দ্বারা সমস্ত মুসলমানদের দায়াধিকার বিষয়ে শরিয়ৎ আইন প্রবর্তন করার জন্য একটি বিল আইন সভায় গৃহীত হয়। অবশ্য ইহা বাধ্যতা-মূলক নহে। ভারতে মুসলমানদের দায়াধিকার সম্প্রদায়গত। অর্থাৎ অনেক সম্প্রদায় মিতাক্ষরা আইনানুগ দায়াধিকার মানেন। পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমে রীতিগত আইন (Customary Law) মানেন[১]। আইনের এই বিভিন্নতার জন্য মুসলমান নেতারা শরিয়ৎ আইনকে মুসলমানের সকল সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি বিল প্রবর্তন করেন স্বাধীন ভারত তথা স্বাধীন বাঙ্গলা এ'সব সামাজিক আবর্তনের সুবিধা নিয়ে জগতের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

একটি ধারানুসারে স্বাধীনতার যুগে "হিন্দু কোড্ বিল"-এর অন্তর্গত হিন্দুর 'একপত্নীত্ব' বিধিবদ্ধ করা হয়। আর এই সঙ্গে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ আইনও গৃহীত হয়।

বর্তমান সময়ে স্বাধীন বাংলা তথা স্বাধীন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি অন্য প্রকারের। জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত জাতীয়-শাসন বুর্জোয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজনীতিক সমানাধিকার প্রবর্ত্তনে বিশেষ তৎপর। স্বাধীন ভারতের শাসন সংস্থান (constitution) মধ্যবিত্ত রাজনীতিক সমানাধিকারের ভিত্তির উপর স্থাপিত। এতদ্বারা রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই সমানাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এখনকার ভারতীয়েরা আর কোন বিদেশীদের কর

১। বিপিনচন্দ্র পাল: "My Life and Time" Vol. II. pp. 274—277.

প্রদানকারী "প্রজা" নয়। তাঁরা সকলে রাজনীতিক সমানাধিকার প্রাপ্ত। স্বাধীন নাগরিক সর্ববর্ণ-ব্যবস্থা স্থাপনে প্রবৃত্ত। রাষ্ট্রীয় বা শাসনশক্তি এখন রাজার পরিবর্তে সমবেত নাগরিকদের লোকসভাতে কেন্দ্রীভূত। প্রতিনিধিত্ব-মূলক এই সংস্থাই সমাজনীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার বা ব্যবস্থা করে থাকে। জাতীয়সভার সংকল্প তার কার্যকরী সমিতি শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ্যে প্রচারিত এবং কার্যকরী করা হয়।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, স্বাধীনভারত আজ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় আর্যরাষ্ট্রের প্রথার পরিবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাষ্ট্র গঠন করেছে। মধ্যযুগের ন্যায় এই রাষ্ট্র বর্ণাশ্রম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পুনঃ স্বাধীনভারতে নানা প্রকারের নূতন অর্থনীতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মধ্যযুগীয় বংশগত জাতিসমূহ আজ বিষম ধাক্কা খেতেছে। ইংরেজশাসন বুর্জোয়া সভ্যতার উপকরণসমূহ, ইচ্ছা সত্বে হউক আর অনিচ্ছা সত্বেই হউক, প্রবর্তিত করেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রমশিল্প-সংস্থাসমূহ দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় এবং উপর্য্যুপরি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ দ্বারা ভারতীয় সমাজের পুরাতন ভিত্তি উৎসাদিত হতেছে। এখন জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ঢং-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠনের আদর্শ গ্রহণ করেছে। ইংরেজ শাসনকাল হতেই বংশানুক্রমিক পেশা বা বৃত্তি দ্বারা মানুষের সামাজিক গুণ বা মর্যাদা নির্দ্ধারিত হওয়া বন্ধ হয়েছে। আজ "ব্যক্তিগত গুণ"-ই নাগরিকদেব সামাজিক মর্য্যাদার বা জীবনযাত্রার মূল হিসাবে বিবেচিত ও গৃহীত।

বর্তমানে মধ্যযুগীয় "ছত্রিশ জাতির" বৃত্তিগত জাতিত্ব আর গ্রহণীয় বা গ্রাহ্য নয়। অর্বাচীন পুরাণানুসারে জাতিসমূহ রক্তের বিশুদ্ধতানুসারে উত্তম, মধ্যম, সংকর ও অধম সংকর (বৃহৎ ধর্মপুরাণ) বলে আজ জাতি-সমূহের সামাজিক পদমর্যাদা নিরূপিত হয় না। পক্ষান্তরে দেখা যায়, আজ সর্বত্র প্রাচীন স্মৃতিসমূহে উল্লিখিত শূদ্রের জাগরণ হতেছে। উত্তরে চামার জাতীয় লোক ছবি বা ঠাকুর ভয় করে না। প্রযোজন হলে, শারীরিক শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ্ নহে; দক্ষিণে দ্রাবিড়ভাষীদের এবং কেরল রাষ্ট্রে জোর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সংসাধিত হ'তেছে। এ'সব স্থানে শূদ্রবর্ণের দ্রুত জাগরণ হতেছে। মাদ্রাজ রাষ্ট্রে একদল[১] শূদ্রবর্ণীয় ব্রাহ্মণপুরোহিত নিজেদের

১। ইহা সত্য ঘটনা। উত্তর প্রদেশে বচসার পর এক চামার জাতীয় লোক এক ঠাকুরকে চপেটাঘাত করেছিলেন। উত্তর প্রদেশে ইহা অভূতপূর্ব ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়।

সমাজের বিবাহ সম্পাদন করছেন। শূদ্রবর্ণীয়গণ সংখ্যাধিক্য বলে শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেছেন। স্থান বিশেষে ভয়ে ব্রাহ্মণেরা নাকি নিজেদের নামের শেষে সামাজিক বংশপদবী পর্যন্ত পরিবর্তন করছেন। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের সময়েই পূর্ববঙ্গের তথাকথিত অস্পৃশ্য নমশূদ্রদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণদের ব্যবহৃত বংশপদবী গ্রহণ করেছেন। ভারতের অনেক জায়গায় নিম্নবর্ণীয় লোক স্বীয়-জাতীয় বংশপদবী পরিবর্তিত করেছেন, উদ্দেশ্য মর্যাদা বাড়ান। ঋগ্বেদের সময় হতে আজ পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্র-ব্যবস্থিত পদ্ধতি অনুসারেই মানুষের পদ সমাজে গণ্য হয়ে এসেছে। বৈদিক "মঘবণ্" মধ্যযুগের "শ্রেষ্ঠ ধনী" বর্তমানের রূপে বিরাজ করছেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, জাতিগত পেশা সামাজিক পদের নিয়ন্তা নহে। ইংরেজশাসনে যে আবর্তন আরম্ভ হয় স্বাধীন-রাষ্ট্রে তার পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।

এতদিন সমাজ লম্বভাবে (vertical) এবং সমান্তরালভাবে (parallel) বিভক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ফলে দ্রুতগতিতে তাহা পরিবর্তিত হতেছে। আজ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে আইনগত আপত্তি নাই। এরূপ অনুষ্ঠিত বিবাহের দৃষ্টান্ত আজ যথেষ্ট দেওয়া যায়। পুনঃ অন্য ধর্মের স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের ফলে কোন হিন্দু আজ জাতিচ্যুত হয় না। আবার জাতীয়শাসন সাধারণ সংস্থা বা ধর্মালয় কিম্বা ধর্মীয় স্থানে "স্পর্শদোষ"-জনিত আপত্তি উঠিয়ে দিয়েছেন। আজকাল বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলেও সকল বর্ণের লোকেদের একসঙ্গে আহার-বিহার চলছে। কেবল বুনিয়াদীস্বার্থের গোঁড়ারা এই স্রোতের বাহিরে আছেন। পুনঃ জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ায় জমিদারের সাহায্যপুষ্ট মন্দির তালাবন্ধ হতেছে (মুর্শিদাবাদের পীঠস্থান কিরিটেশ্বরী দেবীর পূজার দুরবস্থা উল্লেখ্য)। পুরোহিতেরা হয় বেকার নয় তো অন্য কোন বৃত্তিমূলক কাজ করছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের ছাঁচে সমাজ যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পুনর্গঠিত হয় তাহলে লম্ব এবং সমান্তরাল এতদুভয় বিভাগই সমাজ থেকে নিঃসন্দেহে অন্তর্হিত হবে।

আজকাল আর বিলেত গেলে জাত যায় না। বরং লোক ওদেশে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র। পুনঃ নারীর অবরোধ প্রথা উঠে গিয়েছে। নারীরা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সকল বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি জীবিকার্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। জাতীয় গণপরিষদ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে পুরুষের ন্যায় সমানাধিকার দিয়েছে। এরূপে দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকদের চাইতে স্বাধীন ভারতে সংস্কার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতেছে। 'রেজিস্টারী বিবাহ' আইনের সুবিধা নিয়ে অসবর্ণ, ভিন্নধর্মীয় এবং ভিন্ন

প্রদেশের লোকেদের মধ্যে বিবাহ অবাধে চলছে। মানবসমাজ অর্থনীতিক কাঠামোর উপর স্থাপিত। অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই সংস্কার বা পরিবর্তন বিচারশক্তি বা বিবেকের উপর নির্ভর করে না। অবশ্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা ইহার উদ্বোধন করেন মাত্র। ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদের আবর্ত ও বিবর্তনের পদ্ধতি বা ধারায় স্বাধীনভারতের শাসন বিভাগের ধারানুসারে জাতীয়সংস্থার সামন্ত-তন্ত্রের প্রধান প্রতীক সামন্ততন্ত্রীয় রাজ্যসমূহের এবং তাহার আনুসঙ্গিক জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। যে অর্থনীতিক কারণ-বশতঃ বাঙ্গলা এতদিন শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে অগ্রসর হতে পারছিল না, আজ সেসব প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়েছে। বাঙ্গলার ভূমিগত ধনতন্ত্র-বাদের পরিবর্তে শিল্পগত ধনতন্ত্রবাদের রাস্তা পরিষ্কার প্রশস্ত হতেছে। সামন্ত-তন্ত্রের শেষ চিহ্নসমূহ অপসারিত হলে সমাজে বিরাট বিশাল বিপ্লব সংসাধিত হবে। ক্রমে ভারতরাষ্ট্রস্থিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহ নূতন বিবর্তনের চাকায় পড়ে নূতন কলেবর ধারণ করবে।

এক্ষণে বাঙ্গলার সমাজে প্রত্যাবর্তন করা যাউক। বাঙ্গলার সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতেছে। আজ আর ভূম্যধিকারীশ্রেণী নাই; উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীদ্বয় সমাজে কর্তৃত্ব করছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপুলাকার ধারণ করে অর্থনীতিক কারণবশতঃ শ্রমজীবিশ্রেণীর পর্যায় অবনমিত হতেছে। শ্রমশিল্পী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্পীদের সংখ্যাও স্বভাবতই বৃহৎ হবে। পুনঃ কৃষিজীবিদের সংখ্যা সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দুইশ্রেণীর উচ্চতর পদের লোকেরা যথার্থ মধ্যবিত্তশ্রেণী গঠিত করেন। বর্ণ-বিভেদ বা জাতি-বিভেদ এদের মধ্যে ততটা কার্যকরী নয়। স্মৃতির বিভেদও আজ সুদূর অতীতের কাল্পনিক ব্যবস্থার গল্পের কথা বলেই গণ্য হবে। বস্তুতঃ ওগুলি কখন কার্য করেছিল কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

এক্ষণে সমাজ পুরাপুরি মনুস্মৃতি বা মধ্যযুগীয় নিবন্ধের ব্যবস্থানুযায়ী পরিচালিত নয়। সুতরাং নূতন কি সংহিতা অনুসৃত হবে, তাহাই এক্ষণে বিচার্য।

স্বাধীন ভারতের হিন্দু আজ পুরাতন বংশানুক্রমিক জাতির গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকতে পারবে না। প্রাচীনকালের ন্যায় স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা জগতের সর্বত্র গমন করবে, উপনিবেশ স্থাপন করবে ও সেখানকার লোকদের সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। এই

কালস্রোতপ্রবাহ যাহা বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে এখন উহা অনুকূল অবস্থায় প্রখরতর হবে। স্বাধীন ও শক্তিমান রাষ্ট্রের নাগরিকেরা "তেজিয়াংস ন দোষায়" নীতি গ্রহণ করবে এবং গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ভবিষ্যতের ভারতীয় নাগরিক অমুক প্রদেশের লোক বলে গণ্ডীভূত হয়ে থাকতে পারবে না। কারণ ইহা প্রকৃতি ও কালস্রোতের বিরুদ্ধ।

বাঙ্গলা চিরকালই ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ প্রদেশ মাত্র। অতীতে যেমন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অনুকূল বাতাবরণে ভারতীয় ইতিহাসে নিজেদের প্রকট করেছে, তদ্রূপ গৌড়, বঙ্গও অতীতের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও কৃষ্টিতে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকট করেছে। "বাঙ্গালী" বলে কোন একটা পৃথক মূলজাতীয় লোক (biotype) নেই। অন্যান্য প্রদেশের লোক যে উপাদানে গঠিত, কমবেশী সেই সব উপাদান তথাকথিত বাঙ্গালীর ধমনীতে প্রবাহিত হতেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক বাতাবরণ বাহ্যিক ভিন্নতা আনয়ন করে। আজকালকার বিজ্ঞানীগণ জাতি (race) বলে কোন নরসমষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তৎপরিবর্তে জাতিতাত্ত্বিক লোকসমষ্টি (ethnic group) অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস ভাষা আগের ব্যবহারের সমষ্টি নিয়ে লোক সমাজের অস্তিত্ব মানে না। এ'সব অনুষ্ঠান শিক্ষার দ্বারা এবং নূতন বাতাবরণ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। আসলে একটা "জাতি" তার বাতাবরণ দ্বারা সৃষ্ট হয়। বর্তমানের সভ্য ইউরোপের কতিপয় জাতির কিছু কিছু লোকসমষ্টি আমেরিকায় বসবাস করার ফলে তাদের সন্তানাদি পিতা ও পূর্বপুরুষ হতে পৃথক মস্তক-করোটির বেড় (Index) প্রাপ্ত হতেছে। এর অর্থ নূতন বাতাবরণে পুত্রের মাথার গঠন পিতা ও পিতৃপুরুষদের হতে পৃথক হতেছে। একটা মানবজাতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হতেছে তার মস্তকের গঠন। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে তাহা অপরিবর্তনীয় নয়। পুনঃ Drosifelasca, Fruitfly এবং Moth নামক পতঙ্গদ্বয়ের উপর পরীক্ষা করেন। ইহা দৃষ্ট হয়েছে যে, বাতাবরণ অনুযায়ী পতঙ্গের বাহিরের অঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আবার বাহির হতে গৃহীত শারীরিক লক্ষণও (acquired characteristics) পুরুষানুক্রমিক হতেছে। তা'হলে উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদীদের পুরুষানুক্রমিক (heriditary) এবং Superior বা Master race (উচ্চ মানবজাতি) প্রভৃতি ভ্রান্ত নরতত্ত্ব আজ গ্রাহ্য নয়। পুনঃ সোভিয়েট রুষে মিথুরিনের আবিষ্কারের পথ ধরে লাইসেঙ্কে (Lysenke) দেখিয়েছেন যে বাতাবরণ (environment) নূতন জাতি সৃষ্টি করে। এই তত্ত্ব অনুসারে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যের ভাব আর টিকে না।

আমাদের এসব নূতন তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের সামাজিক জীবন গঠন করতে হবে। ভারতীয় জাতিতাত্ত্বিক উন্নতি সাধন করতে হলে পুরাতন স্মৃতি হতে নরতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের ব্যবস্থা নিলে আজ আর আমাদের চলবে না। এ'বিষয়ে আমাদের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুর বর্ণতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্ব মূল-জাতিত্বের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। রিসলীর বিভিন্ন জাতির শারীরিক মাপজোপের বিশ্লেষণ করে লেখক অন্য নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে একই জাতিগত উপাদান (racial element) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমান[১]। বৈজ্ঞানিকেরা রক্তবিভাগ (blood grouping) পরীক্ষা (test) দ্বারা দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের ধমনীতে একই রক্তের লক্ষণ বিরাজ করছে[২]। তদ্রূপ হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষাগত শরীরগত ও রক্তের সম্পর্কের সমানতা রয়েছে[৩]।

১৯৫১ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকগণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাঙ্গালী শ্রমশিল্পের কাজ করতে যায় না, যেহেতু সমৃদ্ধিশালী কৃষিকর্ম তার হস্তগত। কিন্তু উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বাঙ্গালী বয়লার এবং কারখানার উনানে হাতের কাজ করতে অস্বীকৃত নয়। যে জনমজুরী অপেক্ষা শিল্পকর্মে সমধিক পারদর্শী, শ্রমগত শিল্পের শ্রমিক শ্রমশিল্প উৎপাদনে তার মন নিয়োজিত হয়। যে শ্রমসংস্থায় উক্ত প্রকারের সুবিধা আছে সেখানে সে তাহা গ্রহণ করে। কেরাণী প্রভৃতি কর্মে বাঙ্গালীকে বেশ পাওয়া যায়। আসল কথা যাহা ইতিপূর্বেই উক্ত হয়েছে। কারখানা, রেললাইন, জাহাজের কাজে ঢুকবার সুযোগ-সুবিধা এতদিন বাঙ্গালী শ্রমিক পায়নি এবং যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই সে উহা গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক মূলধনীবাদ (Capitalism) এর জন্য দায়ী ছিল বা আছে।

পুনঃ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অনেক বঙ্গভাষী কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পৈতৃক জীবিকা ত্যাগ করছে[৪]। অন্যদিকে কৃষককুল অর্থক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়াগ্রস্থ, অনাহারক্লিষ্ট, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হয়ে জীবনে বেঁচে থাকবার আশা ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছেন। বাঙ্গলার কৃষকদের দুর্দশার কথা বহু শতাব্দী পূর্বেই বিদেশে পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে[৫]।

১। B. N. Datta "Racial Elements in Caste" in "Studies in Indian Social Policy."

২। Malone and Lahiri পরীক্ষা ১৯৩১ সেন্সাসে উদ্ধৃত।

৩। Macfarlane এর পরীক্ষা Indian Science Congress প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। B. N. Datta : "Population of Bengal" in Modern Review 1933.

৫। B. N. Datta : "Mystic Tales of Lama Taranath."

যদি স্বাধীনতার যুগে বাঙ্গলার কৃষক নানাপ্রকারের জাগতিক ব্যাধি মুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি সে পেট ভ'রে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তাহলে সে জীবন-সংগ্রামে জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নিঃসন্দেহে সমর্থ হবে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে আজ প্রশ্ন হ'ল, বিভিন্ন প্রাদেশিক-রাষ্ট্রীয় ভাষাভাষীকে কি ভাষাভিত্তিক পৃথক পৃথক জাতিতাত্ত্বিক লোকসমষ্টিরূপে চিরকাল থাকবার প্রয়োজন আছে ? যখন ভারতবর্ষ একরাষ্ট্র গঠন করেছে, যখন সকল ভারতবাসী একই প্রকার নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন এক রাষ্ট্রভাষা যাহা সকলেই বুঝতে পারবে তার শিক্ষা এবং প্রচারও চলছে, যখন নানা শাসন-বিভাগীয় বিধান দ্বারা সকল ভারতবাসীর পারস্পরিক বিবাহাদি সম্পন্ন করবার সুবিধা প্রদান করা হতেছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাভিত্তিক, যেমন "বঙ্গভাষী" বা "বাঙ্গালী" প্রভৃতি-রূপ এক-একটা পৃথক নরতাত্ত্বিক জাতিরূপে বিবর্তিত হবার প্রয়োজন কি এবং তাতে কি বিশেষ সুবিধা হবে ? অবশ্য ইহা সুদূর ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ-প্রসূত বিবর্তনের গর্ভে নিহিত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র (Indian Union) কি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মিলিত 'সংযুক্ত-রাষ্ট্র' (Confederacy) যার রাষ্ট্রীয় শক্তি কেন্দ্রে ন্যস্ত অর্থাৎ আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় Federation হবে, যেখানে বিভিন্ন 'নেশন' বিবর্তিত হয় নি তাহাই হবে।

এ'জন্য বর্তমানের বিভিন্ন রাজনীতিক পরিস্থিতির গতি দেখে আমাদের মনে এ'ভাব উদয় হয় : বাঙ্গলার তৃতীয় সামাজিক সমীকরণ কেবল দায়ভাগ শাসিত হিন্দুর মধ্যে সাধিত হবে না, সকল প্রকারের হিন্দু ও অহিন্দু নিয়ে সাধিত হবে। ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে বর্তমানের হিন্দু-আইন নৈতিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার অস্তিত্ব মিটিয়েছে। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সর্ব-ভারতীয়দের একজাতিয়তা বিবর্তন করবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। উক্ত প্রচেষ্টা সফল হলে তন্মধ্যে প্রাদেশিক জাতিসমূহের স্থান কি দাঁড়াবে ? আবার সর্বভারতীয়দের একজাতিয়তাপ্রাপ্ত একটি অখণ্ড 'নেশন'-রূপে বিবর্তিত হওয়াও প্রয়োজন। এই অখণ্ডতার অভাবেই ভারতের পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রীয় পতন হয়েছে। ইতিহাসে ভারতীয়দের নিগ্রহও এতৎপ্রসূত। যখন আমরা দুই-জাতিতত্ত্ব গ্রহণ করি না তখন বহুজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করব কি প্রকারে ?

কিন্তু একজাতিয়তাপ্রাপ্ত একটি 'নেশন' সংগঠিত হলে সমস্ত ভারতবাসীর একরক্তের ও একভাষার জাতি হতে হবে, এরূপ কোন কথা হতে পারে না ; কারণ ইতিহাসে এরূপ যুক্তির স্বপক্ষে নজীর বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা একীভূত 'নেশন' বা জাতি হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। কিন্তু

উক্ত দেশ দুটিরও বিভিন্নস্থান পর্যবেক্ষণ করলে নরতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রভেদ ও পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কেবল ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক ভাষাকে উন্নত করা হ'য়েছে। আবার ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ দেশসমূহেও সমস্বার্থ ও সমকৃষ্টি সম্পন্ন এক 'নেশনের' (বা জাতির) লোক হতে হলে একরক্ত ও একবংশের লোক হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এক রক্তের লোক হয়েও জার্মাণগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত।

যেসব ঐতিহাসিক কারণবশতঃ প্রাচীন আর্য-কৃষ্টিসম্পন্ন লোকসমষ্টি বিভিন্ন জনপদের প্রাদেশিক জাতিরূপে (people) অভিব্যক্ত হয়েছিল সেসব কারণ-গুলি আজ অপসারিত হতেছে। কাজেই সারা ভারতকে গণ্ডীভূত করে তৃতীয় সমীকরণ বিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই বিবর্তনের সংহিতা হবে রাষ্ট্রীয় বিধান (code) এবং বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Eugenics)। ভবিষ্যতের বিবর্তন ভবিষ্যতের গর্ভে আছে।

এক্ষণে অহিন্দু বাঙ্গালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা উল্লেখ না করলে আমাদের উপস্থিত প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদিচ লেখক অনেকবার বিভিন্নস্থলে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

বঙ্গভাষীকে বাঁচতে হলে এ'সব সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রতিকূল বাতাবরণ হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হতে হবে। বাঙ্গলার লোক বহুকাল পূর্বেই কৌমগত প্রথা ভেঙ্গে একজাতিয়তা অর্জন করেছে। বাঙ্গলার আইনই ইহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্গভাষীকে ভারতীয় একজাতিয়তার মধ্যে লীন হওয়ায় যখন তুর্কি মুসলমান আক্রমণ উত্তর ভারতে হয় নাই তখন সকল ভারতীয়দের বৈদেশিকেরা হিন্দু (দারাবাউস অনুশাসন) বা ইণ্ডস্ (Indus, গ্রীক) বলে অভিহিত করা হ'ত। পূর্বে আফগানিস্তান হতে সমগ্র উত্তরভারত আর্যভাষী অধ্যুষিত দেশ ছিল। মাহমুদ গজনীর সভার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আলবেরুনী সমুদয় ভারতবাসীদের "Indian" বলেছেন। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের একশত বৎসর পরে কবি আমির খস্রু তাঁর "খালেকবারী"তে (অভিধান) "হিন্দী ও হিন্দবী" দুই শব্দই ব্যবহার করেছেন। ইহার অর্থ, হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের অনেকে নানাকারণে কালক্রমে যখন মুসলমান হলেন তখন বোধহয় পুরাতন ধর্মের লোকদের পৃথকভাবে "হিন্দু" বলে চিহ্নিত করা আরম্ভ হ'ল। আজও পশ্চিম এশিয়ায় মুসলমান দেশসমূহে ভারতীয়দের ধর্মনির্বিশেষে "হিন্দী", "হিন্দলী" বা 'হিন্দুস্তানী' বলে অভিহিত করা হয়।

এক্ষণে হিন্দুদের যারা মুসলমান হতে লাগল, তখন তারা পৃথক সমাজ স্থাপন করলেও পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে

পারেনি। কোন দেশের মুসলমানই তাহা পারে নি। ফলতঃ বিশাল ভারতীয় বা হিন্দু সমাজের একাংশ কর্ত্তিত হয়েই নূতন মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। অবশ্য ধর্ম-পুরোহিতেরা অনেকে বিশ্বাস ও রীতিনীতির পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন। তত্রাচ ভারতীয় মুসলমান সমাজে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্টভাবে আজও বিরাজ করছে। আমেরিকান অনুসন্ধানকারী টাইটাস্ মহোদয় তাঁর সিদ্ধান্তের শেষে বলেছেন, "ইসলাম হিন্দুধর্মকে যত না প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে হিন্দুধর্ম ভারতে ইসলামকে তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবান্বিত করেছে।" তিনি সর্বজনবিদিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, "হিন্দুর বর্ণাশ্রম প্রকারান্তরে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে বিদ্যমান।" আবার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে হিন্দুর ন্যায় সমাজগত শ্রেণীভেদ মুসলমান সমাজেও আছে। এই শ্রেণীসমূহ নিজেদের মধ্যে বিবাহ করে। তাদের অনুলোম বিবাহ চলে, কিন্তু প্রতিলোম চলে না। পুনঃ হিন্দুজাতির অনেকে যথা, রাজপুত, জাঠ, গুজার প্রভৃতি মুসলমান হয়েও স্বীয় জাতির গণ্ডী ত্যাগ করেনি। পুনঃ রোহিল্লা জাতি স্বীয় গণ্ডির মধ্যে বিবাহাদি কার্য করেন। পশ্চিমে হিন্দুর ন্যায় পঞ্চায়েৎ আছে। আসলে এরা নিজেদের পুরাতন জাতি-তাত্ত্বিক দলবদ্ধতা বা যুথাচারী ভাব পরিত্যাগ করতে পারেনি। শ্রেণীজ্ঞান (class consciousness) ইসলামীয় প্রাচীন সাম্যবাদকে অন্যান্য মুসলমান দেশের ন্যায় ব্যাহত করেছে। ইসলামে শ্রেণী-বিভেদ উময়াদ খলিফাদের সময় হতেই আরম্ভ হয়েছে। তৎপর মূল-জাতিগত (race) বিভেদ আজও যায় নাই। পারস্পরিক বিবাহে আপত্তি নাই। কিন্তু জাতিগত পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ ভাবটি থেকেই গেছে (ফেরদৌসী দ্রষ্টব্য)। আরব অধ্যাপক হিটি বলেন, আরববাসী খলিফাদের যুগে বিভিন্নজাতির মধ্যে বর্ণ-সাঙ্কর্যের প্রাচুর্য হওয়ায় আরবেরা পশ্চাৎগামী হয়। এ'বিষয়ে আরব-মনোভাবাপন্ন জনৈক আরব কবির নিম্নোক্ত কয়েকটি পংক্তি হিটি[১] উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"Sons of concubines have become,
So numerous amongst us,
Send me O God, to a land
Where I shall see no bastard." (Mubarrad P. 302)[২]

উক্ত লেখক পুনঃ বলেছেন যে আরবদেশীয় খলিফারা মরক্কো ইরাণ পর্যন্ত জাতিদের একীভূত করিতে পারেন নাই। মূলজাতিগত বিভেদ থেকেই গেছে।

১। Hitti : "The Arabs."
২। M. Titus : "Indian Islam."

আরবদের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান পণ্ডিতেরা যেরূপ পরে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, হিটি তা নিম্নোক্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন : "Those same people who had once enjoyed scorpions beitles and wesoles as luxury" (Ibn Khaldun, Ungddasuah, P. 110). এ'বিষয়ে পারস্য কবি ফেরদৌসীর উক্তি : Who thought rice a venomous food. (Ibn al Fagh. pp. 127-28) and who used flattened bread for writing material (Ibn Khaldun, pp. 187-8), by this time had their gastranomic tastes whether for the delicacies of the civilised world. অর্থাৎ যারা এক সময়ে বিছা, পোকা-মাকড় খেত, ভাতকে বিষাক্ত খাদ্য মনে করত এবং চেপ্টা রুটিকে লিখিবার দ্রব্যরূপে ব্যবহার করত তারা এখন সভ্য জগতের খাবার আস্বাদনে ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে থাকে।

যাঁরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে ভারতীয় সমস্ত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ত্যাগ করে "আরব" সাজবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র এবং বাঙ্গলার যেসব তথাকথিত মুসলমান পণ্ডিত মুসলমান বাঙ্গলাকে আরববংশীয়দের দূত প্রমাণ করতে তৎপর তাঁদের জন্যই উপরোক্ত মুসলমানধর্মীয় আরবদেশীয়দের উক্তি উদ্ধৃত করা হ'ল। পুনঃ আব্বাসীয় যুগে আরবেরা বোগদাদে আসে এবং পারসিকদের ইজার এবং কুল্লাটুপি, আবা কারা প্রভৃতি পরিধান করতে শিক্ষা করে।[১] আবার পার্শী ডাঃ ঢল্লা বলেন, পারসীকেরা প্রাচীনকালে সীজদের কাছ থেকে ইজার ব্যবহার করতে শিখে[২]।

যাঁরা ধর্মের বিভিন্নতা হেতু নিজেদের "অ-ভারতীয়" বলে গর্ব করতে চাহেন তাঁরা স্যার সৈয়দ বিল গ্রামীর উক্তি : পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা ভারতীয় মুসলমানের বংশপরম্পরাগত মহান কৃষ্টি (cultural heritage) স্মরণ করিতে বলে, আমরা সারাসেন সভ্যতার কথা শুনি। কিন্তু এই সারাসেনদের ঐতিহ্য ও পরিচয় কি ছিল? পাশ্চাত্য অনুসন্ধানকারীদের মত এই যে বিজিত সুসভ্যজাতিয় বংশোদ্ভব পণ্ডিতদের 'সারাসেন' বলে মধ্যযুগে অভিহিত করা হ'ত। ইহারই প্রতিধ্বনি ক'রে মৌলানা মহম্মদ আলী আলীগড় কলেজে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ধর্মান্তরিত রাজপুত, ইহুদী, পারসীক, সিরীয়, গ্রীক (ইউনানী বা যবন), কপ্ত (ঈজিপ্তের খ্রীষ্টিয়ান) প্রভৃতি জাতিরাই "সারাসেন" জাতি সৃষ্টি করেছিল।

১। Hittis : "The Arab."

জাহিজ, বাইয়ণ খণ্ড ৩, পৃঃ ৯। Dozy Noms des. Vata pp. (203-4)।

২। Dr. Dhalla : "Zoroastrian Civilization."

লেখক ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ব বিশারদদের পুস্তকসমূহ হ'তে সাতজন হিন্দু-বংশোদ্ভব ব্যক্তির নাম পেয়েছেন, যাঁরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের যুগে বিশিষ্টভাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আবু হানিফা অন্যতম। এঁর ব্যবস্থা এশিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমানেরা মেনে চলেন। তাঁর পিতামহের নাম ছিল আনন্দ (Wanand)। তিনি জাতিতে জাঠ (Zat) আরবীয় ছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই সত্য চেপে গিয়েছেন যদিও আরব ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ভারতীয় মুসলমান পণ্ডিতদের ইহা অজ্ঞাত নয়।

আসলে ভারতীয় মুসলমানদের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রীতিনীতি বর্তমান। যেমন উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের এবং পাঞ্জাবের কৃষক মুসলমানেরা ব্যবহারের দায় বিষয়ে শরিয়ৎ আইন জানেন না। তাঁরা মেয়েদের পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির কোন অংশ দেন না। পুনঃ পাঞ্জাবের এবং গুজরাটের ইসলামীয় আগাখানী সম্প্রদায় দায় বিষয়ে মিতাক্ষরার অধীন। আবার এই অঞ্চলে কতকগুলি মুসলমান জাতি আছেন যাঁরা মিতাক্ষরার আইন মানেন।[১]

বাঙ্গলায় চিরকাল 'দায়ভাগ' প্রচলিত আছে। ধনী জাতিগুলি এই আইনের অধীন। অন্যপক্ষে বেশীরভাগ মুসলমান কৃষকশ্রেণী সম্ভূত। কাজেই এই সমস্যা বাঙ্গলায় উদ্ভূত হয় নাই। তবে মুসলমান সমাজে "কৌম" (tribe) প্রথা প্রচলিত আছে বলে মুসলমানেরা বলে থাকেন। কিন্তু সমাজে ইহা কতটা কার্যকরী তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। পুনঃ অনুলোম প্রথার ন্যায় প্রথাও আছে। যেমন, কাজীবংশে সেখবংশে কন্যা দান করবে না যদিচ তাদের মেয়ে তাঁরা নেবেন। ত্রিপুরার মুসলমান কৃষকেরা মুসলমান পাল্কী-বেহারাদের সঙ্গে এক হুঁকায় ধূমপান করবেন না। আবার জোলাদের সঙ্গে আসৃবফেরা এক বিছানায় বসে আহার করবেন না। এজন্য তাঁরা "মোমীন" আন্দোলন করছেন। অস্পৃশ্য হিন্দু মুসলমান হয়ে সেই অবস্থাতেই আছেন। বেদিয়া প্রভৃতি মুসলমান জাতি অস্পৃশ্য। পশ্চিমের শাকশব্জী উৎপাদনকারী কুঁজড়ারা অনাচরনীয়। মুসলমান নেতারাই স্বীকার করেন যে মুসলমান সমাজে "অস্পৃশ্যতা"-রূপ ব্যাধি আছে। আসল কথা, ভারতের ইসলামে সাম্যবাদ নাই।

বর্তমান লেখকের অনুমান, বাঙ্গলায় তুর্কীরা প্রথম মুসলমানরূপে প্রবেশ

১। Tyabnjee "Muhammedan Law"; A. Rahim "Islamic Jurisprudence."

করে এবং স্থায়ী হয়। তৎপর শের শাহের সময়ে ও পরে দায়ুদ খাঁ পর্যন্ত পাঠানেরা এই প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন। এ'সব জাতির মধ্যে "কৌমপ্রথা" (tribal system) ছিল। তাদের সময়েই বিশেষভাবে 'মুসলমানকরন' করা হয়। "যেমন গুরু তেমন শিষ্য" প্রবাদানুযায়ী বাঙ্গালী মুসলমান "কৌম" প্রথা এবং অনেক আচার-ব্যবহার পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ হিন্দিতে জলকে "পানি" বলা হয়। এই শব্দ পশ্চিম থেকে আগত মুসলমানেরা বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত করছেন এবং ইহা আজ হিন্দু ও মুসলমানের দুই জাতিতত্ত্বের একটি হেতুস্বরূপ হয়েছে। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেও 'পানি' শব্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। পুনঃ 'বদনা ও লোটা' উভয়ের পার্থক্যের একটা হেতু আছে। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলি যখন যাযাবর আরবদের দ্বারা বিজিত হয়, তখন তারা নিজেদের কৃষ্টির মাল-মসলাগুলি নিয়েই মুসলমান হন। "বদনা" তাদের অন্যতম নিদর্শন। বাঙ্গলার উত্তর এবং পশ্চিমভাগে হিন্দুদের দ্বারা সুন্দর পিতলের বদনা নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়। এ'জন্য ইহা উভয় জাতির পার্থক্যের নিদর্শন নয়। আবার বাঙ্গলার "গাড়ু" (সংস্কৃত গড্ডীকা) বদনা এবং গ্রীকজাতীয় vase-এর সম্মিলন। সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করলেই ইহা ধরা পড়বে। সাঁওতাল পরগণায় গ্রীক vase-এর অনুকরণে কুঁজা তৈরী হয়। কবে এই প্রথার উদ্ভব হল তা' প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের বস্তু।

এরূপে 'লুঙ্গী' নাকি হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্যের একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু লুঙ্গী বর্মার পরিধেয় বস্তু। কিছুদিন আগে বাঙ্গলায় গরীব মুসলমানেরা ইহা পরতেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণবশতঃ হিন্দুরাও আজ ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার আরম্ভ করায়ই এক্ষণে ইহা আভিজাত্য লাভ করেছে। "ইজারও" নাকি আর একটি নিদর্শন। কিন্তু এ'সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বার্বোসার সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেদিন পর্যন্ত গ্রামের মুসলমান ভদ্রলোকেরা ধুতি পরিধান ক'রে এসেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর আরব ও ইরাণী পর্যটকেরা মনসুরার (সিন্ধু) আরবদের ভারতীয় পায়জামা ও চাপকান (tumes) পরিধান করতে দেখেছেন। ভারতীয় মুসলমানের যাহা আজ "জাতিয়" পোষাক, হিন্দুরা মধ্যযুগীয় ভারতে উদ্ভূত তাহাও ব্যবহার করেন। সুদূর মরক্কো থেকে মধ্য-এশিয়ার মুসলমানের পোষাকের সঙ্গে তুলনা করলেই ভারতীয় মুসলমানের পোষাকের ভারতীয়ত্ব ধরা পড়বে।[১] এই বিষয়ের শেষ

১। Ghurye: "Indian Costume."
R. L. Mitra; "Indo Aryans."

কথা : অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকার সহিত মুসলমানের কোন সম্বন্ধ নাই। আসলে তাহা পূর্ব-রোমীয় বাইজান্টিন্ সাম্রাজ্যের পতাকা যাহা তুর্কীরা কন্‌স্‌টান্‌টিনোপল্ জয় করে স্বীয় রোম সাম্রাজ্যের প্রতীকরূপে রেখেছিলেন। তদ্রূপ "ফেজ" বা "তরবুস্" তুর্কীরা বিজিত আলবাণীয় ও গ্রীকদের নিকট হতে গ্রহণ করে। পূর্বে তুর্কীরা বড় পাগড়ী পরত (St. Irene Museum মূর্ত্তিসমূহ দ্রষ্টব্য।)

রিসলী বলেছেন, ভারতীয় মুসলমানেরা 'আসরাফ ও আতরাফ' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আতরাফকে 'আজলাফ'ও বলা হয়। আসরাফেরা উচ্চশ্রেণীয়। তাঁরা আতরাফের সঙ্গে বিবাহাদির সম্বন্ধ করেন না। কিন্তু উদারমতের আসরাফ মুসলমানেরা আজকাল আতরাফবংশীয় শিক্ষিত যুবকদের কন্যা দান করছেন।

এ'ছাড়াও এদের মধ্যে এক প্রকারের কৌলিন্যপ্রথাও আছে। এরূপ গোষ্ঠীসমূহ আছে যারা বিবাহের সময় বংশকৌলিন্য বিচার করেন। অর্থাৎ সমাজে 'খানদানী' বর্তমান। এক্ষণে কথা "আসরাফ" কি করে উদ্ভূত হ'ল। পরলোকগত আমীর আলী বলেছেন, ব্রাহ্মণ রাজপুতেরা মুসলমান হলে পাঠানদের কৌমভুক্ত হত।[১] আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আর্ণল্ডও বলেছেন, বাঙ্গলায় হিন্দুর ঘরের বলিষ্ঠ বালকদের ক্রয় করে পাঠান কৌমভুক্ত করা হত[২]। এই প্রকারেই বাঙ্গলায় পাঠান কৌম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[৩]

এ'জন্য পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণবংশীয় মুসলমান 'ঠাকুর সাহেব' এবং কায়স্থ "খাঁ সাহেব" পদবী পান। পশ্চিমে কথা আছে, ব্রাহ্মণ মুসলমান হলে সৈয়দ হন এবং রাজপুত পাঠান হন। পুনঃ জনশ্রুতি আছে, সম্রাট আকবর অনেক ব্রাহ্মণবংশীয় মুসলমানকে সৈয়দ পদ প্রদান করেছিলেন।

মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত তার সামাজিক পদ সে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। ইউরোপের ও ইরানের ইতিহাসই এই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। বাঙ্গলায়ও তদ্রূপ হয়েছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এই তথ্যের মর্ম উদ্ঘাটিত হবে। লেখক ইতিপূর্বেই এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন যে বাঙ্গলায় তথাকথিত উচ্চ-জাতি সমুদ্ভূত মুসলমান বংশসমূহ সমাজের শীর্ষে আছেন। এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানবার জন্য লেখক ১৯৩১ খৃঃ মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা

১। Halid Halil Bey : "Crescent and Cross."
২। Ameer Ali : "Mussalmans of India."
৩। Arnold : "The Preaching of Islam."

করে সুনিশ্চিত হন। লেখক তাঁকে বলেন যে, "আমার এক সৈয়দ বন্ধু আপনার উপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট। কারণ আপনি ব্রাহ্মণবংশীয় হয়ে খাঁ হন কি করে?" উত্তরে তিনি বলেন, "উনি পাঠানের সহিত মেশেন কি করে?" এর উত্তরে মৌলানা সাহেব বলেন, "যে যার কাছ হতে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে সে তার গুরুর পদবী পায়।" ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হ'লে উক্ত তথা যে হিন্দু প্রথারই অনুকরণ মাত্র এ'কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে। হিন্দু-প্রথাই প্রকারান্তরে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আজকালকার ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রও এই দাবীই করেন। তাঁরা বলেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও 'গোত্র' নেই। যজমানেরা পুরোহিতের গোত্র পায়। এই রীতি অনুযায়ী ছোটনাগপুরে অনেক আদিবাসী গুরুর পদবী স্বীয় পদবীরূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের এক জার্মাণ পাদরী বন্ধু গর্বের সহিত এ'কথা বলেছেন।

পুনঃ মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "সত্য কথা বলুন তো আপনাদের সমাজে 'বামুন', 'কায়েতে'র উপদল (clique) আছে কিনা?" জবাবে তিনি আছে বলে স্বীকার করে আরও বললেন যে, বাঙ্গলায় মুঘল পাঠান সংখ্যায় অত্যন্ত কম। সৈয়দ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সহ 'আসরাফ্' সমাজ গঠিত হয়েছে। এ'কথা সত্য হলে তবে তো এই সামাজিক অনুষ্ঠান জগতের সর্বত্র প্রচলিত সমাজতাত্ত্বিক প্রথানুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে। সর্বত্র বিজেতা ও বিজয়ী অভিজাতেরা মিলিত হয়ে এক নব্য অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। আসলে, হিন্দু সমাজতত্ত্ব এবং মুসলমান সমাজতত্ত্ব একই ছাঁচে ঢালা। নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী পর্যবেক্ষক ইহা অস্বীকার করবেন না।

এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় আসা যাউক। বাঙ্গলার বেশীরভাগ মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিম বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ এই প্রদেশের অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রীক আবর্তনের সহিত বিজড়িত। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় লোকদের সহিত সমভাগ্য ও স্বার্থের সূত্রে গ্রথিত হয়ে এক 'নেশন'-রূপে অভিব্যক্ত হতে বাধ্য। সংগে সংগে শিক্ষা বিস্তারের সহিত নূতন সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হবে আর পুরাতনের শৃঙ্খল ভাঙ্গবে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও হৃদ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। তবে আজ ইহার ভবিষ্যৎ-রূপ অবশ্য কল্পনা করা যায় না। অন্যপক্ষে উপস্থিত পূর্ব-পাকিস্তানে যে অবস্থা হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহা বঙ্গভাষী 'নেশন'-রূপে বিবর্তিত হতে বাধ্য। আসল সমস্যা ছিল, হিন্দুর বুর্জোয়া (মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর সহিত নবোদ্ভূত মুসলমান বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ।

এক্ষণে হিন্দু বিতাড়নের ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে এবং সংঘর্ষের অভাবে এই শ্রেণী বিশেষভাবে বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমগ্র বা অবিভক্ত বাংলা এতদিন পর্যন্ত কৃষ্টির যে ঐতিহ্য গঠন করেছে তাহা কি বক্ষ্যমান ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামেরই নামান্তর ধর্মান্ধতা দ্বারা বিনষ্ট হবে ?

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গলার মুসলমান নিজের ঐতিহ্য বিষয়ে অবহিত নন। তাঁরা 'পরগাছা' ঐতিহ্যকে নিজের ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হন। চতুর্দশ শতাব্দীর সেখ ফৈজিউল্লার 'গোরক্ষ বিজয়' থেকে বর্তমানের কাজী নজরুলের কবিতা পর্যন্ত যাহা বাঙ্গলার স্বীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি স্থাপিত, তাকে ধর্মান্ধ গোঁড়ার দল "ইসলামের তমদ্দুন বিরোধী" বলে ধিক্কৃত করে। যে বাঙ্গালী দিল্লীর সম্রাট ফিরোজীদ্দিন টেপেলকের দ্বারা একডালার যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন, তাঁর মুসলমানী নাম ছিল হয়বৎ খাঁ। পুনঃ রাজা গণেশের বংশের পুত্র যদু ওরফে জেলালুদ্দিন যিনি "নিজভুজবলে শ্রী অর্জন করেছিলেন", যাঁর কবরে হিন্দু ও মুসলমানের মিশ্রিত স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং যাহা পরে বাঙ্গলার মুসলমানী স্থাপত্য বলে সর্বত্র গৃহীত ও স্বীকৃত[১] তাহা মুসলমানের অজ্ঞাত; সেনাপতি রাজচন্দ্র ওরফে 'কালাপাহাড়ের' কথাও অজ্ঞাত। অন্যপক্ষে মুসলমান লেখক তাঁকে 'তুর্কী' বলে প্রমাণিত করবার জন্য ব্যগ্র।

পূর্ববঙ্গে কতক মুসলমান অভিজাতবংশ আছেন, যাঁরা স্বীয় ব্রাহ্মণ গোত্র ও প্রবর বিষয়ে বিশেষভাবে অজ্ঞ। পুনঃ মরক্কোর পর্যটক ইবনবেটুটা বলেছেন, তাঁর সময়ে সুমাত্রায় হিন্দু আধিপত্য থাকলেও অনেক মুসলমান বাঙ্গালী তথায় বসবাস করেছেন। আজ তাঁদের নিদর্শন বিলুপ্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী (Grand Vizier) কিয়ামিল পাশার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকার একজন বঙ্গভাষী মুসলমান ভদ্রলোক। 'নব্যতুর্কী' দল শাসনভার গ্রহণ করে তাঁকে চাকুরী থেকে বিতাড়িত করে। মুসলমানের হাত ছিল, তন্মধ্যে যে মুসলমান বাঙ্গালী ছিল না তাহা বলা যায় না, বিশেষতঃ যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হুগলী জেলার মুসলমানেরা গিয়ে ঘরের মেয়েদের হাতে তৈরী কাপড়ের কারুকার্যের দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করে বৎসরে প্রায় ৫০০০০ ডলার উপার্জন করে দেশে পাঠাতেন। এদের মধ্যে কেহ

১। Percy Brown : "Indian Architecture," Vol. II, p. 30.

কেহ তথায় বিবাহ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। এরা নিজেদের 'হিন্দু' এবং জগতের সর্বপ্রথম সভ্য জাতি বলে আমেরিকানদের কাছে স্পর্দ্ধা করতেন।

যে অর্থনীতিক এবং ঐতিহাসিক বেগের গতির টানে বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলার লোক বিদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের মুসলমান সন্তানেরা সেই গতির টানেই বিদেশে পাড়ী দিয়েছেন।

হিন্দু ও মুসলমান একত্রে মধ্যযুগ থেকেই বাঙ্গলায় যে কৃষ্টি ও সাহিত্য রচনা করেছেন তা বিলুপ্ত হবার নহে। বাঙ্গলার মুসলমানী স্থাপত্য হিন্দু ও মুসলমানের কৃষ্টির মিশ্রণের নিদর্শন। বীরনগর ও পাবনার প্রাচীন মসজিদের ইষ্টকসমূহে পদ্মফুল খোদিত আছে। আজ তাহা সাম্প্রদায়িক কলহের বিষয় হ'ল। আফগান যদি আজ বৈদিক-আর্য (Indo-Aryan) বলে স্পর্ধা করতে পারে, তা'হলে বাঙ্গালী মুসলমান কি স্বীয় ঐতিহ্য ভুলবে? এক্ষণে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বনীতির বস্তুতান্ত্রিকতার উপর পূর্ব-পাকিস্তানের ভবিষ্যতের বিবর্তন নির্ভর করে।

ইহার পর খৃষ্টান সমাজ। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই এই সমাজের কলেবর সাধারণত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এখনও হতেছে। এরাও ভারতীয় সমাজের কর্তিত একটি অংশ। বাঙ্গলায় বাঙ্গালী সমাজের একটা কর্তিত অংশরূপে এদের সমাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু গোঁড়া হতেই এদের উপর বিদেশী পাদরীদের কড়া নজর থাকায় তাদের মধ্যে পুরাতন প্রথা বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে নি যদিচ কিছু পুরাতন সংস্কার শিক্ষিতদের মধ্যেও আছে। উচ্চজাতিয় হিন্দুবংশজাত অনেক খৃষ্টান পরিবারে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকস্থলে হিন্দু-সংস্কার আজিও বিরাজ করছে। এখনও দক্ষিণের একস্থানের খৃষ্টিয়ানেরা উভয় ধর্মই মেনে চলে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের জাতিতাত্ত্বিক পরিবর্তন করবার চেষ্টা হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহারে তাদের "কালো ইংরেজ" করবার বিশেষ প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু উহা পরে ব্যর্থ হয়। সাধারণত জাতিতাত্ত্বিক হিসাবে বাঙ্গলার খৃষ্টানগণ বাঙ্গলার হিন্দুর জাতিতাত্ত্বিক নিয়ম রক্ষা করেই চলেন যদিও একদল সামাজিক ব্যাপারে 'কালা ইংরেজ' সাজেন। কিন্তু আজকাল হিন্দু ও খৃষ্টানের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিবাহের দৃষ্টান্তও দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে খৃষ্টান সমাজে বিবর্তনের মধ্যে একটা বড় বিপ্লব সংসাধিত হয়েছে। উচ্চজাতিয় হিন্দুবংশ থেকে আগত, বলেই কোন খৃষ্টানের আজ

পদমর্যাদা নির্দ্ধারিত হয় নাই। খৃষ্টানেরা বলেন, তাঁদের মধ্যে কাঞ্চন, কৌলিন্য বিবর্তিত হয়েছে। একজন খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বের সমাজের যে কোন নীচজাতি সমুদ্ভূত হউক না কেন, সেই স্মৃতি তার নূতন সমাজে পদমর্যাদা নিরূপণের প্রতিবন্ধকতা করে না। নীচবংশোদ্ভব খৃষ্টান যদি ধনী হয় তাহলে তিনি সমাজে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত হন। ইহা কবিকঙ্কনের ব্যাধ কালকেতুর উক্তি: "নীচ কভু উচ্চ হয় পেলে মহাধন।" কত বড় বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান!

বাঙ্গলার চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা আছেন। তাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধদের বংশধর বলে পরিচয় দেন। কিন্তু দেশের অন্যান্য লোকেরা তাঁহাদের 'মগ' ব'লে অভিহিত করেন। 'মগ'দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'মগহ'। আজও পাটনা এবং গয়া জেলাকে মাগাহা বলা হয়। সম্ভবত এই শব্দ থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ আরাকানের মগদেরই জ্ঞাতি বলে অনুমিত হয়। চট্টগ্রামের আরাকানদের প্রভুত্বকালে এরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বলে কথিত হয়।

লেখক চট্টগ্রামের কতিপয় বৌদ্ধ বড়ুয়া এবং হিন্দুদের নরতাত্ত্বিক মাপযোপ গ্রহণ করে দেখেছেন যে মাথার 'বেড়' (index) চট্টগ্রাম বিভাগের অন্য লোক হতে অভিন্ন ('অভ্যুদয়'—নবম সংখ্যা, চৈত্র দ্রষ্টব্য)। হিন্দুর প্রতিবেশী বলে হিন্দুর সংস্কার, রীতি, আইন এবং ভাষা এঁরা গ্রহণ করেছেন। অনেক ভবঘুরে হিন্দুও এদের সমাজে প্রবেশ করেছে বলে কথিত হয়। শিক্ষিত বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে বিবাহ চলেছে। কালে এঁরা হিন্দুসমাজভুক্ত হবেন যদিচ আজও এরা দ্বিতীয় সমীকরণের বাহিরে। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গলায় এঁরা বাস করেন না। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত আসেন মাত্র। অন্যদিকে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা "সরকে জাতিরূপে সমাজ-শরীর মধ্যে লীন হয়ে আছেন, এরা প্রাচীন বাঙ্গালী বংশোদ্ভব এবং সর্ববিষয়ে বাঙ্গালীর দ্বিতীয় সমীকরণের অন্তর্গত।"

ভারতবর্ষের খণ্ডখণ্ড সমাজ নরতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বের বিচারে ভারতীয় কৃষ্টিতে আর্য। উত্তরে ও দক্ষিণাপথের অধিবাসীরা ভাষা ও কৃষ্টিতে আর্য। দ্রাবিড়ভাষীরাও ধর্মে ও কৃষ্টিতে আর্য। অ-হিন্দুরাও ভাষা এবং সভ্যতায় আর্য। "হিন্দু" নাম বিদেশীর প্রদত্ত। এই আর্য-কৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয়দের নূতন সমীকরণ দ্বারা একীভূত 'নেশন'-রূপে বিবর্তিত হতে হবে। এ'জন্য চাই রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও আইনের সংস্কার এবং জীবনযাত্রার এক

পদ্ধতি। এক আইন, এক চিন্তা, এক অর্থনীতির ঐতিহাসিক বিবর্তন, একজাতিয়তাপ্রাপ্ত 'নেশন' গঠনের সোপান। কর্মযোগে প্রবৃত্ত হয়ে সেই সোপান প্রস্তুত করে নিখিল ভারতীয় সমীকরণ প্রচেষ্টার একান্ত ও একমাত্র প্রয়োজন। "সমানিব কাকুতি, সমানা বহবানিচ" ঋক্‌বেদের সম্বল। ঋষির এই বাক্য স্মরণে রেখে আজ আমরা এই আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম।

———